একটি রেমাশ নিবেদন

মে, ২০১৭

রহস্য পত্রিকা

রোমাঞ্চ বড় গল্প
আজরাইলের প্রতিনিধি
অপরাধ কাহিনি
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ
রোমাঞ্চ গল্প
বুমেরাং

আগাথা ক্রিস্টির
রহস্য উপন্যাসিকা
স্বপ্নবৃত্তান্ত

সবা প্রকাশনী

রোমাঞ্চ উপন্যাসিকা
ইকারাস

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

জন্মদিনে রক্ত দিন
বাঁচান ৪টি প্রাণ

কোয়ান্টাম
স্বেচ্ছা রক্তদান
কার্যক্রম বর্তমানে
হোল ব্লাডসহ প্লাটিলেট
কনসেনট্রেট, ফ্রেশ প্লাজমা,
ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা,
প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, প্লাটিলেট
পুওর প্লাজমা, ক্রায়ো-প্রিসিপিটেট,
প্রোটিন সলিউশন ও আরসিসি
অর্থাৎ রক্তের মোট ৮টি
উপাদান সরবরাহ
করছে

স্ক্রিনিং ছাড়া

রক্ত নেবেন না।
এমনকি তা আপনজনের
হলেও নয়। কারণ
তার রক্তেও
সুপ্ত থাকতে পারে
সংক্রামক
ঘাতক ব্যাধির
জীবাণু।

যেকোনো গ্রুপের নিরাপদ সুস্থ ও স্বেচ্ছা রক্তের প্রয়োজনে
যোগাযোগ করুন

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক
[পুরনো ১১৯/পি শান্তিনগর] ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫১৯৬৯, ০৯৬১৩-০০২০২৫, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
website : www.quantummethod.org.bd

আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা হোন
দুঃসময়ের জন্যে রক্ত সঞ্চয় করুন

এই সংখ্যায়

৩৩ বর্ষ * ৭ সংখ্যা * মে ২০১৭

রহস্য পত্রিকা

এই পত্রিকার কোনও লেখা কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও মুদ্রণ করা যাবে না।

সম্পাদক
কাজী আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
কাজী শাহনূর হোসেন
কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ
রহস্যপত্রিকা
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৮৩১৪১৮৪
মোবাইল: ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
www.facebook.com/shebaofficial

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

মূল্য :: চল্লিশ টাকা

ফিচার
কম দাঁত, বেশি দাঁত ৯
ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
সিএন টাওয়ার অভ টরন্টো ১৩
নাজিরা তাসলিম
চুল যখন ঝরে ২৪
ডা. ওয়ানাইজা রহমান
গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ৩২
ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ ৬৪
অন্বেষা বড়ুয়া
খাওয়া না খাওয়া যখন অসুখ ৮৫
ডা. এস. এম. নওশের

ক্লাসিক গল্প
লাট্টু আর বল ১০
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের গল্প
কষ্ট ১৪
তৌফিক উদ্দিন

অনুবাদ গল্প
দ্য গিভিং ট্রি ২২
রূপান্তর: মোঃ নজরুল ইসলাম সোহেল
প্রতিযোগিতা ৯৯
রূপান্তর: আনোয়ার সাদাত শিমুল

ছোট গল্প
আলোর অন্তরালে ২৫
মিনহাজ মঞ্জুর

রোমাঞ্চ উপন্যাসিকা
ইকারাস ৪৮
রূপান্তর: ডিউক জন

রহস্য উপন্যাসিকা
স্বপ্নবৃত্তান্ত ৬৬
রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

ভ্রমণ
সৌন্দর্যের লীলাভূমি ৮৮
ইয়াসমীন আক্তার মুন্নী

রোমাঞ্চ গল্প
বুমেরাং ৯১
শাহেদ জামান

ক্রাইম স্টোরি
প্রতিহনন ৯৫
এফ. এইচ. পল্লব
অন্ধকার ১২৩
মিঠুন রায়

রহস্য গল্প
উড়ো চিঠি ১০৮
রূপান্তর: আফরানুল ইসলাম সিয়াম

রম্যরচনা
জোকস্ ও কিছু কথা ১১৭
আসিফুজ্জামান তমাল

রোমাঞ্চ বড় গল্প
আজরাইলের প্রতিনিধি ১৩১
রূপান্তর: মুহাম্মাদ তানভীর মৌসুম

আরও রয়েছে
খোলা চিঠি ৫ ইতিহাসের গল্প ৭ বিজ্ঞান বার্তা ১৮ জীবন স্মৃতি ২০ আপনার স্বাস্থ্য ২৮ আত্ম-উন্নয়নমূলক গল্প ৩৪ মানসিক সমস্যা ৩৫ স্মৃতিচারণা ৩৮ আত্ম-উন্নয়ন ৮৭ তথ্য তরঙ্গ ৯৪ বিচিত্র অভিজ্ঞতা ১০৬ মনে পড়ে ১১৫ শব্দ-ফাঁদ ১২০ ভৌতিক অভিজ্ঞতা ১২১ প্রশ্ন-উত্তর ১২৬ গল্পকলি ১২৭ ভাগ্যচক্র ১২৮ বই-পরিচিতি ১৪৪

গা শিউরে ওঠা হরর কাহিনি পড়তে ভালবাসেন?
তা হলে রুমানা বৈশাখীর সাম্প্রতিক বইগুলো আপনার জন্যই!

পিশাচ কাহিনি
'অবলৌকিক'
বিদ্যা প্রকাশ

অতিপ্রাকৃত উপন্যাস
'পুনঃশায়াতিন'
জাগৃতি প্রকাশনী

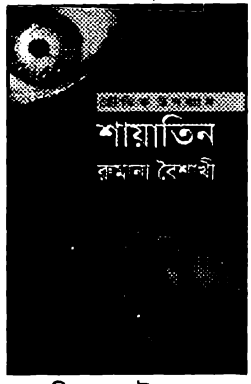

অতিপ্রাকৃত উপন্যাস
'শায়াতিন'
জাগৃতি প্রকাশনী

হরর উপন্যাস 'ছায়ারীরী'
বিদ্যা প্রকাশ

এ ছাড়াও
আছে–
ভালবাসার
সমস্যা
সমাধানে

'প্রিয় সম্পর্ক'
জাগৃতি প্রকাশনী

ঘরে বসেই রুমানা বৈশাখীর যে-কোনও বই কিনতে ডায়াল করুন–
মিট মনস্টার: ০১৭৩৫-৮৯৮৫৪৬ নম্বরে। কুরিয়ার চার্জ মাত্র ২৫ টাকা।
ফেসবুকে সম্পূর্ণ বইয়ের তালিকা দেখতে ভিজিট করুন–
https://www.facebook.com/meatmonsterr/
এ ছাড়াও কিনতে পারেন রকমারি ডট কম থেকে। ফোন: ১৬২৯৭।

খোলা চিঠি

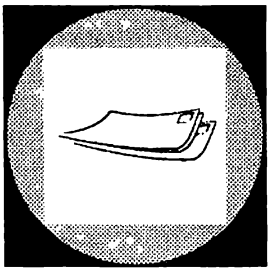

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নন

আকাশ আহমেদ (জারসা)
কুষ্টিয়া।

ভালবাসা আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর, এত সার্থক। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি ভালবাসা ছিল, আছে এবং থাকবে। ইংরেজি Love শব্দের পূর্ণরূপ: L-Loss, O-of, V-Valuable, E-Energy, যার অর্থ মহামূল্যবান শক্তি বিনষ্ট বা ক্ষয়। যারা ভালবাসে তারা সত্যিই কি মহামূল্যবান শক্তি বিনষ্ট করে? ভালবাসা এমনই হয়। আমার ভালবাসা রহস্যপত্রিকাকে ঘিরে, যার জন্য অপেক্ষায় থাকি দিনের পর দিন। বিভিন্ন ফিচার, থ্রিলারধর্মী গল্প সত্যিই মানব মনে গতি সঞ্চার করে। গল্পগুলো নতুন করে মনকে বেগবান করে। এর জন্যই তো এত কষ্ট করে পড়া, কেনা এবং মুখিয়ে থাকা। রহস্যপত্রিকা, তুমি ছিলে, আছ, থাকবে, সীমাহীন স্বপ্নে, আমাদের হাসিমুখে।

মাসুম বিল্লাহ
ঠিকানা নেই।

ঢাকা শহরের আধুনিকতার সাথে আমার প্রায় বনে না। আমি নিয়মিত হোঁচট খেতে থাকি। কয়েকদিন আগে আমার অফিস বসের বাসায় কোনও একটা কাজে যাই। গিয়ে তাঁর আট-নয় বছরের মেয়ের সাথে কিছু কথোপকথন হয়। মেয়েটা গত বছর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। কথা বলে মনে হলো মেয়ে বেশ বুদ্ধিমান। কথাবার্তায় বেশ চটপটে। প্রথমেই আমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, আমি ফল খাব কি না। শুনে ভাল লাগল আমার। এতটুকুন একটা মেয়ে ইংরেজিতে কথা বলে নীরবে আমাকে লজ্জা দিল! আমি তো ইংরেজিতে সাবলীল না। কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম, সে হিন্দি ভাষা বোঝে কি না। জানাল, বোঝে। এরপর আমার বাংলায় করা প্রতিটি প্রশ্নকে হিন্দিতে নিখুঁতভাবে অনুবাদ করে দিল। শুনতে বেশ লাগল। আচমকাই মনে হলো, এই রে, মেয়েটা তো বাংলাই ঠিক মত বলতে পারে না, দেখে দেখে পড়তে পারা তো দূরে থাক। ভেবে দেখেছেন কি, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা কী পাবে? সেদিন কে যেন আমাকে প্রশ্ন করে, 'ভাই, স্বাধীনতার মানে কি শুধু প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আমি তো এ ছাড়া আর কোনও মানে খুঁজে পাই না। আপনি পান

বিজ্ঞপ্তি

রহস্যপত্রিকায় লিখতে হলে লেখার সাথে অবশ্যই ফেরত খাম (নাম-ঠিকানা সহ) বা পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা মনোনীত হোক বা না হোক আপনাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আমাদের মনোনীত কোনও লেখা অন্য কোনও পত্রিকায় পাঠালে অবশ্যই যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে সেই লেখাটা আমরা ছাপব না। খোলা চিঠি ও প্রশ্নোত্তর বিভাগগুলোর জন্য ফেরত খাম পাঠাতে হবে না। যে-কোনও লেখার কপি রেখে পাঠাবেন, তবে ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

কি?' তখন আমি কোনও জবাব দিইনি। তবে মনে-মনে ঠিকই বলেছি, ভাই, আপনার কথা তো আমারও মনের কথা। কিন্তু আমরা কার কাছে জানতে চাইব, কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর? যাঁদের দেবার কথা, তাঁরা তো দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। দেশটা রসাতলে যাক, আর তাঁরা লুটেপুটে খাবেন–ভাবটা তাঁদের এমনই। হায়, জবাবদিহিতার যে বড় অভাব এই দেশটায়! নইলে কি আজ দেশটার এই অবস্থা হয়?

স্বাধীনতার আজ ছেচল্লিশ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেশটার প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ জনগণ এখনও পায় না। প্রতিদিন সীমান্তে প্রাণ দিচ্ছে আমাদের নিরীহ জনগণ। দেশের সীমান্তবর্তী জনগণ মৃত্যুভয়ে ভীত দিনরাত। প্রিয়জনের লাশ বুকে নিয়ে ক্রন্দন চলে প্রতিটা দিন। এ সবই স্বাধীন একটা দেশের প্রতি বাঘা আরেক দেশের স্বীকৃতি। ভারত থেকে সকালে কিছু শিল্পী আসে অনুষ্ঠান করতে, রাতে সেই অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের কিছু শহুরে শিল্পী মেতে থাকে অপসংস্কৃতিতে আর ভোরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আমার ভাইয়ের লাশ পাঠায়।

যখন আমার দেশের শিল্পী ভিসা পায় না, আমার দেশের কোনও চ্যানেল সেদেশে প্রদর্শনের অনুমতি পায় না, তখন সেদেশের শিল্পীরা সকালে এসে বিকালে অপসংস্কৃতিতে ডুবিয়ে যায় আমাদের। এই লজ্জা কার? অতীতে শাসন করত পাকিস্তান নামে বিজাতীয় একটা দেশ। এখন শাসন করে নিজেরা নিজেদের। কেউ ভালবাসে না দেশটাকে, নইলে কি আর দেশের চেহারা এমন হয়? নেতা-নেত্রীর মুখে শুধু মিথ্যে ভাষণ–এই করব, সেই করব। আসলে সবই তাঁদের ভোট কেনার আর দল টিকিয়ে রাখার আয়োজন। তাই তো বলি, প্রতি বছর বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে স্বাধীনতা দিবস আর বিজয় দিবস পার করলেই স্বাধীনতার মানে প্রতিষ্ঠিত হয় না। দেশের জন্য দরদ চাই, প্রেম চাই। মানুষের জন্য চাই ভালবাসা। তবেই দেশটা সত্যিকারের স্বাধীনতার সুখ ভোগ করতে পারবে। নইলে একটু-একটু করে পিছিয়েই যাবে। আহা রে, কী সুন্দর একটা দেশ, শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে আর কিছু মাথামোটা মানুষের কারণে দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।■

প্রকাশিত হয়েছে
ওয়েস্টার্ন
দুঃস্বপ্ন
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

বন্দুক সারাতে শহরে এসে গোলাগুলির মুখে পড়ে গেল নেভিল। একাই আতঙ্ক হয়ে উঠল তিন ব্যাঙ্ক ডাকাতের জন্য। ওর গুলিতে মারা পড়ল দুই ডাকাত, আরেকজন পালাল লেজ তুলে। কিন্তু সেখানেই থেমে রইল না ঘটনা। ক'দিন পর দুঃস্বপ্নের মতো হাজির হলো উড়ো চিঠি। বাপ-ভাই হত্যার বদলা নেবার হুমকি দিয়েছে পলাতক ডাকাত। ফিরে আসবে সে, অবশ্যই! দীর্ঘ আটটি বছর অদৃশ্য সেই হুমকি তাড়া করে ফিরল নেভিলকে। ততদিনে সংসারী হয়েছে ও, কাঁধে তুলে নিয়েছে স্থানীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব। জীবনে হানা দিয়েছে নতুন সমস্যা। রাতারাতি উদয় হওয়া দুই প্রতারকের খপ্পর থেকে সরল মানুষদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছে সবার শত্রু। তারই মাঝে আবার ফিরে এল সেই পলাতক ডাকাত–চিঠির পাতা ছেড়ে, সশরীরে ওর দোরগোড়ায় উদয় হলো দুঃস্বপ্ন। প্রতিশোধ নেবে।

দাম ■ চুরাশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা,
ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার,
ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার,
ঢাকা ১১০০

সেবা

রুবেল কান্তি নাথ

'আবু বকর (রাঃ) খলিফা হয়েছেন, তাতে তোমার কী অসুবিধা হয়েছে?'

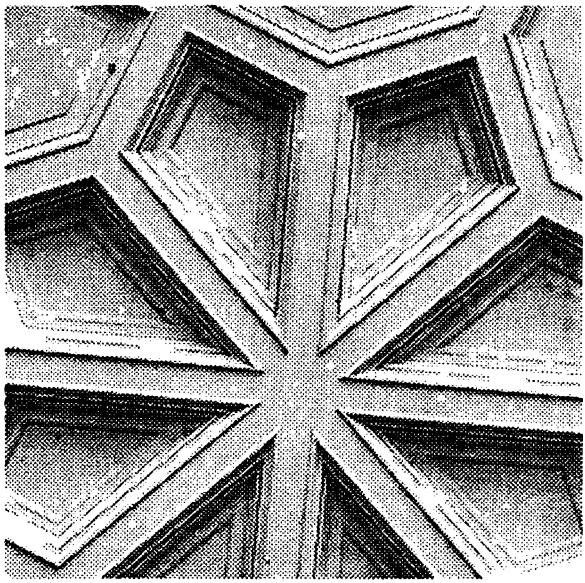

হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে–একথা যখন ঘোষণা করা হলো, তখন মহল্লার একটি গরিব মেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আবু বকর (রাঃ) খলিফা হয়েছেন, তাতে তোমার কী অসুবিধা হয়েছে?'

মেয়েটি বলল, 'আমাদের ছাগলগুলোর কী হবে?'

'এর অর্থ কী?'

'এখন তো তিনি খলিফা হয়ে গেছেন। আমাদের ছাগল ক'টার দেখাশোনাই বা কে করবে? ওগুলোর দুধই বা কে দুইয়ে দেবে?'

ওর প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া কারও পক্ষেই সম্ভব হলো না।

পরদিন খুব ভোরে মেয়েটি অবাক হয়ে দেখল, হযরত আবু বকর (রাঃ) যথাসময়ে তাদের বাড়ি এসেছেন। এবং দুধ দোহাচ্ছেন!

তিনি যাওয়ার সময় বললেন, 'মা, তুমি একটুও চিন্তা কোরো না। আমি প্রতিদিন এভাবেই তোমার কাজ করে দিয়ে যাব।'

মেয়েটির বিচলিত হওয়ার সংবাদ শুনতে পেয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আশা করি,

২/৫/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
কিশোর থ্রিলার
ভলিউম-১৪১/২
তিন গোয়েন্দা
শামসুদ্দীন নওয়াব
ডাইনোসরের হাড়/শামসুদ্দীন নওয়াব: জাদুঘরে গেছে তিন গোয়েন্দা। কিশোর আবিষ্কার করল প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর সিলোফিসিসের তিনটে হাড় খোয়া গেছে। কর্তৃপক্ষকে জানাল ওরা। তারা বিশ্বাস করল না। অগত্যা তদন্তে নামতে বাধ্য হলো তিন গোয়েন্দা।
কার্নিভাল/শামসুদ্দীন নওয়াব: মার্লিনের নির্দেশে জাদুর ট্রী-হাউসে চেপে প্রাচীন ভেনিসে গেল কিশোর আর জিনা। এবারের মিশন; লেগুনের গ্র্যাণ্ড লেডিকে রক্ষা করা। কিন্তু এজন্য দরকার সাগরের শাসকের সাহায্য। ঘটনাচক্রে, কারাগারে বন্দি হলো কিশোর আর জিনা! অন্যকে উদ্ধার করবে কি, আগে নিজেরা বাঁচুক তো!
জলদানবী/শামসুদ্দীন নওয়াব: রাশেদ পাশার সঙ্গে পাহাড়ী এলাকায় বেড়াতে গেছে তিন গোয়েন্দা। জানতে পারল ওখানকার হ্রদে জলদানবী বাস করে। সন্দেহ হলো ওদের। কেউ কি লুসিল লজ-এর অতিথিদের তাড়াতে চাইছে? ভয় দেখিয়ে বন্ধ করে দিতে চাইছে শ্যারনের ব্যবসা? এক পর্যায়ে বেলাভূমিতে ওরা আবিষ্কার করল বিশাল এক সারি পদচিহ্ন। ওগুলো কি জলদানবীর পায়ের ছাপ? নতুন রহস্যে জড়িয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

খেলাফতের দায়িত্ব আমার সেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমি আগের মতই দরিদ্র মেয়েটির ছাগল দোহন করে দিয়ে আসব।'

আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের আগে তিন বছর এবং খেলাফতের পরে এক বছর পর্যন্ত মহল্লার দরিদ্র পরিবারগুলোর ছাগলের দুধ দোহন করে দিয়ে আসতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলিফা হন, তখন মদিনার এক অন্ধ বুড়ির বাড়ির কাজ-কর্ম নিজ হাতে করে দিতেন হযরত ওমর (রাঃ)। বুড়ির প্রয়োজনীয় পানি এনে দিতেন। করে দিতেন বাজার-সওদা।

একদিন ওমর (রাঃ) সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, বুড়ির বাড়ি একদম ঝকঝকে-তকতকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কলসিতে পানি আনা হয়েছে। করা হয়েছে বাজারও। তিনি ভাবলেন, বুড়ির কোন প্রতিবেশী হয়তো কাজগুলো করে দিয়ে গেছে।

পরদিনও দেখলেন একই অবস্থা। সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। এবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর কৌতূহল হলো। ভাবলেন, এই মহানুভব ব্যক্তিটি কে, তা না দেখে ছাড়বেন না।

একদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে তিনি লুকিয়ে রইলেন। দেখলেন, খুব ভোরে এক ব্যক্তি বুড়ির বাড়ির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বুঝতে পারলেন, ইনিই সেই মহান ব্যক্তি, যিনি তাঁরও আগে এসে বুড়ির সমস্ত কাজ সেরে দিয়ে যান।

ব্যক্তিটি বুড়ির ঘরের মধ্যে এসে যখন কাজ শুরু করে দিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) গিয়ে দেখলেন, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং খলিফা আবু বকর (রাঃ)!

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'হে, রাসুলের প্রতিনিধি, মুসলিম জাহানের শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই বুড়ির তদারকিও চালিয়ে যেতে চান নাকি?'

খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলেন। এবং যথারীতি কাজ করতে লাগলেন! ■

(অনলাইন রচনা অবলম্বনে)

কম দাঁত, বেশি দাঁত

ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ

আমাদের দেশে মিডিয়া
জগতে এমন নায়ক-নায়িকা
আছেন যাদের
হাসি বিউটি দাঁতের
জন্যই সুন্দর।

মানবদেহে দুধ দাঁতের সংখ্যা মোট ২০টি। আর স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৪টি আক্কেল দাঁত সহ মোট ৩২টি। কিন্তু কখনও-কখনও এ সংখ্যায় তারতম্য লক্ষ করা যায়। দাঁতের সংখ্যায় হেরফেরের কারণে দাঁতের রোগ থেকে শুরু করে মুখের সৌন্দর্য পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

অ্যানোডনসিয়া

যখন কোন মানুষের মুখে একটিও দাঁত দেখা যায় না তখন এ অবস্থাকে অ্যানোডনসিয়া বলে। তবে এ ধরনের ঘটনা বিরল। কিন্তু আংশিক অ্যানোডনসিয়া দেখা যেতে পারে।

অলিগোডনসিয়া এবং হাইপোডনসিয়া

আমেরিকান পদ্ধতিতে এক বা একের অধিক দাঁত মুখে না থাকলে এ অবস্থাকে অলিগোডনসিয়া বলা হয়। আর ব্রিটিশ পদ্ধতিতে একে হাইপোডনসিয়া বলা হয়। দুধ দাঁতের ক্ষেত্রে সাধারণত শূন্য দশমিক ১ থেকে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া যায় আর স্থায়ী দাঁতের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৫ থেকে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত দেখা যায়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

কারণসমূহ

ক. জেনেটিক কারণে হতে পারে; খ. একটোডারমাল ডিসপ্লাসিয়া; গ. ডাউন সিনড্রোম। অলিগোডনসিয়া বা হাইপোডনসিয়াতে উপরের দাঁত এবং নিচের দাঁতের স্বাভাবিক রিলেশন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থোডনটিক চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে।

হাইপারডনসিয়া

যখন মুখে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দাঁত দেখা যায় তখন একে হাইপারডনসিয়া বলা হয়। তবে হাইপারডনসিয়া থেকে আমাদের দেশে এ অবস্থাটি সুপারনিউমারারি টুথ নামে বেশি পরিচিত। দুধ দাঁতের ক্ষেত্রে সুপারনিউমারারি টুথ দেখা যায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ আর স্থায়ী দাঁতের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২ শতাংশ। সাধারণত দাঁতের উপরের পাটিতে বেশি দেখা যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ক্ষেত্রে সুপারনিউমারারি টুথ বেশি দেখা যায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে সুপারনিউমারারি টুথ থাকলেও হাসি দিলে সুন্দর দেখায়। সেক্ষেত্রে দাঁত তোলার পরামর্শ না দিয়ে বিকল্প চিকিৎসা দেয়া উচিত। উপরের ক্যানাইন দাঁতকে বিউটি টুথ বলা হয়। উপরের ক্যানাইন দাঁত যদি একটু উঁচু থাকে বা দাঁতের পুরুত্ব বেশি থাকে তখন কেউ হাসি দিলে শুধু দাঁতটির জন্য হাসি সুন্দর দেখায়। আমাদের দেশে মিডিয়া জগতে এমন নায়ক-নায়িকা আছেন যাদের হাসি বিউটি দাঁতের জন্যই সুন্দর। তবে সুপারনিউমারারি দাঁতের জন্য যদি ক্রাউডিং হয় বা দাঁত আঁকাবাঁকা হয় তাহলে অবশ্যই অর্থোডনটিক চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে। ■

মোবাইল: ০১৮১৭-৫২১৮৯৭
ই-মেইল: dr.faruqu@gmail.com

লাট্টু আর বল

মূল ▮ হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন
রূপান্তর ▮ খসরু চৌধুরী

'আমি খুব ভাল করেই জানি সে কোথায় আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লাট্টু; 'সে আছে সোয়ালোর বাসায়, বিয়ে করেছে সোয়ালোকে।'

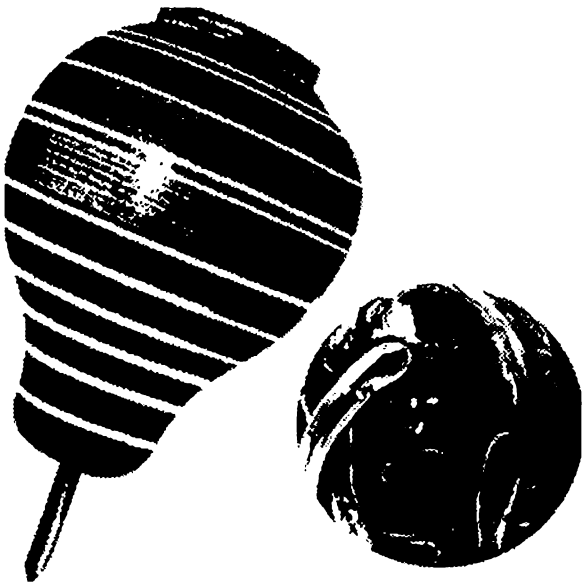

টইপিং জাতের একটা লাট্টু আর ছোট একটা বল একত্রে রাখা আছে এক বাক্সে, অন্যান্য খেলনার মাঝে, আর লাট্টু বলকে বলল, 'আমরা দু'জন কি বিয়ে করে ফেলব, যেহেতু একই বাক্সে আমরা বাস করি?'

কিন্তু বলটা, পরনে যার মরক্কো চামড়ার পোশাক, মাথায় আর দশটা তরুণীর মতই নিজেকে নিয়ে চিন্তার বোঝা, জবাব দিতে পর্যন্ত রাজি হলো না।

পরদিন এল ছোট ছেলেটা, এই খেলনাগুলো যার, সে-ই লাল আর হলুদ রঙ করেছে লাট্টুটার গায়ে, আর মাঝখানে মেরেছে পেতলের মাথাঅলা একটা পেরেক, ফলে লাট্টুটা যখন বনবন করে ঘোরে তাকে দেখতে লাগে চমৎকার।

'দেখো আমাকে,' বলল লাট্টু বলকে। 'এখন কী বলবে তুমি? আমাদের বিয়ের বাগ্‌দান কি হয়ে যাবে? আমাদের মানাবে খুব ভাল; তুমি লাফাবে; আর আমি নাচব। আমাদের চেয়ে সুখী দম্পতি আর কেউ হবে না।'

'তাই নাকি! এরকম মনে হয় তোমার? হয়তো তুমি জানো না যে আমার বাবা-মা দু'জনেই ছিল মরক্কোর চটি, আর আমার শরীরের ভেতরে রয়েছে একটা স্প্যানিশ ছিপি।'

'হ্যাঁ; কিন্তু আমি মেহগনির তৈরি,' বলল লাট্টু। 'মেজর স্বয়ং আমাকে তৈরি করেছে। তার আছে নিজের একটা লেদ, সেখানে কাজ করে সে খুব মজা পায়।'

'কথাটা বিশ্বাস করতে পারি?' জানতে চাইল বল।

'আমার যত্ন যেন আর কখনওই নেয়া না হয়,' বলল লাট্টু, 'যদি তোমাকে সত্য বলে না থাকি।'

'স্বপক্ষে কথা বলাটা নিশ্চয়ই তুমি খুব ভাল জানো,' বলল বল, 'কিন্তু তোমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারছি না। একটা সোয়ালো পাখির সঙ্গে আমার বাগ্‌দান প্রায় হয়েই গেছে। যতবার আমি লাফিয়ে উঠি শূন্যে, সে মাথা বের করে বাসা থেকে, আর বলে, 'হবে?' তো, আমি বলেছি, 'হ্যাঁ,' তবে মনে-মনে, নীরবে, আর এই নীরবে বলা অর্ধেক বাগ্‌দানের মতই; কিন্তু তোমার কথা জীবনেও ভুলব না, এরকম একটা কথা অবশ্য আমি তোমাকে দেব।'

'তাতে খুব উপকারই হবে আমার,' বলল লাট্টু; তারপর আর কোনও কথা তারা বলল না।

পরদিন বলটাকে নিয়ে বাইরে গেল ছেলেটা। লাট্টু দেখল সেটাকে শূন্যে উড়ে উঠতে, পাখির মত, উড়তে-উড়তে সেটা চলে যাচ্ছে প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইরে। যতবার সেটা ফিরে আসছে, মাটি স্পর্শ করতেই, আবার লাফিয়ে উঠছে আগের বারের চেয়েও উঁচুতে, কারণ, হয় সেটার ওপরদিকে উড়ে ওঠার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, নয়তো শরীরের ভেতরে একটা স্প্যানিশ ছিপি থাকায়। কিন্তু নবম বার শূন্যে লাফিয়ে উঠে, সেটা থেকেই গেল, আর ফিরল না। সব জায়গায় খুঁজল ছেলেটা, কিন্তু তার এই খোঁজা ব্যর্থ হলো, কারণ, সেটাকে আর পাওয়া গেল না; হারিয়ে গেল বলটা।

'আমি খুব ভাল করেই জানি সে কোথায় আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লাট্টু; 'সে আছে সোয়ালোর বাসায়, বিয়ে করেছে সোয়ালোকে।'

যত বেশি লাট্টু ভাবল ঘটনাটা নিয়ে, তার আকাঙ্ক্ষা হলো আকুল থেকে আকুলতর, বলটার জন্য। তার ভালবাসা বেড়ে গেল, কেবল সে তাকে পেল না বলেই; আর তাকে জিতে নিয়েছে অন্য কেউ, ভাবার পক্ষে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। গুঞ্জন তুলে লাট্টু তার পাক খাওয়া অব্যাহত রাখল, কিন্তু বলটার ভাবনা সে ভেবেই চলল; আর যতই সে ভাবল, তার কল্পনায় আরও যেন বেড়ে গেল বলের সৌন্দর্য।

এভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর, তার ভালবাসা হয়ে গেল বেশ পুরানো। লাট্টুকেও এখন আর তরুণ বলা চলে না; কিন্তু এমন একটা দিন এল যেদিন তাকে দেখাল সবচেয়ে সুন্দর, কারণ, তাকে আগাগোড়া গিলটি করা হয়েছে। এখন সে একটা সোনালি লাট্টু, বনবন করে পাক খেয়ে-খেয়ে নাচতে-নাচতে একসময় সে গুঞ্জন তোলে বেশ জোরে, আর তখন হয় দেখার উপযুক্ত; কিন্তু একদিন সে লাফিয়ে উঠল অনেক বেশি ওপরে, তারপর, সে-ও হারিয়ে গেল। তাকে খোঁজা হলো সব জায়গায়, এমনকী তলকুঠুরিতে, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তাহলে সে কোথায় থাকতে পারে? সে লাফ দিয়ে পড়েছে ডাস্টবিনে, যেখানে পড়ে আছে যাবতীয় আবর্জনা: বাঁধাকপির বৃন্ত, ধুলোবালি, ছাঁদের নিচের পয়োনালী দিয়ে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা।

'বেশ ভাল জায়গাতে এলাম দেখছি,' বলল লাট্টু; 'এখানে শিগ্‌গিরই ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে আমার গিলটি। হায়রে, কোন্ সব ছোটলোকেদের মাঝে এসে পড়লাম আমি!' তার চোখ পড়ল পুরানো আপেলের মত

২১/৫/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
অনুবাদ
জুল ভার্ন-এর
দ্য লটারি টিকেট
রূপান্তর: সাঈম শামস্
মেয়ে হালদা আর ছেলে জয়েলকে নিয়ে ছোট্ট সংসার হ্যানসেনের। খালাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হালদার, এই সময় নতুন সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে সাগরপাড়ি দিল মেয়েটির হবু বর ওলি। সপ্তাহ পেরোল, মাস পেরোল, যুবক আর ফেরে না। কী হয়েছে ওর? ও কি শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারল বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর কাছে? প্রেম, বিরহ, অ্যাডভেঞ্চার, সাসপেন্স, হিউমার–সব মিলিয়ে জুল ভার্ন-এর আরেকটি ক্লাসিক উপন্যাস, যেটির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে বোতলবন্দি রহস্যময় এক লটারি টিকেট।
দাম ■ আটাত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

চেহারার আজব এক জিনিসের ওপর, যেটা পড়ে আছে একটা বাঁধাকপির পাতাহীন লম্বা বৃন্তের কাছে। যাই হোক, জিনিসটা আপেল নয়, পুরানো একটা বল, বছরের পর বছর পড়ে থাকতে-থাকতে সে পুরোপুরি ভিজে গেছে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে এসেছে আমার নিজের শ্রেণীর একজন মানুষ, যার সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারব,' বলল বল, গিলটি করা লাট্টুটাকে পরীক্ষা করতে-করতে। 'আমি মরক্কো চামড়ার তৈরি,' বলল সে। 'আমাকে সেলাই করেছে এক তরুণী, আর আমার শরীরের ভেতরে রয়েছে একটা স্প্যানিশ ছিপি; কিন্তু এখন সেসব কথা আর কেউ ভাবে না, ফলে তাকায় না আমার দিকে। একবার আমার বাগ্‌দান হয়েছিল এক সোয়ালোর সঙ্গে; কিন্তু এখানে আমি পড়ে গেছি ছাদের নিচের পয়োনালী দিয়ে, আর এখানেই আমি পড়ে আছি পাঁচ বছরেরও বেশি, ভিজে গেছি পুরোপুরি। বিশ্বাস করো, একজন তরুণীর পক্ষে এটা অনেক লম্বা একটা সময়।'

লাট্টু কিছু বলল না, কিন্তু সে ভাবল তার পুরানো ভালবাসার কথা; আর যত বকবক করল বলটা, ততই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটাই সেই পুরানো বল।

তারপর ভৃত্য এল ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে।

'বাহ্,' বলল ভৃত্য, 'গিলটি করা একটা লাট্টু।' সুতরাং আবার লাট্টুটা পেল মনোযোগ আর সম্মান, কিন্তু ছোট বলটার কোনও কথাই আর শোনা গেল না। লাট্টু আর একটা কথাও বলল না তার পুরানো ভালবাসা নিয়ে; কারণ, শিগ্‌গির মরে গেল সেই ভালবাসা। যখন ভালবাসার কেউ পাঁচ বছর ধরে নালায় পড়ে থাকে, আর ভিজে যায় তার সর্বাঙ্গ, তখন আবার তার সঙ্গে কখনও ডাস্টবিনে দেখা হলে, তাকে নতুন করে জানার ধার আর কেউই ধারে না। ■

সিএন টাওয়ার অভ টরন্টো

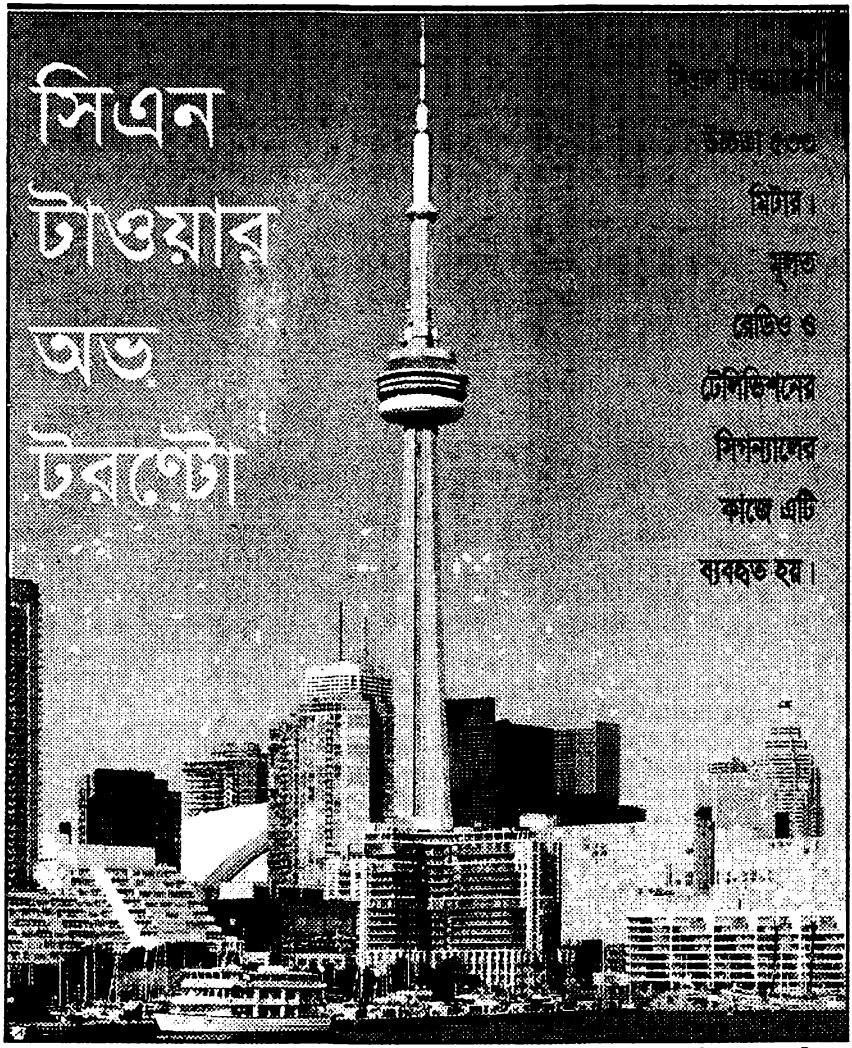

উচ্চতা ৫৩৩ মিটার। মূলত রেডিও ও টেলিভিশনের সিগন্যালের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

টরন্টো শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় দর্শনীয় জায়গা হলো সিএন টাওয়ার। এটি 'দ্য কানাডিয়ান ন্যাশনাল টাওয়ার'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টরন্টো শহরের দক্ষিণাংশের শেষ ভাগে লেক অন্টারিওর পাড়ে এর অবস্থান। সিএন টাওয়ারের উচ্চতা ৫৩৩ মিটার। মূলত রেডিও ও টেলিভিশনের সিগন্যালের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি এটি দর্শনার্থীদের কাছেও আকর্ষণীয়। ১৯৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ে এটির নির্মাণ কাজ শুরু করে। সপ্তাহের পাঁচ দিনের প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা করে কাজ চলে এবং চল্লিশ মাসে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৯৭৬ সালের ২৬ জুন থেকে এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। টাওয়ারের শেষ ভাগে রয়েছে পর্যবেক্ষণ ডেক, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এখানে দাঁড়িয়ে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়।■

সংগ্রহে: নাজিরা তাসলিম

কষ্ট

তৌফিক উদ্দিন

তারা আসলে পাকিস্তানি সৈন্যদের ফেলে দেয়া অস্ত্র হাতে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবং নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে জাহির করছিল।

এক

বাকির আলী এক দুঃসহ যন্ত্রণার শিকার হন কখনও। এই যন্ত্রণার উৎস তাঁর পরিবারের লোকজন। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন। ওই অর্বাচীনরা তাঁকে দিশাহারা করবার জন্যই জোটবদ্ধ হয়েছে যেন। শ্যালক শামীম ফকির হঠাৎ একদিন উদয় হয়ে বলল, 'দুলাভাই! মুক্তিযোদ্ধাদের লেটেস্ট লিস্ট বের হয়েছে–'

'তো?' বাকির আলী ভুরু কুঁচকালেন।

'এই লিস্টেও নাম নেই তোমার।' বলে শ্যালকপ্রবর ফিচেল হাসি দিল একটা।

উনিশ শ' আশির দশকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি জাতীয় তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আবেদনের জন্য সংবাদপত্রে ফরম ছাপা হয়। সে ফরম বিতরণও করা হয়। বাকির আলী তখন একান্ত অনুগত সরকারী কর্মচারী। চাকরি জীবনের বাইরে কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ধাতে ছিল না বলে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কাজটি কখন কীভাবে যে হয়ে গেল টেরও পেলেন না। জাতীয় তালিকায় তাঁর নাম উঠল না।

এবং এই একঝোঁকা স্বভাবের জন্যই বুঝি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটার

তালিকায়ও নাম ওঠেনি তাঁর।

বাকির আলী নব্বই দশকের শেষ দিকে অবসরে গেলেন। এরপর অনেক সরকারই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের টাটকা তালিকা বের করেছে একটি করে। কোনওটিতেই তাঁর নাম নেই। থাকবে কী করে? তাঁকে যাচাই-বাছাই কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হলে তাঁর সাফ জবাব থাকত, তিনি যাবেন না। যানওনি। এই অনীহার পিছনে তাঁর যুক্তি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের অভিজ্ঞতা। তাঁদের কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছে যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্যদের নিরতিশয় সন্দিহান দৃষ্টি উপেক্ষা করে, তাঁদের মন ভিজিয়ে এ বয়সে নিজেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণের কসরত করা লজ্জাকর তো বটেই, অসম্মানজনকও। ও কাজটি তাঁর দ্বারা হবার নয়।

'তুমি নিশ্চয়ই সিক্সটিন্থ্ ডিভিশন!' আনমনা দুলাভাইকে শ্যালকের মোক্ষম ঘাই এবার। 'নইলে তালিকায় কোনওবারই তোমার নাম থাকে না কেন?'

বাকির আলী বুকের মধ্যে কষ্টের তোলপাড় টের পেলেন। এই কষ্ট তাঁর কাছে প্রসববেদনার থেকেও বেশি মনে হলো। যদিও পুরুষমানুষ হওয়ায় প্রসববেদনা কী জিনিস তিনি জানেন না। কিন্তু তার স্বরূপ স্বচক্ষে দেখেছেন। সে কষ্টের গোঙানি নিজের কানে শুনেছেন।

তাঁর স্ত্রী আকলিমা বেগম।

প্রথম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সে কী আক্ষেপ তাঁর, এক-আধটু তো নয়–টানা দু'ঘণ্টা: কাটা মুরগির মত উথাল-পাথাল কষ্টের আক্ষেপ! চোখে না দেখলে সে-কষ্ট বোঝা দায়–কাউকে বোঝানোও দায়–সেদিনই বুঝে গিয়েছিলেন এই দুনিয়ায় প্রসববেদনার চেয়ে জবর কষ্ট দ্বিতীয়টি নেই কোনও।

বাকির আলী বোবা চোখে তাকালেন। তাঁর এই শ্যালক পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। বিয়ের সময় এতটুকুন ছিল। বলতে গেলে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন তাকে। এখন একটি বিদেশি কোম্পানির বড় এক্সিকিউটিভ। মোটা মাইনে। শাণিত চেহারা। চোখা বুদ্ধি। দুনিয়ার মডার্ন সব খবর মাশাআল্লাহ তার নখদর্পণে। বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনা প্রবাহ তো বটেই, তার ভবিষ্যৎ রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কেও সে অবিরাম বলে যেতে পারে নাগাড়ে। কথাবার্তায় রুচিশীল, আধুনিক মনের মানুষ একজন। অথচ তাঁকে বিব্রত করার বেলায় খাঁটি গ্রাম্য মোড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'সিক্সটিন্থ্ ডিভিশন কী, কী তার জন্মবৃত্তান্ত, জানিস কিছু?'

'আলবত জানি, অফ কোর্স, বলব?'

'বল্।'

'ওই যে, পাক আর্মির "বাঘা" জেনারেল নিয়াজি!' শামীম ফকিরের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'তাঁর আত্মসমর্পণের পর ষোলোই ডিসেম্বর রাত্রি থেকে এত দিন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করা অনেক তরুণ বিজয়ী পক্ষে যোগ দেয় এবং বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়। সতেরোই ডিসেম্বর তাদের অনেকের হাতেই চীনা AK47 রাইফেল আর স্টেন গান দেখা যায়। তারা আসলে পাকিস্তানি সৈন্যদের ফেলে দেয়া অস্ত্র হাতে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবং নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে জাহির করছিল। ষোলোই ডিসেম্বর নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর এই "ভুঁইফোড় মুক্তিযোদ্ধা" বাহিনীর উৎপত্তি ঘটে বলেই–'

'আমাকে কি ওই দলভুক্ত মনে করিস তুই?' কথা শেষ না হতেই বাকির আলীর বেদনার্ত প্রশ্ন।

শামীম ফকির ওসব খেয়াল করল থোড়াই। বরং বাকির আলীর বুকের কষ্ট আরও উসকে দেয়ার জন্যই বুঝি জবাবের কাছে-পিঠে না ঘেঁষে চোখ ঠেরে সহাস্যে বলল, 'বাউনা বদির নামও এবার মুক্তিয়োদ্ধাদের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে, জানো, দুলাভাই!'

বাকির আলী নড়েচড়ে বসলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন অনেকগুলো বছর। বাউনা বদি তাঁর গ্রামের ছেলে। পুঁচকে বয়স থেকেই বদের ধাড়ি। বয়স চোদ্দ অতিক্রমণের পর ওই লক্ষ্মীছাড়ার বদ কাজের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে অস্থির গ্রামবাসী তাকে 'বদি' ডাকা শুরু করেছিল। ষোলো বছর বয়সেও উচ্চতা তার এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকলে সে বন্ধুমহলে 'বাউনা বদি' হয়ে গেল। এবং এই বাউনা বদি নাম যারপরনাই সমাদৃত হলো সবার কাছে। তখন তার আব্বাহুজুরের

দেয়া বাহারি নামটা এলাকার মানুষ ভুলেই গেল একরকম।

একাত্তরে বাউনা বদির বয়স আঠারো বছর। দশম শ্রেণীর ছাত্র। উচ্চতা পাঁচ ফুটেরও কম। পঁচিশ মার্চের কালরাত্রির পর সে ঝাড়েমূলে পরিবর্তন হলো। সে যাবতীয় বদ কাজ দূরে ঠেলে রেখে সুবোধ বালক বনে গেল একদম।

বাউনা বদি আর কারও মুরগির খোঁয়াড় লোপাট করে না; বাহাদুরির নেশায় মেতে কোনও ফলবান বৃক্ষের সর্বনাশ ডেকে আনে না; ভরসন্ধ্যায় কাউকে ভয় দেখাতে কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে বাঁশবনের অন্ধকারে বসে থাকে না; রাতবিরাতে গেরস্তবাড়ির টিনের চালায় ঢিল ছুঁড়ে গেরস্তের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় না; পথচারিণী কোনও ষোড়শীর মন পাবার অলীক আহ্লাদে মেতে, তার মনে শঙ্কা সৃষ্টি করে হেঁড়ে গলায় রোমান্টিক গান গেয়ে ওঠে না।

আগেকার এইসব অপকর্মের জ্বালায় গ্রামবাসী অস্থির থাকলেও বন্ধুমহলে ডাকাবুকো হিসাবে বাউনা বদির আলাদা খাতির ছিল একটা। এ ছাড়া তার মানুষকে হেনস্তা করার নব-নব কৌশল উদ্ভাবনের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ বন্ধুমহল তাকে বেশ সমীহও করত।

পঁচিশে মার্চের পর তারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল কোথাও গোলাগুলির শব্দ হলেই বাউনা বদি ভয়ে অস্থির। সে দেরি না করে এক লাফে চৌকির নিচে আড়াল হয়। সময় বুঝে সেখান থেকে বের হয়ে দেয় ঝেড়ে দৌড়। এক দৌড়ে ধলেশ্বরী নদীর খেয়া পার হয়ে সোজা নানার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। নানীর নিরাপদ আঁচলতলের ওম পোহায়। এবং বিপদ বিলকুল সাফ জানলে তবেই গ্রামে ফেরে।

তার এমন কাপুরুষসুলভ পরিবর্তন দেখে বিরক্ত বন্ধুমহল ভারি নাখোশ হলো তার ওপর।

একদিন রুষ্ট বন্ধুরা বাউনা বদিকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে মুক্তিবাহিনীর লোকাল ট্রেনিং ক্যাম্পে আছড়ে ফেলল। একটা গ্রেনেড গুঁজে দিল হাতে। গ্রেনেড কী চিজ বাউনা বদি জানে। ঢাকা গিয়ে ঘন-ঘন ইংরেজি ওয়ার-মুভি দেখে ও-সম্পর্কে জ্ঞান তার টনটনে। সে একটা মরণ চিৎকার দিয়ে চোখ উল্টে পুরোপুরি ফিট। রাতভর দাঁতকপাটি তার। এবং পরদিন থেকে সে উধাও। গরুখোঁজা করেও তাকে খুঁজে বের করতে পারল না তার বন্ধুমহল।

বাউনা বদি গ্রামে ফিরল একাত্তরের বিশেই ডিসেম্বর রাতে। বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষ বিজয় অর্জন করার চার দিন পর। তার চেহারার মধ্যে একটা জেল্লা তখন। ফিরেই জাঁকের সঙ্গে বলে বেড়াতে লাগল, সে অনেক বর্ডার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সাহচর্যে কাটিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করেছে এত দিন।

তার কথা অবিশ্বাস করেনি কেউ। তারপরও তাকে ঘিরে সন্দেহের দাঁতাল একটা ছায়া সরলপ্রাণ গ্রামবাসীর মধ্যে রয়েই গিয়েছিল।

সন্দেহভাজন সেই বাউনা বদি–গুলির শব্দে ধলেশ্বরী পাড়ি দেয়া; গ্রেনেড হাতে ভয়ে ফিট হয়ে যাওয়া বাউনা বদি–সে-ও নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় এখন?

তাজ্জব কথা!

বাকির আলী দুঃসহ যন্ত্রণার ফোঁড় উপেক্ষা করে তাজ্জব চোখে শ্যালকের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

বাকির আলীর দুই সন্তান। এক মেয়ে এক ছেলে। ছেলে রাসেল একবার বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতেই আউট। সে রেজাল্ট দেখে এসে বাবাকে চেপে ধরল, 'বাবা, তুমি না মুক্তিযোদ্ধা?'

বাকির আলী অস্বস্তি বোধ করলেন। ছেলেকে এড়াতে বাসি দৈনিকটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। রাসেল ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'রবিন আমার থেকে ঢের কম নম্বর পেয়েও পাস করেছে, জানো?'

এরপর চুপ থাকা সমীচীন নয় বিবেচনা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিন কে?'

'আমার ফ্রেণ্ড।'

'রবিন কম নম্বর পেয়ে পাস করল কেমনে?'

'সে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, কোটার সুবিধা পেয়েছে, বুঝলে?'

বাকির আলী মিইয়ে গিয়ে ছোট্ট জবাব দিলেন–'হুঁ।'

'বাবা! তুমি আগে কেমন বুক চিতিয়ে বলতে তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।'

'হুঁ।'

'ঠিক বলতে কি?'

'হুঁ।'

'তাহলে তোমার প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে চাইলে তুমি দাও না কেন? তালবাহানা কর কেন?'

'হুঁ।'

'এত হুঁ-হুঁ কোরো না, বাবা! এটা কোশ্চেন অভ প্রেস্টিজ। রবিনের দাদার বাড়ি কিন্তু তোমাদের পাশের গ্রাম নয়নপুরে–মাথায় রেখো।'

এতক্ষণে টনক নড়ল। বাকির আলী মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে খাড়া চোখে তাকালেন। 'রবিনের বাবার নাম জানিস?'

'জানি বইকী। শমসের খাঁ–'

'শমসের খাঁ!'

বাকির আলীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে বসলে রাসেল অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এমন করছ কেন? চেন তাঁকে?'

বাকির আলীর কানে ছেলের কথা প্রবেশ করল না কিছুই। তাঁর অন্তরে তখন কষ্টের তুফান–নীড়ভাঙা কালবোশেখির দুরন্ত ছোবল–তিনি বোধশক্তিহীন অবস্থায় নিশ্চুপ বসে রইলেন ঠায়। রাসেল খানিক অপেক্ষা করে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'বাবা, কথা বলো, চুপ করে থাকবে না, আজ আমি সব প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব চাই। ...কী হলো, তুমি এখনও চুপ কেন? ...মুখ খুলছ না কেন? ...ভয় পাচ্ছ? ...আমি তাহলে কী বুঝব? সিক্সটিন্থ্ ডিভিশন তুমি?'

শেষ দুটি বাক্য–'আমি তাহলে কী বুঝব? সিক্সটিন্থ্ ডিভিশন তুমি?'–বাকির আলীর মস্তিষ্কের অলিন্দে ঝন-ঝন শব্দে আছড়ে পড়ল। বাকির আলী ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখফাটা দুঃসহ যন্ত্রণার অশ্রু লুকাতেই বুঝি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ■

১৫/৫/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে

মাসুদ রানা

মায়া মন্দির

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

মিতা কিডন্যাপ হয়েছে শুনেই বিসিআই চিফ বললেন, 'হাতে জরুরি কাজ নেই, তুমি যেতে পারো। বিদেশে মহা বিপদে পড়েছে মেয়েটা...' মিতা দত্তকে উদ্ধার করে আনতে ছুটল রানা হংকং-এ। ভাবতেও পারেনি ওই অদ্ভুত স্ফটিক আর পিচ্চি পাবলোর কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে তুলছে তিন পরাশক্তি মিলে! এদিকে পেছনে লেগে গেছে চিনা ও রাশান ভয়ঙ্কর দুই শত্রুর দল। ওদের পেছনে নিয়ে পৌঁছুল ও গুয়াতেমালার দুর্গম এক মায়া মন্দিরে! কিন্তু খালিহাতে কীভাবে ঠেকাবে রানা আধা-রোবট, হিংস্র ওই চিনে দস্যুকে? অসহায় বাঙালি গুপ্তচরকে বিশতলা উঁচু পাহাড় থেকেল্যাং মেরে নিচে ফেলল চাইনিজ বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি ল্যাং! এবার বুঝি শেষ হলো মাসুদ রানার লীলাখেলা!

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দু'হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে বিশ্বের চোদ্দ শতাংশ মানুষ পানির তীব্র হাহাকারে পড়বে বলে আশংকা ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘ।

নোনা পানি হবে সুপেয়!

কেবলমাত্র ছেঁকে নিলেই সাগরের নোনা পানি সুপেয় হয়ে উঠবে। এজন্য গ্রাফাইন-অক্সাইডের তৈরি বিশেষ ছাঁকনি তৈরি করেছে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এক অণুর সমান পুরু এ ছাঁকনির মধ্য দিয়ে পানি সহজেই যেতে পারবে। কিন্তু আটকে যাবে লবণসহ পানির সব আবর্জনা। আশা করা যাচ্ছে, এভাবে সস্তায় সাগরের পানি সুপেয় করার ব্যবস্থা হবে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জন্য এমন ছাঁকনি জীবনের নতুন আশ্বাস হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। দু'হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে বিশ্বের চোদ্দ শতাংশ মানুষ পানির তীব্র হাহাকারে পড়বে বলে আশংকা ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘ। তখন নিশ্চয়ই এ ছাঁকনি আবিষ্কারের কথায় অনেকটা স্বস্তি পাবে মানুষ।

পার্কিনসন্স ও জণ্ডিস!

হেপাটাইটিস রোগ সাধারণভাবে জণ্ডিস হিসেবে পরিচিত। হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস পার্কিনসন্স সিনড্রোমের আশংকা বাড়ায় বলে নতুন এক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ সমীক্ষা চালিয়েছেন। এক লাখ মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য এ সমীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এ দুটোর যে-কোনও একটিতে যাঁরা ভুগেছেন, তাঁদের পার্কিনসন্স সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা সাধারণ মানুষের চেয়ে পঁচাত্তর শতাংশ বেশি। রক্ত এবং বীর্য বা এ ধরনের দেহজাত তরল পদার্থের মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। আর রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের। অবশ্য সংক্রমণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তা বোঝা যায় না। পার্কিনসন্স হলো স্নায়ু রোগ বা নিউরোলজিকাল ডিযিয। এ অসুখ সারিয়ে তোলার কোনও চিকিৎসা

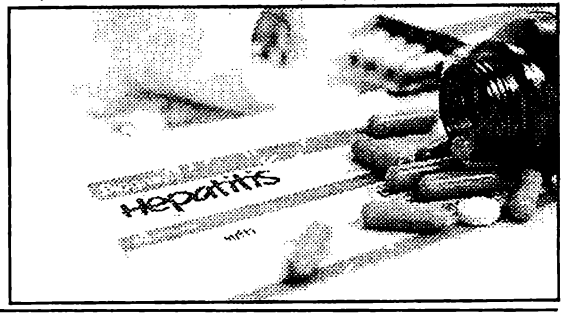

এখনও বের হয়নি। তবে উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা হয়।

দামি সাইকেল!

বিশ্বখ্যাত ফরাসি গাড়ি নির্মাতা বুগতি এবং সাইকেল নির্মাতা সংস্থা পিজি তৈরি করেছে এ সাইকেল। প্রথমে মাত্র ৬৬৭টা সাইকেল তৈরি হবে। চলতি বছরের শেষদিকে ছাড়া হবে বিশ্ব বাজারে। পুরো হাতে তৈরি এ সাইকেলের ওজন মাত্র পাঁচ কেজি। সাইকেলের পঁচানব্বুই শতাংশই তৈরি হয়েছে

রিইনফোর্সড্ কার্বন দিয়ে। অবশ্য এ সাইকেলে চড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাববেন না। বুগতি বলেছে, এটি বানানো হয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে ব্যবহারের জন্য।

বায়োনিক পাতা!

বায়োনিক পাতা তৈরি করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন ড. ড্যানিয়েল নোসেরিয়া। এর মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে নকল করা যাবে। আর তৈরি করা যাবে তরল সার। এভাবে তৈরি তরল সার সরাসরি জমিতে দিয়ে দেখা গেছে, প্রচলিত মূলার চেয়ে দেড়গুণ বেশি ওজনের মূলা পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া, পানি, সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে এ তরল সার তৈরি

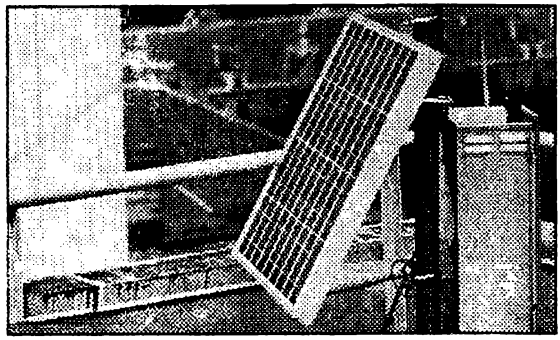

করেছেন গবেষক দলটি। ভবিষ্যতে মানুষের ক্ষুধার্ত মুখে খাদ্য জোগাতে এ প্রযুক্তি সহায়তা করবে বলে আশা করছেন তাঁরা। পরবর্তী প্রজন্মের কৃষি বিপ্লবে সহযোগিতা করবে এ প্রযুক্তি। আর এ লক্ষ্যে বায়োনিক পাতার উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর কাজে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন গবেষক দলটি।

মানুষ আপগ্রেড হবে!

প্রচলিত মানুষ বাতিল হবে অদূর ভবিষ্যতে। মানুষ অর্জন করবে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকেই আপগ্রেড করতে পারবে। তৈরি হবে ঈশ্বরের গুণ সম্পন্ন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ। জরা বা মৃত্যু স্পর্শ করতে পারবে না এ মানুষকে। বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি এবং জেনেটিক প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়ে এমন মানুষ তৈরি হবে। কিংবা প্রয়োজনে রোবট ও মানুষের মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি হবে সাইবোর্গ। জীবনের উন্মেষের পর এটাই হবে জীব জগতের সবচেয়ে বড় বিবর্তন। তবে এ কাজ সস্তায় হবে না। এজন্য গড়ে উঠবে শত কোটি ডলারের শিল্প। বিপুল বিত্তের অধিকারী মানুষই কেবল আপগ্রেডের এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে। বিত্তহীন সাধারণ মানুষের তাতে কোনও লাভই হবে না। আগামী দু' শ' বছরের মধ্যে এ ব্যবস্থা বাস্তব হয়ে উঠবে, এ কথা বলেছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক অধ্যাপক ইয়োভাল নোহা হারারি। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের এ

ইতিহাসবিদ সম্প্রতি এসব কথা বলেন। অবশ্য তাঁর এ বক্তব্য কতটা বিজ্ঞান নির্ভর এবং কতটা কল্প-বিজ্ঞান নির্ভর, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ■

আমিল বতুল

খিচুড়ি

আকবর মোহাম্মদ

হঠাৎ এই দারুণ জুটিও ভেঙে গেল। মিসেস জ্যোতি নাকি কোনও পত্রিকায় বলেছেন, রুমকি তার ছেলের যোগ্য নয়।

১৯৯৩ সাল। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে চাকরির সন্ধান করছি। তখন নিয়মিত খেলাধুলা বিষয়ে লিখছি। একদিন সেই সময়কার আলোচিত এক দৈনিকের সম্পাদককে চাকরির ব্যাপারে বললাম।

উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বললেন, 'ক্রীড়া বিভাগে আমাদের পোস্ট খালি নেই। তবে বিনোদন রিপোর্টার লাগবে। তুমি সুব্রতর সাথে কথা বলো।'

আমি তাতেই রাজি হলাম। যদিও সিনেমা সম্পর্কে কিছু জানি না। ছোটবেলায় স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা পর্যন্তই।

সুব্রত দা আমার কথা শুনে খুব অবজ্ঞা করলেন। বললেন: 'এসব "বলখেলা"-র জ্ঞান দিয়ে সংস্কৃতি চর্চা করা যায় না।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি আমাকে ডিউটি দিলেন এফডিসিতে। প্রতিদিন বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এফডিসি থেকে নানা গুজব-গুঞ্জন আর সিনেমার শ্যুটিং-এর খবর নিয়ে অফিসে আসতে হবে। বেতন দু' হাজার টাকা।

আমি দারুণ উৎসাহে নেমে গেলাম। এফডিসিতে ঘোরাঘুরি করি। দু'তিনজন সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হলো। এদের একজন আকাজ ভাই। সারাদিন প্রাণ খুলে সিগারেট খান। সারা শরীরেই সিগারেটের গন্ধ। অন্যান্য নেশাও বোধহয় ছিল। একটা জিন্সের প্যান্ট কবে পড়েছেন, তাও মনে নেই। এই আকাজ ভাই আমাকে দারুণ সহযোগিতা করলেন। প্রচণ্ড কৃষ্ণ বর্ণের এই মানুষটির মনটা ছিল একদম সাদা।

একদিন বিকালে একা বসে বৃষ্টি দেখছি। সারাদিন ঝির-ঝির বৃষ্টির জন্য শ্যুটিং বন্ধ। আকাজ ভাই কোথা থেকে এসে বললেন, 'মামা, চল, এক জায়গায় যাই।'

আমার কোনও আপত্তি না শুনেই টানতে-টানতে রিকশায় তুললেন। সরাসরি গেলাম মহাখালী। তখন এফডিসির গেট ছিল সাতরাস্তা ট্রাক স্ট্যাণ্ডের দিকে।

যাক, সন্ধ্যার একটু আগে মহাখালী তিতুমীর কলেজের বিপরীতে এক নায়িকার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। নায়িকা তখন নতুন মুখ (নামটা মনে করেন রুমকি)। একমাত্র ছেলেটি ক্লাশ থ্রি-ফোরে পড়ে। স্বামী বিদ্যুৎ-এর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। ড্রইং রুমে বসে অনেক কথা হলো। আকাজ ভাই সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছেন। আমি লিখেই যাচ্ছি। আকাজ ভাই পিঠে জোরে চাপড় দিয়ে বললেন, 'সব লিখতে হয় না, মামু। পরে আমি শিখায় দিমু।'

রুমকি বার-বার বলছেন, বৃষ্টির দিন, খিচুড়ি খেয়ে যেতে হবে। আমি কিন্তু খুব ভাল খিচুড়ি করতে পারি।

সত্যি তাঁর হাতের খিচুড়ি অপূর্ব। কে বলবে এই গৃহবধূ দু'একটি ছবিতে দ্বিতীয় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে ফেলেছেন। এখন প্রথম

সারিতে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

বেরিয়ে আসার সময় আমাদের জন্য ছিল দারুণ গিফট। সেই থেকে শুরু হলো রঙিন জগতের হাতছানি।

মাস দুয়েক পর এফডিসির পুকুর পাড়ে বিরাট সেট পড়েছে। সাদা রঙের বিশাল এক পিয়ানো। পার্টির সেট। নায়িকা চম্পা পুরো সাদা পোশাকে। অদূরে রাজীব সহ অনেকে। দেখলাম রুমকিকে। এই দুই মাসে অনেক সুন্দর হয়েছে। সঙ্গে এক তরুণ নায়ক রাজন (ছদ্মনাম)। বয়স হয়তো ২৩-২৪ হবে। শুনলাম এরা ছবির দ্বিতীয় জুটি।

যাই হোক, মাস ছয়েক পর ছবিটা মুক্তি পেল। সুপারহিট হলো। বিশেষ করে রাজন-রুমকি জুটি চলচ্চিত্রে দারুণ জনপ্রিয়তা পেল।

প্রায় ছবিতেই ইলিয়াস কাঞ্চন-মান্না-রুবেল-চম্পা-দিতিদের ছোট ভাই-বোন বা বন্ধু-বান্ধবী হিসাবে রাজন-রুমকিকে নেয়া হত।

বছর খানেকের মধ্যেই এই জুটি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একটু বেশি বয়সী হলেও রুমকিকে আধুনিক সব পোশাকে ভালই মানাত। দু'জনের মধ্যে দারুণ সখ্যও গড়ে উঠল। তবে এদের দু'জনের মেলামেশায় কাবাবের হাড্ডি হলেন দু'জন। তাদের একজন রাজনের মা, মিসেস জ্যোতি। উনি আগে চলচ্চিত্রের সাইড নায়িকা ছিলেন। এই বয়সেও দারুণ সাজগোজ করে থাকেন। চলচ্চিত্রে সাধারণত নায়িকাদের মায়েরা গায়ে-গায়ে লেগে থাকেন। কিন্তু তরুণ রাজনের কপাল মন্দ। মায়ের শাসনে সে অতিষ্ঠ। ওদিকে রুমকির স্বামী কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই এদের অনুসরণ করেন। এদিকে মিসেস জ্যোতি আর রুমকির স্বামীরও দারুণ ভাব জমে উঠল।

হঠাৎ এই দারুণ জুটিও ভেঙে গেল। মিসেস জ্যোতি নাকি কোনও পত্রিকায় বলেছেন, রুমকি তার ছেলের যোগ্য নয়। সে বুড়ি ও বাচ্চার মা। তার ছেলে সালমান শাহ্‌র সমকক্ষ। এ নিয়ে দুই পরিবারে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। জুটি ভেঙে গেল।

রাজন একজন নতুন নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধে দুটি ছবি করল। দুটিই সুপার ফ্লপ।

এদিকে রাজন ছাড়া রুমকিকে কেউ নেয় না। নিজের পয়সায় আসাদ আর রুমকি নায়ক জসিমকে নিয়ে ছবি বানাল। সেটিও ফ্লপ।

এরই মাঝে এক নতুন নায়িকাকে বিয়ে করে রাজন আমেরিকা পাড়ি দিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমাকে অন্য এক পত্রিকা ক্রীড়া প্রতিবেদক হিসাবে যোগ দেয়ার অফার করল। আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আস্তে-আস্তে স্মৃতি থেকে মুছে গেল এফডিসি।

তারপর ২০০৬ সালের এক শীতের সন্ধ্যা। গুলশান-২ নম্বর পুরনো মার্কেটের এক দোকানে এসেছি নন্দিত এক সাবেক তারকা ক্রিকেটারকে নিয়ে। উনি পুরনো রেকর্ড ও গ্রামোফোন জমান। কাজ শেষে ৬ নম্বর বাসে প্রেসক্লাবের উদ্দেশে পল্টন মোড়ে যাব, হঠাৎ একটি গাড়ি এসে থামল। অতিরিক্ত মেকআপ জর্জরিত মুখটা দেখেই বুঝে ফেললাম: রুমকি। আমাকে টেনে গাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর পীড়াপীড়িতে যেতে হলো। সামনের সিটে বসা ওর ছেলে–তখন ক্লাশ নাইনে পড়ে। বনানী বাজারের পাশের গলিতে এক ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে রুমকিরা। একসময় জনপ্রিয়তার জন্য বোরকা পরে ঘুরত। গাড়ি থেকে নামলেই মানুষের ভিড়। এখন গাড়ি রেখে দিব্যি হেঁটে গেল আমাকে নিয়ে।

বাসায় গিয়ে অনেক গল্প হলো। কাজের মেয়েকে বলল খিচুড়ি দিতে। বার-বার বলল: ওর হাতের খিচুড়ি নাকি খুব স্বাদের, সবাই বলে।

সত্যিই সময় অনেক বদলে দিয়েছে। ছিপছিপে রুমকি এখন প্রায় স্থূল। ঘরের চারদিকে আভিজাত্যের ছাপ।

খিচুড়ি এল, কিন্তু কোথায় আগের সেই স্বাদ? নাকি আমার মুখের রুচি...

হঠাৎ রাজনের কথা উঠল। ঘরে যেন ঝড় শুরু হলো। রুমকি অশালীন এক গালি দিয়ে বলল, 'রাজনকে তো সব দিয়েছি। আমিই ওকে উঠিয়েছি।'

বেঈমান সহ অনেক অশ্রাব্য কথা। রাগের মাথায় প্লেট সহ খিচুড়ি ফেলে দিল। তারপর অনেকক্ষণ নীরবতা ও অঝোরে কান্না। পরে সরি-টরি বলে আবার খিচুড়ি খাওয়াল। বুঝলাম, কীভাবে বদলে যায় মানুষ!. ■

দ্য গিভিং ট্রি

মূল ▮ শেল সিলভারস্টেইন

রূপান্তর ▮ মোঃ নজরুল ইসলাম সোহেল

গাছটি বলল, 'আমার দেহ কেটে তা দিয়ে নৌকা বানাও, তা হলে সুখী মনে চলে যেতে পারবে।'

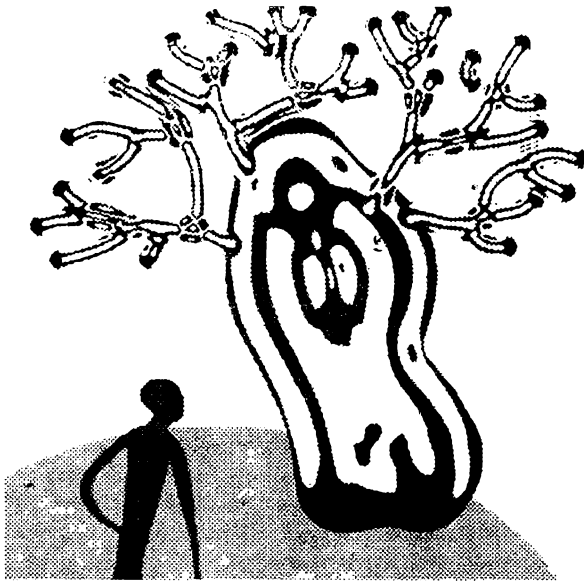

[**লেখক পরিচিতি:** শেল সিলভারস্টেইন একজন আমেরিকান কবি, গীতিকার, কার্টুনিস্ট ও ছোটদের বইয়ের লেখক ছিলেন। ১৯৩০ সালে এই অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্য গিভিং ট্রি তাঁর রচিত লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা কবিতা, যা গল্প আকারে লেখা হয়েছিল।]

অনেক দিন আগে ছিল একটি গাছ। সে একটি ছোট ছেলেকে ভালবাসত। প্রায় প্রতিদিন ছেলেটা এসে গাছের পাতা নিয়ে মাথার মুকুট বানিয়ে জঙ্গলের রাজা হওয়ার খেলা খেলত। ছেলেটি গাছ বেয়ে উঠত, ডালপালা ধরে দোল খেত, গাছের আপেল পেড়ে খেত। লুকোচুরি খেলত। যখন ক্লান্ত হত, ঘুমিয়ে পড়ত গাছের ছায়ায়। গাছটিকে অনেক ভালবাসত ছোট ছেলেটি। আর সেকারণেই তখন খুব সুখী ছিল গাছটি। তারপর কেটে গেল অনেক সময়। ছোট ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। তাতে একা হয়ে পড়ল গাছটি। অনেক দিন পর একদিন গাছটির কাছে এল ছেলেটি।

গাছটি তাকে বলল, 'এসো, আমার গা বেয়ে ওঠো। দোল খাও আমার ডালপালা ধরে, পেড়ে খাও আপেল, আমার ছায়ায় খেলাধুলা করো।'

'আমি গাছে চড়ার বা খেলাধুলা করার সময় পেরিয়ে এসেছি,' উত্তর দিল ছেলেটা। 'এখন কিছু জিনিসপত্র কিনে মজা করতে চাই। তাই লাগবে টাকা।'

গাছটি বলল, 'দুঃখিত, কিন্তু আমার কাছে তো কোনও টাকা নেই। আছে শুধু আপেল আর পাতা। আপেলগুলো নাও, বিক্রি করো শহরে নিয়ে, তা হলে টাকা পাবে। তাতে মন ভরবে তোমার।'

সুতরাং গাছে চড়ে আপেল সংগ্রহ করে চলে গেল ছেলেটি। গাছটি তখনও সুখী ছিল।

তারপর বহু দিন এল না ছেলেটি।

তাতে খুব দুঃখী হয়ে উঠল গাছটি।

তারপর আবার একদিন এল ছেলেটি।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গাছটি বলল, 'এসো, এসো। আমার গা বেয়ে ওঠো। ডালপালা ধরে দোল খাও, মজা করো।'

ছেলেটি বলল, 'আমি খেলব না, অনেক ব্যস্ত। শরীর গরম রাখতে একটি ঘর দরকার। চাই স্ত্রী ও সন্তানও। তুমি কি আমাকে একটি ঘর দিতে পারবে?'

'আমার কোনও ঘর নেই, এই জঙ্গলই ঘর-বাড়ি। তবে তুমি আমার ডালপালা কেটে নিয়ে ঘর বানাতে পারো। তা হলে সুখী হবে,' উত্তর দিল গাছটি।

সুতরাং ছেলেটি গাছটির সব ডাল কেটে নিয়ে চলে গেল তার ঘর বানাতে।

গাছটি তখন সুখী ছিল।

তারপর আরও অনেক দিন আর এল না ওই ছেলে। তারপর যখন আবার ফিরল, খুশিতে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল গাছটি।

'এসো,' সে ফিসফিস করে বলল। 'মজা করো।'

'যথেষ্ট বড় হয়েছি, খেলাধুলার মন মানসিকতা আর নেই,' বলল ছেলেটি। 'এখান থেকে দূরে যেতে আমার একটি নৌকা দরকার। তুমি কি আমাকে একটি নৌকা দিতে পারবে?'

গাছটি বলল, 'আমার দেহ কেটে তা দিয়ে নৌকা বানাও, তা হলে সুখী মনে চলে যেতে পারবে।'

অতঃপর ছেলেটি গাছ কেটে ফেলল এবং তা দিয়ে নৌকা বানাল। তারপর নৌকায় চড়ে চলে গেল অনেক দূরে।

তখনও সুখী ছিল গাছটি। আবার হয়তো-বা সত্যিকার অর্থে ছিল না...

তারপর অনেক দিন পরে আবার ফিরল ছেলেটি।

গাছটি বলল, 'সত্যিই দুঃখিত, তোমাকে দেয়ার মত আর কিছুই নেই আমার কাছে। আমার আপেল শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'আপেল খাওয়ার মত শক্তি আমার দাঁতে নেই,' উত্তর দিল ছেলেটি।

'আমার ডালপালা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তুমি আর দোল খেতে পারবে না,' গাছটি বলল।

'আমি অনেক ক্লান্ত। ডাল ধরে ঝোলার মত বয়স নেই আমার,' উত্তর দিল ছেলেটি।

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত,' বলল গাছটি। 'আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে কিছু দেব। কিন্তু আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি এখন একটি বৃদ্ধ গাছের গুঁড়ি মাত্র। আমি দুঃখিত।'

'আমার বেশি কিছু প্রয়োজন নেই,' ছেলেটি বলল, 'শুধু একটু শান্ত জায়গা দরকার বসে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। আমি অনেক ক্লান্ত।'

গাছ উৎসাহী কণ্ঠে নিজেকে যতটুকু পারা যায় সোজা করে বলল, 'ঠিক আছে! বৃদ্ধ গাছের গুঁড়ি বসা ও বিশ্রামের জন্য ভাল জায়গা। এসো, বসে বিশ্রাম নাও।'

তখন গাছের কাটা কাণ্ডের উপর বসে পড়ল বালকটি।

তখন সুখী ছিল গাছটি। ■

রহস্যপত্রিকা সহ সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের
নতুন ও রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।
বুক প্যালেস
পাকা-পুলের মোড়, সাতক্ষীরা।
মোবাইল: ০১৯২২-৬২১৬৮৯

চুল যখন ঝরে

ডা. ওয়ানাইজা রহমান

মনে রাখবেন, প্রতিদিন এক শ'টি চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

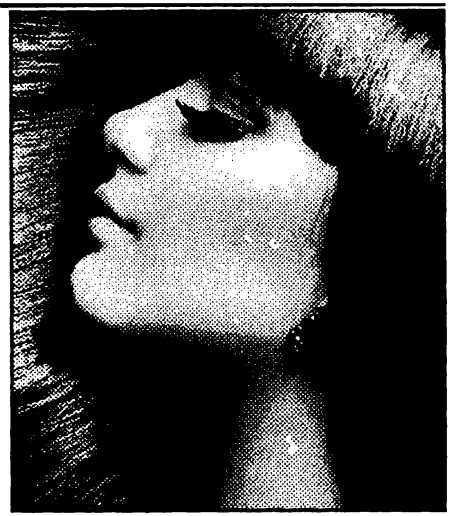

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর চুল আমরা সবাই চাই। নানারকম দূষণ, মানসিক চাপ, অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ এবং অনিয়মিত জীবনযাপন, নানারকম অসুখ কিংবা ব্যক্তিগত কারণে বর্তমানে অনেক অল্প বয়সীরই চুল ঝরে যাচ্ছে। চুল ঝরে যাওয়া কিংবা টাক সমস্যা নিয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা নিচের সমস্যাগুলোর কথা সাধারণত বলে থাকেন:

১। চুলের গোড়ায় ময়লা জমে।
২। একদিন চুল শ্যাম্পু না করলে তেল-তেল ভাব হয়।
৩। মাথা চুলকায়।
৪। চুলের গোড়ায় ছোট-ছোট গোটা এবং ব্যথা হয়।
৫। সাদা-সাদা খুশকির গুঁড়ো দেখা যায়।
৬। চুলের আগা দ্বিখণ্ডিত হয়।
৭। চুলে রুক্ষভাব থাকে।
৮। চুল লালচে হয়ে যায়।
৯। চুলের গোড়ায় ব্যথা হয়।

এ ধরনের সমস্যার কারণগুলো হচ্ছে

১। চুল ঠিকমত পরিষ্কার না রাখা।
২। ছত্রাকের সংক্রমণ টিনিয়া কেপিটিস।
৩। চুলের গোড়ায় সংক্রমণ।
৪। খুশকির সংক্রমণ।
৫। ভিটামিনের অভাব।
৬। রক্তস্বল্পতা।
৭। চুলের সঠিক যত্ন না হওয়া।
৮। নানারকম কেমিকেলের ব্যবহার।
৯। হরমোনের তারতম্য।
১০। সেবোরিক ডার্মাটাইটিস।
১১। এণ্ড্রোজেনিক এলোপিসিয়া বা বংশগত চুল পড়া।

চুলের সঠিক যত্ন ও পুষ্টির অভাবে চুল পড়ে যায়। খুব সাধারণ নিয়মে চুলের কিছু যত্ন নিলে চুল ভাল থাকে। একদিন অন্তর চুল পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ভেজা চুল আঁচড়ানো ঠিক নয়। অতিরিক্ত আঁচড়ানোও ঠিক নয়। খাদ্যাভ্যাস এখানে একটি বড় ব্যাপার। ফল, শাকসবজি, ডিম, দুধ নিয়মিত খাওয়া প্রয়োজন।

চুল প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাই খাদ্যতালিকায় প্রোটিন রাখতে হবে। ওজন কমানোর জন্য ডায়েটিং করার সময়েও এ ব্যাপারে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, আয়ার্ন ও অন্যান্য ভিটামিন খাওয়া হচ্ছে কি না, লক্ষ রাখুন। কিছু ওষুধ দীর্ঘ দিন সেবনের ফলেও চুল ঝরতে পারে। যেমন গাউট কিংবা আর্থ্রাইটিসের ওষুধ, মানসিক অবসাদের ওষুধ, এ ছাড়া ক্যান্সার কেমোথেরাপি।

মনে রাখবেন, প্রতিদিন এক শ'টি চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর চেয়ে বেশি মনে হলে সতর্ক হোন। বর্তমানে আছে চুল পড়ার আধুনিক চিকিৎসা। কমবয়সে চুল পড়লে অবশ্যই চিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ, এতে চুল ঝরা অন্তত বন্ধ হবে। মনে রাখতে হবে চুল ঝরা বন্ধ হলে আপনার মাথায় টাক বাড়বে না। আর নতুন চুল গজানোর জন্যও ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিনাস্টেরয়েড নামের ওষুধ ব্যবহার করে পাওয়া যাচ্ছে ভাল ফল। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়। চুল ঝরতে শুরু করলে অবহেলা না করে সঠিক চিকিৎসা ও যত্ন নিন। ■

লেখিকা: সহযোগী অধ্যাপিকা, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। **চেম্বার:** দ্য বেস্ট কেয়ার হাসপাতাল অ্যাণ্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ২০৯/২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। **ফোন:** ০১৬৮২-২০১৪২৭।

আলোর অন্তরালে

মিনহাজ মঞ্জুর

বুকে গুলি নিয়েই ছেলেটা টলতে-টলতে বেশ কয়েক গজ এগিয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

পাঁচ শ' টাকার কড়কড়ে চোদ্দটা নোট। সাত হাজার টাকা। খুব একটা বড় অঙ্কের টাকা নয়। কিন্তু মালেকের কাছে এ টাকাই এখন বিরাট সম্পদ। নিজের পরিশ্রমের রোজগার। অভাবের সংসারে এ টাকাই একমাত্র অবলম্বন। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে মালেক। এত টাকা পকেটে নিয়ে হাঁটা উচিত নয় বলে ভিতরে-ভিতরে একধরনের তাড়া বোধ করছে বাসায় পৌঁছার জন্য। একটা রিকশা বা স্কুটার নেবে সে উপায়ও নেই। এই রাস্তায় সাধারণত ট্রাফিক জ্যাম থাকে না, কিন্তু আজ দেখা গেল আছে–একঘণ্টার আগে ছুটবে কি না সন্দেহ আছে।

মালেক সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছে। তার বাম হাত প্যান্টের ভিতর; পাঁচটি আঙুলই স্পর্শ করছে টাকা। যেন সাত রাজার ধনের পাঁচ অতন্দ্র প্রহরী, কেউ ছিনিয়ে নিতে এলে দরকার হলে প্রাণ দেবে!

খুব ইচ্ছে করছে টাকা মুঠোয় চেপে ধরতে, কিন্তু সেটা পারছে না মালেক। টাকার কড়কড়ে নোট মিতু খুব পছন্দ করে। মালেক জানে, মিতু টাকা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করবে, বারবার গন্ধ শুঁকবে। তার বোনটার মাঝে ছেলেমানুষী ভাব আছে। আর ক'দিন পরেই এস.এস.সি. পরীক্ষা দেবে, কিন্তু আচার-আচরণে বাচ্চা মেয়ে রয়ে গেছে! দলামোচা নোট দেখলে মন খারাপ করবে মিতু।

মালেক মনের অস্থির ভাব দূর করতে হিসেব কষতে লাগল কী কী করবে টাকা দিয়ে। ছিঁড়ে গেছে মা'র স্যাণ্ডেল। নতুন একজোড়া কিনতে হবে। মিতুর পরীক্ষার ফি-র টাকা দিতে হবে। পুরনো হয়ে গেছে বাবার কাঠের ক্র্যাচ দুটো। তিনি যখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, 'ক্যাঁচক্যাঁচ' শব্দ হয়। যে-কোনও সময় ওগুলো ভেঙে পড়বে। সে হয়তো বেতনের সামান্য টাকা দিয়ে বাবার জন্য নতুন দুটো ক্র্যাচ কিনতে পারবে না, কিন্তু মিস্ত্রি দিয়ে খুব ভালভাবে মেরামত করিয়ে দিতে পারবে।

দূর থেকে মাইকের শব্দ ভেসে আসছে, কেউ একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে। আরও কিছুদূর এগোতেই মালেক ট্রাফিক জ্যামের কারণটা বুঝতে পারল। চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের পাশে বিরাট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পাঞ্জাবি-পাজামা পরা এক লোক মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছুঁড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

মঞ্চের সামনের রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাতা চেয়ারে প্রায় শ'খানেক লোক বসে বক্তৃতা শুনছে।

রিকশা, গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তায় যতটুকু জায়গা রাখা হয়েছে, তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। সেখান দিয়ে দুটো রিকশাও পাশাপাশি যেতে পারছে না। জ্যাম নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কয়েকজন ট্রাফিক পুলিস—কিন্তু তাতে কিছুই হচ্ছে না।

মাইকের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে এক অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। অনেকক্ষণ ধরে ওটা অনবরত সাইরেন বাজিয়ে যাচ্ছে। মালেক দেখল, বিশ-একুশ বছরের এক ছেলে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিক দেখছে। হয়তো রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে না পারলে মারা যাবে!

ছেলেটার জন্য বুকের ভেতর মমতা অনুভব করছে মালেক। যদি ক্ষমতা থাকত, ছেলেটার জন্য কিছু একটা করত। কিন্তু সে দুর্বল মানুষ, কোনও ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা যাঁদের আছে, তাঁরা এখন রাস্তাকে জনসভার মাঠ বানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মালেক। যত দ্রুত পারা যায় এখান থেকে সরে যেতে চাইছে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন মনে হচ্ছে নির্যাতনের মত, প্রতিটি শব্দ যেন বুকের ভেতরটা ফালি-ফালি করে কাটছে।

মালেক ভাবল, হায়! আমি যদি বধির হতাম, এ শব্দ শুনতে হত না, এত কষ্টও পেতে হত না!

চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে ডানদিকে মোড় নিতেই মালেক দেখল, সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা মিছিল। প্রায় শ'খানেক লোক গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে: '...বিচার চাই, বিচার চাই!'

ট্রাফিক জ্যামের কারণে মিছিল নিয়ে এগোতে সমস্যা হচ্ছে। তাই চড়-থাপ্পড় ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে রিকশাওয়ালাদের রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করছে কয়েকজন যুবক।

মিছিলটা যখন স্লোগান দিতে-দিতে সমাবেশকে পাশ কাটাচ্ছে, হঠাৎ করেই দু'দলের মধ্যে দেখা দিল উত্তেজনা। মালেক এতক্ষণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মিছিল যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, দু'দলের মধ্যে ধাওয়া-ধাওয়ি আরম্ভ হতেই হঠাৎ টের পেল, সামনে বড় বিপদ। কী করবে ঠিক করার আগেই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের কাছে ককটেল ফাটিয়েছে কেউ। মুহূর্তেই হুলুস্থুল পড়ে গেল

আল আমিন বুক সাপ্লাই

প্রো: মোঃ আলী আকবর

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন-পুরানো সব বই এবং রহস্যপত্রিকা সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল: ০১৭২৯১১৪৪৬০, ০১৯২৭-১১২৪৮০

চারদিকে। ছোটাছুটি শুরু করল লোকজন, দোকানপাটের শাটার 'ঘটাং-ঘটাং' শব্দে বন্ধ হতে লাগল।

মালেক তাড়াতাড়ি একটা দোকানে ঢুকতে গেল, কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত দোকানদার দোকানের ভেতর থেকে মুখের ওপর 'ঘড়-ঘড়' শব্দে নামিয়ে আনল শাটার।

হতবিহ্বল দৃষ্টিতে পেছনে ফিরতেই বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা টের পেল মালেক। অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে দোকানের শাটারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে পড়ল ফুটপাতে।

অবাক হয়ে দেখল, ওর বুক থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল ওর মুখ। পকেটের টাকাগুলো মুঠোয় চেপে ধরল। বুঝল, মারা যাচ্ছে সে। চোখের সামনে ভেসে উঠল মা, বাবা, বোনের ছবি। সে যদি মারা যায়, বাবা, মা, বোনের কী হবে? পকেটে বেতনের সাত হাজার টাকা; সে মরে রাস্তায় পড়ে থাকবে, তার মা-বাবা হয়তো টাকা আর পাবে না। না খেয়ে থাকবে। কেনা হবে না মায়ের স্যাণ্ডেল, পরীক্ষার ফি দেয়া হবে না বোনের, মেরামত হবে না বাবার ক্র্যাচ দুটো!

'না, আমাকে বাঁচতে হবে!' ডান হাতে বুক চেপে ধরে বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল মালেক। মনে-মনে কাতর প্রার্থনা করল, 'হে, খোদা, আমাকে কিছুটা সময় দাও, টাকাগুলো আমার মা-বাবার হাতে পৌঁছে দেয়ার সময়টুকু দাও! টাকাগুলো না পেলে ওরা না খেয়ে থাকবে! হে, খোদা, আমাকে কিছুটা সময় ভিক্ষা দাও!'

চৌরাস্তার মোড়ের পাশেই এক পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ওটার লোকজন জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছে সাদা শার্ট পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক বুকে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়েছে ফুটপাতে। বুক থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। তারা অবাক হলো, কিছুক্ষণ পরেই ডান হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে যুবক। বাম হাত প্যান্টের পকেটে। সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল, বুকে গুলি নিয়েই ছেলেটা টলতে-টলতে বেশ কয়েক গজ এগিয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাম হাতটা তখনও প্যান্টের পকেটে! এর কারণ কেউ বুঝল না। সবার কাছেই বিষয়টা হয়ে রইল রহস্য।

মালেক নিহত হওয়ার ব্যাপারটায় সারাদেশ আলোড়িত হলো। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলো। দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল মালেককে তাদের নিজেদের কর্মী বলে দাবি করল। মালেক হত্যার প্রতিবাদে তারা পাল্টাপাল্টি মিছিল-সমাবেশের আয়োজন করল। সেখানেও তাদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হলো; আহত হলো শতাধিক। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে আগুন জ্বলছিল, সেটা আরও প্রজ্বলিত হলো। সরকারের পক্ষ থেকে জোর গলায় বলা হলো, মালেকের হত্যাকারীদের কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না।

আসামী ধরতে মাঠে নেমে পড়ল পুলিশ। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলো এবং কয়েক দিন হাজতে আটকে রেখে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হলো তাদেরকে। টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এ সবই জানতে পারল দেশের মানুষ। কিন্তু মালেকের পকেটে বেতনের সাত হাজার টাকা যে ছিল, সে টাকা যে ওর পরিবার পায়নি, সেটা জানল না প্রায় কেউ। ওই টাকা চলে গেছে অন্য কারও পকেটে।

ছেলের মৃত্যুশোকে শয্যাশায়ী মা দীর্ঘ ছয় মাস রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, দেশের মানুষ সেটা জানল না।

মালেকের বাবার ক্র্যাচ দুটো ভেঙে গেছে। এখন তাঁকে মেয়ের কাঁধে ভর করে হাঁটতে হয়, সেটাও কেউ জানতে পারল না।

এস.এস.সি. পরীক্ষার ফি দিতে পারেনি বলে পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি মালেকের বোনকে। এখন সে গার্মেন্টিসে চাকরি করে। প্রতিদিন গার্মেন্টিসে যাওয়া-আসার সময় শোনে বখাটে ছেলেদের নোংরা কথা।

রাত্রে যখন থেমে যায় সব কোলাহল, নীরব-নিস্তব্ধ হয় পৃথিবী, তখন একা বসে কাঁদে সে, কেউ জানতে চায় না ওর কী হয়েছে।

কেউ না! ■

আপনার স্বাস্থ্য

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল
E-mail: parijat2006@yahoo.com

বর্তমানের ওষুধটি নিকোটিন প্যাচের বিকল্প নয়, বরং এটি নিকোটিনমুক্ত অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ।

ধূমপান ছাড়তে ওষুধ

যাঁরা ইতোপূর্বে অনেক চেষ্টা করেও ধূমপান ছাড়তে পারেননি এবং এখনও রীতিমত ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ বয়ে এনেছেন গবেষকেরা। স্রেফ বিউপ্রোপিওন হাইড্রোক্লোরাইড সেবন করে আপনি আপনার এতদিনের ধূমপানের অভ্যাসটাকে চিরতরে ত্যাগ করতে পারবেন এবং রক্ষা করতে পারবেন আপনার মূল্যবান স্বাস্থ্যটাকে। এটি একটি নিকোটিনমুক্ত ওষুধ। এর আগে ধূমপান ত্যাগের জন্য বাজারজাতকরণ হয়েছে নিকোটিন প্যাচ। কিন্তু বর্তমানের ওষুধটি নিকোটিন প্যাচের বিকল্প নয়, বরং এটি নিকোটিনমুক্ত অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ। বাজারে এটি জাইবান নামে নিয়ে এসেছে গ্লাক্সো ওয়েলকাম। এটি অবশ্যই আপনার ধূমপানের ইচ্ছাকে কমাতে সাহায্য করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

জাইবান কী

জাইবান এমন একটি ওষুধ যা একজন ধূমপায়ীকে সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ছেড়ে দিতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, কমপক্ষে একমাস জাইবান গ্রহণে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক পুরোপুরি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে জাইবান প্রত্যাহারজনিত উপসর্গ এবং ধূমপানের ইচ্ছা কমিয়ে দেয়। তবে এটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

কারা জাইবান গ্রহণ করতে পারবেন না

- যাঁদের মৃগী রোগ রয়েছে।
- যাঁরা খাদ্যজনিত বিউপ্রোপিওন হাইড্রোক্লোরাইড সমৃদ্ধ ওষুধ গ্রহণ করছেন।
- যাঁরা খাদ্যজনিত অস্বাভাবিক অসুখ যেমন বুলেমিয়া বা এনোরেক্সিয়া নার্ভোসাতে ভুগছেন কিংবা এ ধরনের সমস্যা যাঁদের আগে ছিল।
- যাঁরা সম্প্রতি মনো অ্যামাইনেজ অক্সিডেজ ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করছেন।
- যাঁদের বিউপ্রোপিওনে অ্যালার্জি রয়েছে।
- গর্ভবতী কিংবা যেসব মহিলা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁরাও এ ওষুধটি গ্রহণ করতে পারবেন না।

জাইবান কীভাবে সেবন করবেন

- অবশ্যই চিকিৎসকের নির্দেশমত সেবন করতে হবে। সাধারণ অনুমোদিত মাত্রা হলো প্রথম ৩ দিন সকালে ১টি ১৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট। চতুর্থ দিন থেকে সকালে ১৫০ মিলিগ্রাম এবং সন্ধ্যায় ১৫০ মিলিগ্রাম। দুই মাত্রার মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা হতে হবে।

● কখনওই অতিরিক্ত মাত্রায় জাইবান গ্রহণ করবেন না। যদি একটি মাত্রা গ্রহণ করতে ভুলে যান, তা হলে পরের মাত্রায় অতিরিক্ত গ্রহণ করে সেটাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করবেন না। পরবর্তী মাত্রা থেকে সময়মত গ্রহণ করলেই হবে। চিকিৎসকের নির্দেশের বাইরে বেশি গ্রহণ করবেন না।
● ওষুধটি গিলে খাবেন। এটি চুষে বা কামড়ে খাবেন না।
● অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে ৭-১২ সপ্তাহ সেবনই যথেষ্ট। আর চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলবেন।

কখন ধূমপান বন্ধ করবেন

ওষুধটি গ্রহণ করার পর এটা শরীরে সঠিক মাত্রায় কার্যকর প্রভাব ফেলতে সময় নেয় প্রায় এক সপ্তাহ। সুতরাং এক সপ্তাহের আগে হয়তো আপনার ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনা কম। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আপনার আর ধূমপান করার ইচ্ছা থাকবে না।

নিকোটিন প্যাচ এবং জাইবান একই সঙ্গে গ্রহণ করা যাবে কি না

হ্যাঁ, একমাত্র চিকিৎসকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জাইবান এবং নিকোটিন প্যাচ গ্রহণ করা যেতে পারে। একসঙ্গে এ দুটো গ্রহণ করলে আপনার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। এ সময় চিকিৎসক আপনার রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি দুটো ওষুধ একত্রে গ্রহণ করেন, তা হলে যে-কোনও সময় ধূমপান করা থেকে বিরত থাকবেন। তা না হলে বেশি নিকোটিন পেয়ে আপনার শরীরে মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

জাইবানের কী কী সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে

সব ওষুধের মত, জাইবান গ্রহণেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

● সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মুখগহ্বর শুষ্ক হওয়া এবং ঘুমের অসুবিধা। সাধারণত কয়েক সপ্তাহ পরে এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চলে যায়। যদি আপনার ঘুমে খুব বেশি সমস্যা হয়, তা হলে ঘুমানোর কাছাকাছি সময় ওষুধটি গ্রহণ না করে তা আরও অনেক আগে গ্রহণ করবেন।
● অনেক লোকের অস্থিরতা এবং ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।

জাইবান গ্রহণে সতর্কতা

জাইবান গ্রহণকালে কখনওই অ্যালকোহল পান করবেন না। খিঁচুনি বা মৃগী রোগ থাকলে জাইবান গ্রহণ করা যাবে না। যেসব ওষুধ খিঁচুনির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, সেসব ওষুধ সেবনকালে জাইবান গ্রহণ করা যাবে না। সর্বশেষ কথা হলো, ধূমপান ত্যাগে জাইবান অবশ্যই একটি কার্যকর ওষুধ, তবে সেটা চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করবেন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। **চেম্বার:** পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ, ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা। **মুঠোফোন:** ০১৬৮৬-৭২২৫৭৭।

চিঠিপত্রের জবাব

সমস্যা: বয়স ২৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট, শারীরিক

আপনি কি হতাশ?

আর হতাশা নয়। নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে স্বনামখ্যাত জ্যোতিষী **কাজী সারওয়ার হোসেন** পরিচালিত **'ভাগ্যচক্র'**তে আসুন।

৩৪৫ সেগুনবাগিচা (চতুর্থ তলা)
(ভিশন অ্যাডভারটাইজিং সংলগ্ন)
শনি থেকে বৃহস্পতিবার: বিকেল ৫.৩০–৭.৩০
ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭ (অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য)

প্রকাশিত হয়েছে
রোমাঞ্চ-হরর কাহিনি
ট্যাবু
তৌফির হাসান উর রাকিব

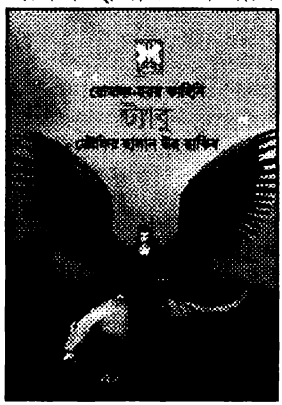

সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. নোরার চেম্বারে একটি অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে হাজির হলো এক যুবক! নর্থ হাইওয়েতে পাওয়া লাশগুলোর সঙ্গে কী সম্পর্ক মিরাণ্ডা, লারা কিংবা পুরুষ এসকর্ট, জেফ কার্টারের? স্ত্রীকে রক্ষা করতে সত্যিই কি শেষতক পিশাচের মুখোমুখি হবে মানিক?দেবদূতের আদেশে সপ্ত পাহাড়ের পবিত্র গুহা থেকে কী নিয়ে ফিরবে রাজপুত্র কিকা? বুড়ো হিউগোর নির্দেশ অমান্য করে কীসের লোভে নিষিদ্ধ এলাকায় পা বাড়াল বেপরোয়া মিচেল? সত্যিই কি গোল্ড ক্রীকের তলায় বসবাস করে কিংবদন্তীর চিতাবাঘ, মিশিবিঝিউ? জানতে হলে, পড়তে হবে, রহস্য-রোমাঞ্চ আর আতঙ্কে ঠাসা, আমাদের এবারের আয়োজন-ট্যাবু।

দাম ■ ঊননব্বই টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

গঠন হালকা-পাতলা, প্রস্রাব বা পায়খানার পাঁচ মিনিট পর ফোঁটা-ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে।

দ্বিতীয় সমস্যা: কাউকে নিয়ে সেক্সুয়াল চিন্তা-ভাবনা করলে, অথবা কোনও মেয়ের গায়ে হাত লাগলে অথবা তার সঙ্গে আলাপ করলে, পেনিসদিয়ে বীর্য বের হয়ে আসে। দয়া করে এর সমাধান দেবেন।

আশরাফ
মাণ্ডা।

সমাধান: অনেক সময় প্রস্রাবে ইনফেকশন থাকলে কিছুক্ষণ পরপর প্রস্রাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন ইউরোলজিস্টকে দেখান। আর সেক্সুয়াল যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি কোনও সমস্যা নয়।

সমস্যা: আমার বয়স ১৭ বছর। উচ্চতা ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি। আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। ১৫ বছর বয়সে হস্তমৈথুন করেছিলাম। আমার হস্তমৈথুনের স্থায়ী কাল ছিল ৩ বছর। অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত। সম্প্রতি আমি এই রোগের কুফল সম্পর্কে অবগত হয়ে খুবই চিন্তায় আছি।

আমার লেখাপড়া তেমন ভাল হচ্ছে না। এখন আর এই অপকর্মে সম্পৃক্ত নই।

শুধু আমিই নই, আমাদের গ্রামের আরও অনেক যুবক এই রোগে আক্রান্ত। তারা সহ আমাদের এটাই প্রার্থনা, আপনি এর প্রতিকার দেবেন।

মোঃ ইকবাল হাসান
সিরাজগঞ্জ।

সমাধান: আপনার কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আপনি যৌনচিন্তা বাদ দিয়ে পড়ালেখার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

সমস্যা: রহস্যপত্রিকার কাছে আমি জানতে চাই–পুরুষের স্বপ্নদোষ বলতে কী বোঝায়? এর কারণ ও প্রতিকার কী?

রাসেল
নারায়ণগঞ্জ।

সমাধান: মানুষ যেটাকে স্বপ্নদোষ বলে, সেটি শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর প্রতিকারের কোনও প্রয়োজন নেই, ওষুধ খাবারও প্রয়োজন নেই। শরীর তার স্বাভাবিক ক্রিয়ার অংশ হিসেবে এটি পরিচালিত করে। ■

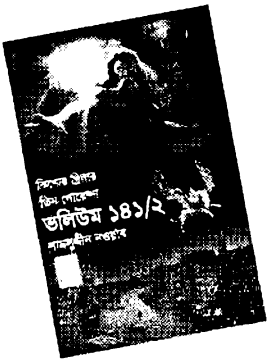

সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

গর্ভপাতের একটি প্রধান কারণ ডায়াবেটিস।

গর্ভাবস্থায়, ডায়াবেটিস অনেক বিপদের কারণ। শতকরা প্রায় একজনের এই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং গর্ভস্থ শিশুর নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। সন্তান পেটে আসার পর প্রথম যখন ডায়াবেটিস দেখা দেয় তখন তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়। সন্তান জন্মদানের পর এদের রক্তে গ্লুকোজ আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে এদের পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গর্ভাবস্থায় যে ডায়াবেটিস দেখা দেয় তা দু'ধরনের হতে পারে:

১। যখন একজন ডায়াবেটিস রোগী গর্ভধারণ করে।

২। যখন গর্ভাবস্থায় প্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। অর্থাৎ আগে ডায়াবেটিস ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে। তবে সব মহিলার যে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হবে তা নয়। কিছু মহিলার মধ্যে ডায়াবেটিস দেখা যায়, আবার অনেকেই একদম স্বাভাবিক থাকে। সাধারণত একজন গর্ভবতীর ডায়াবেটিস রোগ থাকতে পারে, এটা তখনই সন্দেহ করা হয় যখন গর্ভবতীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন:

১। বয়স ৩০ বছরের বেশি।

২। অতিরিক্ত মোটা।

৩। শিশুর ওজন যদি ৪ কেজি বা তার বেশি হয়।

৪। বাবা-মার ডায়াবেটিস থাকলে।

৫। আগে যদি প্রসবের জটিলতার ইতিহাস থাকে।

গর্ভাবস্থায় যে ডায়াবেটিস দেখা দেয় তা মা ও শিশুর উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। এতে মায়ের যেমন সমস্যা হয়, তেমনি শিশুরও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

মায়ের উপর ডায়াবেটিস রোগের প্রভাব

১। গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। গর্ভপাতের একটি প্রধান কারণ ডায়াবেটিস।

২। হাত-পা ফুলে যায় এবং রক্তের চাপ বেড়ে যেতে পারে। প্রায় ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রি-এক্লাম্পসিয়া রোগ হতে পারে। প্রি-এক্লাম্পসিয়ার সঙ্গে যদি খিঁচুনি থাকে, তবে তাকে এক্লাম্পসিয়া বলে। এটি ভয়াবহ অবস্থা এবং এ থেকে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

৩। শিশুর ওজন খুব বেশি হয়।

৪। বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ হতে পারে। প্রস্রাবে, যোনিতে এবং জনন অঙ্গে সংক্রমণ হতে পারে।

৫। নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রসবের ঘটনা বেশি ঘটে।

৬। জরায়ুর ভিতর পানির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।
৭। পেটের ভিতরে বড় শিশু এবং বেশি পানি থাকার কারণে মায়ের কষ্ট অনেক বেশি হয়।

শিশুর উপর ডায়াবেটিস রোগের প্রভাব

১। শিশু মৃত্যুর হার বেশি হয়।
২। জন্মগত ত্রুটি বেশি হয়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।
৩। অতিরিক্ত ওজনের শিশুর জন্ম হয়। এসব শিশুর শরীরে অতিরিক্ত চর্বি থাকে।
৪। শিশু বড় হবার জন্য প্রসব কঠিন হয়। প্রসবকালে শিশুর শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৫। এসব শিশুর ফুসফুসের বিকাশ যথাযথ হয় না। ফলে প্রসবের পরে শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
৬। গর্ভাবস্থার শেষ দিকে মায়ের পেটেই শিশুর মৃত্যু হতে পারে।
৭। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়।

সন্তান জন্মদান খুব বড় একটি ঘটনা। গর্ভফুল থেকে নিঃসৃত হরমোনের কারণেই অনেকের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এছাড়া গর্ভাবস্থায় ইনসুলিন-এর পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারে না। ফলে ডায়াবেটিস হয় এবং অতিরিক্ত ইনসুলিন শিশুর ওজন বৃদ্ধি করে।

গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলা উচিত। যেহেতু ডায়াবেটিস থাকলে মা ও শিশু উভয়েরই বিপদ, সুতরাং সাবধান হতেই হবে। যেসব নিয়ম মানতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

১। নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজ মাপা। প্রস্রাবে গ্লুকোজ মাপা ঠিক নয়। কারণ গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে সুগার পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে অনেক সময় ডায়াগনসিস ভুল হয়।

২। প্রথম দিকে দুই সপ্তাহ পর-পর ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। গর্ভাবস্থার শেষ দিকে এক সপ্তাহ পর-পর ডাক্তার দেখানো উচিত।

৩। গর্ভাবস্থায় যে-কোন ওষুধ দেয়া ঠিক নয়। কেননা তা বিকলাঙ্গতা তৈরি করতে পারে। এসময় শুধুমাত্র ইনসুলিন নিরাপদ। রোগীরা অনেক সময় ইনসুলিন নিতে চায় না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যত কষ্টই হোক না কেন, ইনসুলিন নেয়া উচিত। এতে অনেক জটিলতা কমে যায়।

৪। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে সন্তান বড় হয়। ফলে প্রসবে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় আগত সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে সিজারিয়ান অপারেশন করিয়ে নেয়া উচিত। এটা সন্তান ও মার জন্য বেশি নিরাপদ।

৫। গর্ভধারণের আগে থেকেই ইনসুলিন শুরু করা উচিত। এজন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। প্রসবের পর ইনসুলিন ইঞ্জেকশন বন্ধ করে মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট খাওয়া যায়। এতে কোন সমস্যা হয় না।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা একটু ভিন্ন। সাধারণ ডায়াবেটিক রোগীর সঙ্গে গর্ভকালীন ডায়াবেটিক রোগীর চিকিৎসার পার্থক্য আছে। প্রথমেই মাকে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। গর্ভধারণকালে মোট ১০ কেজি ওজন বৃদ্ধি অনুমোদিত। এর বেশি যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। ফলমূল ও শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। আঁশ জাতীয় খাবার প্রচুর খাওয়া উচিত। সরল শর্করা না খেয়ে জটিল শর্করা খাওয়া যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা ৩টি পদ্ধতিতে করা হয়

১। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ।
২। মুখে ওষুধ সেবন।
৩। ইনসুলিন ইঞ্জেকশন।

কিন্তু গর্ভকালীন ডায়াবেটিক রোগীদের মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট দেয়া উচিত নয়। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন ইঞ্জেকশনই প্রকৃত চিকিৎসা। ইনসুলিন দেয়ার কিছু সমস্যাও আছে। মাত্রা ঠিকমত দেয়া উচিত। কারণ কম-বেশি হলে রোগী শকে চলে যেতে পারে হাইপো গ্লাইসেমিয়ার কারণে। আবার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না-ও থাকতে পারে, ফলে মায়ের এবং শিশুর নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। তবে কোনভাবেই ভারী ব্যায়াম করা যাবে না। এতে অনেক ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন ব্যায়াম করা উচিত। গর্ভবতীর ডায়াবেটিস একটি জটিল সমস্যা। অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। অবহেলা করা উচিত নয় এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর ডায়াবেটিস আছে কি না জেনে নেয়া উচিত। ■

এক কাপ কফি

অর্পণ দাশগুপ্ত

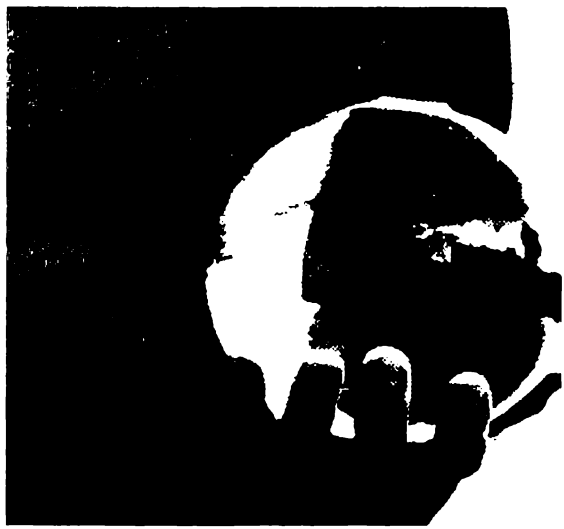

প্রফেসর তাদের বললেন, 'তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে, দামি কাপগুলোই তোমরা নিয়েছ, ট্রে-তে শুধু সস্তা আর সাধারণ কাপগুলো পড়ে রয়েছে।'

ভার্সিটি পাশ করে বেশ কয়েক বছর আগে বেরিয়ে যাওয়া কিছু ছাত্র ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একদিন তাদের প্রিয় শিক্ষকের বাসায় বেড়াতে এল।

আলোচনার এক পর্যায়ে সবাই নিজ-নিজ পেশাগত জীবনের চাপের কথা তাদের প্রফেসরকে জানাল। এক সময় সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে প্রফেসর তাদের জন্য কফি বানিয়ে আনতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি বড় কেটলিতে করে কফি ও একটি ট্রে-তে করে কয়েক ধরনের কাপ নিয়ে ফিরে এলেন। এগুলোর মধ্যে ছিল চীনামাটির কাপ, প্লাস্টিকের কাপ, স্ফটিকের কাপ–যেগুলোর কিছু ছিল সস্তা আর কিছু বেশ দামি। প্রফেসর তাদেরকে যার-যার কাপ নিয়ে কফি ঢেলে নিতে বললেন।

যখন তারা সবাই কফি ঢেলে নিল, প্রফেসর তাদের বললেন, 'তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে, দামি কাপগুলোই তোমরা নিয়েছ, ট্রে-তে শুধু সস্তা আর সাধারণ কাপগুলো পড়ে রয়েছে। এই যে তোমরা সবসময় নিজেদের জন্যে সবচেয়ে ভালটা চাও, এটাই তোমাদের জীবনের সমস্যা আর মানসিক চাপের কারণ। জেনে রাখো, কাপ যত দামিই হোক, তা কফির মধ্যে কোন বাড়তি স্বাদ যোগ করে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা কী খাচ্ছি, সেটাই বরং লুকিয়ে ফেলে। তোমরা আসলে যা চাচ্ছিলে তা হলো কফি, কাপগুলো নয়, কিন্তু তারপরও তোমরা সচেতনভাবে সবচেয়ে ভাল কাপটাই বেছে নিলে এবং তারপর একে অপরের কাপের দিকে তাকাতে শুরু করলে।

'আমাদের জীবন হলো সেই কফির মত; আর চাকরি, টাকা-পয়সা এবং সমাজ হলো সেই কাপটি। কাপগুলো শুধু জীবনটাকে ধরে রাখার জন্যে, কিন্তু এগুলো আমাদের জীবনের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করে না অথবা আমাদের জীবনের সুখও নির্ধারণ করে না। কখনও-কখনও অন্যের কাপটার দিকে তাকাতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা আমাদের যে কফিটা দিয়েছেন, আমরা তা উপভোগ করতে ভুলে যাই!' ■

(অনলাইন রচনা অবলম্বনে)

কাটা পা

মূল ■ অলিভার স্যাক্স্
রূপান্তর ■ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

নিশ্চয়ই নার্সদের একজন শব ব্যবচ্ছেদ করার ঘর থেকে একটা কাটা পা এনে ওর কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

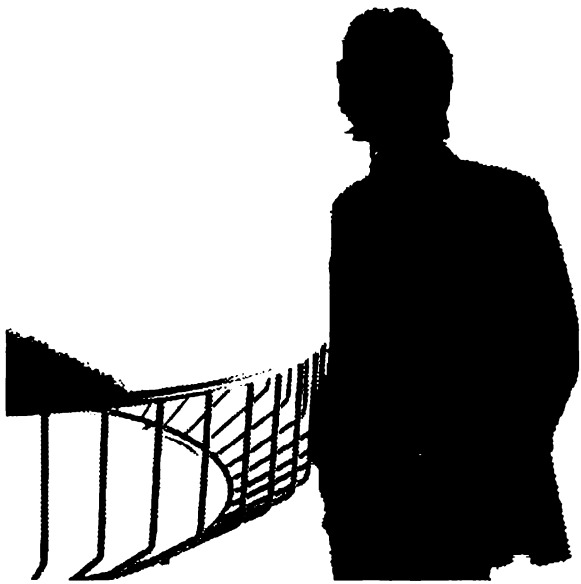

অনেক বছর আগের কথা, তখন আমি ছিলাম একজন শিক্ষানবীশ। হঠাৎ রাতের বেলা এক নার্স আমাকে ফোন করলেন, অবাক করা একটা গল্প শোনালেন তিনি। জানালেন, সেদিন সকালেই এক কম বয়সী যুবক ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। দারুণ ভদ্র ছেলেটার মাঝে সারা দিন কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। রাতে ঘুমিয়েও পড়েছে বিনা সমস্যায়। আচমকা একটু আগে ঘুম থেকে উঠে অদ্ভুত আচরণ করছে। কীভাবে যেন বিছানা থেকেই পড়ে গিয়েছে সে! এখন মেঝেতেই বসে আছে, অনেক চেষ্টা করেও তাকে বিছানায় ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না। নার্স অনুরোধ করলেন, আমি কি একটু এসে দেখে যেতে পারব?

যুবকের ঘরে পৌঁছে দেখি, মেঝেতে বসে আছে সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা পায়ের দিকে। চেহারায় রাগ, বিস্ময় আর চোখের তারায় সতর্কতা। তবে আতঙ্কের একটা ছাপ রয়েছে তার চোখে-মুখে, শরীরের ভঙ্গিমায়। জানতে চাইলাম, বিছানায় যেতে সাহায্য লাগবে নাকি তার? আমার প্রশ্ন শুনে যুবককে আহত মনে হলো, মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে বিছানায় ফিরে যেতে চায় না। হিস্ট্রি, মানে রোগের ইতিহাস নেবার জন্য ওর পাশেই বসে পড়লাম।

সকালে কয়েকটা পরীক্ষা করাবার জন্য এসেছিল ও, জানাল ছেলেটা। কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু যে স্নায়ু বিশেষজ্ঞকে দেখাচ্ছিল, তিনি কিছু পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন। 'অলস পা', ঠিক এই শব্দদুটোই উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন সেজন্য পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সারা দিন কোন সমস্যা হয়নি, রাতে ঘুমিয়েও পড়েছে সময়মতই। কিন্তু আচমকা ঘুম থেকে উঠে দেখে, বিছানায় কার যেন কাটা পা! কী বাজে ব্যাপার! প্রথমে তো একদম চমকে গিয়েছিল ও। পরে সাহস জুগিয়ে পা-টাকে স্পর্শ করে দেখে। আকৃতি বিকৃত করা হয়নি, তবে অদ্ভুত রকম ঠাণ্ডা হয়ে ছিল। এমন সময় এই পায়ের রহস্য ধরে ফেলে যুবক–কেউ একজন ওর সাথে ঠাট্টা করছে!

বাজে আর রুচিহীন একটা কাজ হলেও, এটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু না! নতুন বছরের শুরু হতে চলেছে, চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। আতশবাজি ফুটছে চারদিকে। নিশ্চয়ই নার্সদের একজন শব ব্যবচ্ছেদ করার ঘর থেকে একটা কাটা পা এনে ওর কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ব্যাখ্যাটা বড় মনে ধরে ওর। কিন্তু তাই বলে তো আর কাটা পায়ের সাথে রাত কাটানো যায় না! তাই ধাক্কা মেরে সেটাকে বিছানা থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায় সে।

এতক্ষণ বেশ স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল ছেলেটি, এখন কেঁপে উঠল। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল চেহারা। জানাল, যখন পা-টাকে সে বিছানা থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দিল, তখন কেন যেন ওর দেহটাও আছড়ে পড়ল মেঝেতে! এখন দেখতে পাচ্ছে, কাটা ওই পা-টা ওর দেহের সাথে কেউ লাগিয়ে দিয়েছে।

'একবার ওটার দিকে তাকিয়ে দেখুন না!' বিতৃষ্ণা দেখা গেল ছেলেটার চেহারায়। 'অমন বাজে, গা গুলিয়ে তোলা জিনিস আর দেখেছেন কখনও? আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা মরা মানুষের! কিন্তু...কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, পা-টা আমার দেহের সাথে লাগানো।' দুই হাত দিয়ে পা-টা আঁকড়ে ধরল যুবক, দেহের সব শক্তি খাটিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল। যখন পারল না, তখন দমাদম ঘুষি বসাতে শুরু করল ওটায়।

'আস্তে!' যুবককে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। 'শান্ত হোন! আপনার জায়গায় আমি হলে পা-টার উপর এমন অত্যাচার করতাম না।'

'কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ছেলেটা।

'কেননা ওটা আপনারই পা!' আমি উত্তর দিলাম। 'নিজের পা-কে নিজে চিনতে পারছেন না?'

একই সাথে অনেকগুলো অনুভূতি খেলা করে গেল ওর চেহারায়–বিহ্বলতা, ভয়, অবিশ্বাস আর আনন্দ। তবে স্থায়ী হলো কেবল সন্দেহ। 'আহ, ডাক্তার সাহেব!' বলল সে। 'আপনিও নিশ্চয়ই নার্সের সাথে যোগ দিয়ে আমাকে বোকা বানাচ্ছেন। রোগীদের সাথে এমনটা করা কি উচিত, বলুন?'

'আমি ঠাট্টা করছি না।' বললাম আমি। 'ওটা আসলেই আপনার নিজের পা।'

আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা বুঝতে পারল, আমি ঠাট্টা করছি না। সন্দেহটা নিমিষে পাল্টে গেল নিখাদ আতঙ্কে। 'এসব আপনি কী বলছেন, ডাক্তার সাহেব? আমার পা হলে, আমি চিনব না?'

'চেনা তো উচিত। তাই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনিই আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন না তো?'

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি...আমার দেহকে আমি অবশ্যই চিনি। কোন্‌টা আমার পা, কোন্‌টা নয়–তা আমি বিলক্ষণ জানি। এই জিনিসটা–' ঘৃণায় যেন কেঁপে উঠল যুবক। 'কেন যেন নিজের বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোন ভ্রম!'

'তাহলে কীসের মত মনে হচ্ছে?' যুবকের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।

'কীসের মত মনে হচ্ছে?' আমার কথাগুলোই আবার বলল সে। 'বলছি আপনাকে। দুনিয়ার কোন কিছু বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে অপার্থিব কিছু। এই জিনিস আমার শরীরের অংশ হয় কী করে? আমি জানি না...' বলতে-বলতে থেমে গেল বেচারা। মনে হচ্ছে যেন দারুণ নাড়া খেয়েছে।

'শুনুন,' বললাম আমি। 'আমার মনে হয় না আপনি পুরোপুরি সুস্থ। বিছানায় আপনাকে ফিরিয়ে নেবার অনুমতি দিন। আর একটা শেষ

প্রশ্নের জবাব আশা করছি আপনার কাছ থেকে। যদি এই...এই জিনিস আপনার না হয় (কথাবার্তার এক পর্যায়ে পা-টাকে নকল আর মনুষ্য নির্মিত বলেছিল যুবক), তাহলে আপনার আসল পা কই গেল?'

আরেকবার সাদা হয়ে গেল যুবক, আমার তো ভয় হচ্ছিল, বেচারা না অজ্ঞান হয়ে যায়। 'আমি জানি না,' বলল সে। 'আমার কোন ধারণাই নেই। উধাও হয়ে গিয়েছে। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না...'

পুনশ্চ

এই ঘটনা ছাপা হবার পর, আমি প্রখ্যাত স্নায়ুবিশারদ ডা. মাইকেল ক্রেমারের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। ওতে তিনি লিখেছিলেন:

হৃদ্‌রোগের রোগীদের জন্য আলাদা করা ওয়ার্ডে একবার আমি এক রোগী দেখতে যাই। হৃদ্‌যন্ত্রের কিছু সমস্যা ছিল তাঁর। পরবর্তীতে সেটা মস্তিষ্কে গিয়ে ওঁর বাঁ দিক পুরো অবশ করে ফেলে। আমাকে ডাকা হয়েছিল, কেননা তিনি প্রায় রাতেই বিছানা থেকে পড়ে যেতেন। অথচ হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞরা এর কোন কারণ খুঁজে বের করতে পারেননি।

রাতে কেন এমন হয়, এ কথা যখন জিজ্ঞেস করলাম, তখন রোগী সরাসরি বললেন: ঘুম থেকে ওঠার পরেই তিনি বিছানায় একটা মৃত, ঠাণ্ডা, রোমশ পা খুঁজে পান। কেন, তা তিনি জানেন না। আবার ওটাকে সহ্যও করতে পারেন না। তাই ভাল হাতটা দিয়ে ওটাকে ঠেলে সরিয়ে দেন। যখন বিছানা থেকে ওটা মেঝেতে পড়ে, তখন তাঁর দেহও ওটার অনুগামী হয়!

বুঝতেই পারছেন, অবশ পা-টাকে তিনি নিজের বলে চিনতেই পারছিলেন না! তার চেয়ে মজার কথা, তাঁর নিজের পা তাহলে তখন কোথায় থাকে, এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি কখনও দিতে পারেননি। আসলে মৃত ওই পায়ের অবস্থান নিয়ে তিনি এত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, এই প্রশ্নটাই কখনও তাঁর মাথায় কাজ করেনি।■

(লেখক নিজে একজন চিকিৎসক হওয়ায়, তাঁর লেখার মাঝে ডাক্তারি শব্দের উপস্থিতি ছিল। সেগুলোকে সবার বোঝার সুবিধার্থে সরলীকরণ করা হয়েছে। –অনুবাদক)।

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
কুইন অভ দ্য ডন
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

দলটা অদ্ভুত।
রানি হয়েও চাষির স্ত্রীর বেশ ধারণ-করা রিমা। চাষির মেয়ের মতো করে সাজানো রাজকুমারী নেফ্‌রা। সম্ভ্রান্ত ধাইমা থেকে আটপৌরে রমণী সাজা কেম্মাহ্‌। দেহরক্ষী থেকে কুলিতে পরিণত হওয়া দৈত্যাকৃতির রু। এবং ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া রহস্যময় টাউ। পালাচ্ছেন তাঁরা। কারণ ভীষণ এক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ফারাও খেপেরা, বিজয়ীপক্ষ হত্যা করতে চাইছে রানি ও রাজকুমারীকে। দলটা কি পারবে মেমফিসের পবিত্র ভূমিতে হাজির হতে, যেখানে থাকেন গোপন এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু রয়? তিনি কি নেফ্‌রাকে আগলে রাখতে পারবেন আসলেই?
দেবী আইসিস ও হাথোরকে নিয়ে যে-স্বপ্ন দেখেছেন রিমা, তা কি সত্যি হবে শেষপর্যন্ত?...প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের পটভূমিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম এবং অবশ্যম্ভাবী নিয়তির একটি অবিস্মরণীয় উপাখ্যান।

দাম ■ একশ' উনত্রিশ টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০,
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

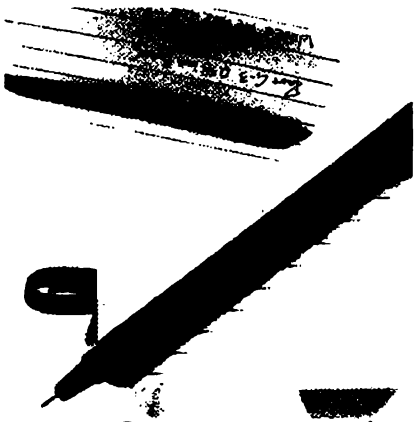

দেশ-বিদেশের জার্নাল

মাহবুবুর রহমান শিশির

বহুকষ্টে কলম ধরে, কাঁপা-কাঁপা
হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখতে পারলাম-
'ভালবাসি তোমায়, বাংলাদেশ।'

ব্যাংককের এক ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি। সেল্‌স-কনফারেন্স চলছে, একঘেয়ে লাগছিল কচকচানি, হাই উঠছিল বারবার; তাই চুপিসারে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। কিছু সময়ের ফাঁকিবাজি আর কী। সরাসরি কনফারেন্স-বিল্ডিং-এর সামনে না দাঁড়িয়ে পাশের এক বাসার নাক বরাবর দাঁড়ালাম। সুন্দর, ছবির মত বাসা। দেয়াল দেখা যায় না। অসংখ্য রং-বেরঙের ফুল আর লতায় ঢাকা পড়ে গেছে।

স্থানীয় এক বৃদ্ধকে দেখলাম এগিয়ে আসতে, আমাকে পার হবার সময় হঠাৎ থেমে গেল সে। এরপর, আমাকে বিস্ময়ের সাগরে ঠেলে দিয়ে, বাউ করে বসল লোকটা। হতভম্ব আমি নিজের অজান্তেই সামান্য নড করলাম। লোকটা শ্রদ্ধা বিনিময় শেষ করে এগিয়ে গেল সামনে।

আমি ধাতস্থ হবার সুযোগ পেলাম না। একের পর এক পথচারীরা সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর চোখে-মুখে যতটা সম্ভব বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বাউ করছে। আমিও বেকুবের মত নড করে যাচ্ছি। একটা ব্যাপার হঠাৎ খেয়াল হলো, বাউ করার সময় কিংবা আগে-পরে কেউই সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। (এখন লিখতে বসে নিজের উপর রাগ হচ্ছে। আরেকটু আগে কেন লক্ষ করলাম না?) বিষয়টা খেয়াল হতেই আমার সিক্সথ সেন্স সতর্কবার্তা পাঠাল।

সন্দেহভরা চোখে পিছনে তাকালাম। দ্বিতীয় কোনও মানুষ নজরে এল না। বাড়ির প্রাচীরের সামনে একাই দাঁড়িয়ে আছি। আগেই বলেছি দেয়ালটা পুরোপুরি নানা জাতের লতায় ঢাকা। মনে হলো লতার ফাঁক দিয়ে কীসের যেন একটা অবয়ব হালকা করে ফুটে বেরুচ্ছে। ভুরু কুঁচকে দেয়ালের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালাম। চোখে শকুনের দৃষ্টি। দেয়ালে কার যেন ছবি আঁকা। খুব সাবধানে, আন্দাজে, যেখানে ছবির মুখ থাকতে পারে, সেই জায়গাটার লতাগুলো দুইপাশে টেনে ধরলাম। উন্মোচিত হলেন

তিনি...

থাইল্যাণ্ডের রাজা।

কাজীরা সংসার গড়েন। আবার কখনও-সখনও সংসার ভাঙতেও হয় তাঁদের।

প্রথমটার উদাহরণ তো দেখেছি বিস্তর। নিজে শিকারও হয়েছি...বেশি না, একবার মাত্র! তবে দুর্ভাগ্যই বলব, দ্বিতীয়টার উদাহরণও একবার চাক্ষুষ করতে হয়েছিল।

ঘটনাস্থল: লাকসাম।

সকাল-সন্ধ্যা ট্যুর ছিল সেদিন। গেছিলাম এজেন্ট ভিজিটে। মার্কেটের দোতলায় ছিল তার শো-রুম। একটা টানা বুক-চেরা বারান্দার এক মাথায়। দুইপাশে সারি-সারি দোকানপাট।

শো-রুমের উল্টোদিকের শেষ মাথায় ছিল কাজী সাহেবের অফিস। সম্পর্কে তিনি আবার আমার এজেন্টের বাবা। বাপ-বেটার অফিস দুটোর মাঝখানের দূরত্বটুকু ছিল ডায়াগোনাল।

কাজ শেষ হলো বিকাল নাগাদ। উঠব-উঠব করছি, এজেন্ট বিদায়বেলায় শেষ এক কাপ চায়ের অফার দিল। সায় দিয়ে গা এলিয়ে দিলাম চেয়ারে। দৃষ্টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পড়ল উল্টোদিকে বারান্দার শেষ মাথায়।

তখনও বন্ধ কাজীর অফিস। তবে জানি আসরের নামাজ শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই শাটার তুলবেন কাজী সাহেব।

বন্ধ অফিসের সামনে অপেক্ষা করছিল ওরা। পুরো একটা পরিবার। শক্ত, নির্বিকার চেহারার একজন পুরুষ। একজন মহিলা। স্ত্রীই হবেন। কাঁদছিলেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। ১০-১১ বছরের একটা ছেলে আর ৭-৮ বছরের একটা মেয়ে। দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দু'জনেরই চেহারায় দিশেহারা ভাব। এবং সন্ত্রস্ত। যেন আঁচ করতে পেরেছে ভয়াবহ এক টর্নেডো ধেয়ে আসছে ওদের গিলে খেতে।

এবং একটা ৩-৪ বছরের ছোট্ট মেয়ে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। নিশ্চিন্তে ছুটে-ছুটে বেড়াচ্ছে বারান্দাময়। কখনও হেসে উঠছে খিলখিল করে।

'স্বামী-স্ত্রীর তালাক হবে আজকে।' এজেন্টের কথায় চমক ভাঙল। চেহারা বেকুব বানিয়ে তাকালাম তার দিকে।

'তুমি চেন ওদের?' জিজ্ঞেস করলাম।

'চিনব না কেন, কয়েকদিন ধরেই তো আসছে আব্বার কাছে...'

'কেন তালাক হবে?' প্রশ্নটা বোকার মত হলো কি না বুঝলাম না।

এজেন্ট জবাব দিল, 'অশিক্ষিত মানুষের পকেটে কাঁচা পয়সা এলে যা হয় আর কী...আরেকটা বিয়ে করবে। এদিকে বউও পারমিশন দেয় না। তাই এসেছে তালাক দিতে। অনেক বোঝাচ্ছেন আব্বা...বাচ্চাদের মুখের দিকে চেয়ে হলেও...কাজ হচ্ছে না, ব্যাটার ওই এক গোঁ!'

কাজী সাহেব চলে এসেছেন। অফিস খুলে প্রবেশ করলেন ভেতরে। তাঁর পেছন-পেছন লাইন করে ঢুকে গেল পুরো পরিবার।

কৌতূহল আমার চরমে তখন। চেয়ার ছেড়ে কাজীর অফিসের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এভাবে উঁকিঝুঁকি দেয়াটা অশোভনীয়, কিন্তু তখন আর অতকিছু খেয়াল করার মত অবস্থায় ছিলাম না।

কাজী সাহেবকে দেখলাম ঘন-ঘন হাত নেড়ে লোকটার সাথে মৃদুস্বরে কথা বলছেন। ভঙ্গিটা বোঝানোর। লোকটার চোখ-মুখ-চোয়াল আরও শক্ত হয়ে উঠছে। কাজী সাহেবের কথার জবাবও দিচ্ছে কর্কশ, একগুঁয়ে কণ্ঠে।

মহিলা মুখে আঁচল চেপে নীরবে কেঁদেই চলেছেন। অস্পষ্ট কানে আসছিল। বড় দুইজনের ফ্যাকাসে চোখে-মুখে নীল আতঙ্ক। কেবল ছোটটাই স্বাভাবিক। বড় বোনের কোলে বসে আছে। মাঝে-মধ্যে ছটফট করছে কোল থেকে নেমে ছোটাছুটি করার জন্য। তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে বোন।

একসময় একটা ফাইল টেনে নিলেন কাজী সাহেব। তাঁর এবারের ভঙ্গিটা হাল ছেড়ে দেয়ার। ফাইল খুলে খসখস করে কীসব লেখা শুরু করলেন। ...বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা। সাথে বড় দুটোও।

আর সহ্য হলো না। ফিরে এসে বসলাম আগের জায়গায়। মাথা কাজ করছিল না। বিশ্বাস হচ্ছিল না এতক্ষণ ধরে যা দেখেছি, সত্যিই দেখেছি।

একযুগের ওপর পার হয়ে গেছে। এখনও

সিনেমার ক্লোজ-শটের মত মুখগুলো চোখে প্রায়ই ভেসে ওঠে। কঠিন, হৃদয়হীন এক পুরুষ। ক্রন্দনরতা অসহায় মহিলা। দিশেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত একজোড়া নাবালক ছেলেমেয়ে।

এবং একটা কচি মুখ। দু'চোখে তার দুষ্টুমির ঝিলিক!

কুমিল্লায় পোস্টিং পড়েছিল একবার, তখনই পরিচয় হয় ছেলেটার সাথে। প্রথম বছরেই। যদিও এতগুলো বছর পরে আজ আর তার নাম মনে পড়ে না।

বয়সে আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট। পড়াশুনা করেছিল মাদ্রাসার লাইনে। পরনে সবসময়ই সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবী। মাথায় টুপি। তার স্বভাব আমাকে ভালই মুগ্ধ করেছিল। কথা বলত কম। বাড়তি কথা তো একদমই না। আর বলার সময় গলাও চড়াত না। মুখটাও ছিল সদা হাসি-ভরা। সারল্য মাখা। তার হাবে-ভাবে কখনও ফুটানি দেখতে পাইনি। ধর্মের ওপর তার ছিল অগাধ জ্ঞান, যদিও তার চিন্তা-চেতনা কেবল ধর্ম-কেন্দ্রিক ছিল না। যে-কোনও বিষয়েই তার ছিল অগাধ কৌতূহল।

আমার অফিসে আসত সে, তবে সেটাও যে খুব ঘন-ঘন, তা-ও না। এখানেও সে চমৎকার পরিমিতিবোধের পরিচয় দিত। আমি অবসর থাকলে তাকে বেশ খানিকক্ষণ সময় দিতাম আর বলা বাহুল্য–আগ্রহের সাথেই। আলাপ হত নানা বিষয় নিয়ে। বিশেষত ধর্ম নিয়ে। একদিন বলেই বসলাম, 'তোমার ধর্মীয় জ্ঞানের ওপর দখল যে কাউকেই হিংসায় ফেলবে। অনেক কিছু শেখার আছে তোমার কাছ থেকে।'

মনে পড়ে, কীভাবে লজ্জায় লাল-টাল হয়ে, জিভ কেটে বলেছিল, 'লজ্জা দিয়েন না, স্যর। কাউকে শেখানোর মত জ্ঞান আমার নেই। আমি শুধু যেটুকু শিখেছি তাই শেয়ার করি।'

একদিনের কথা। যথারীতি বেশ অনেকদিন গ্যাপ দিয়ে আমার অফিসে এল সে। মুখভরা হাসি। উপচে পড়ছে। বলল, 'স্যর, দোয়া করবেন। ব্যবসা একটা ধরেই ফেললাম।'

অন্তর থেকে অভিনন্দন জানিয়ে জানতে চাইলাম–কীসের ব্যবসা? যা বোঝাল–একটা ট্রাভেল এজেন্সি খুলেছে সে হজ-যাত্রীদের জন্য।

সেবার স্বল্প সংখ্যক লোককে হজ করিয়ে আনল সে। ফিরে এসে হাজীদের প্রশংসা আর শেষ হয় না। এত কাজের লোক...এতটুকু কষ্ট পেতে হয়নি তাদেরকে হজ করতে। ওই ছেলে সারাক্ষণ মায়ের মত আগলে রেখেছিল, কোনও রকম তকলিফ পেতে হয়নি...ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বভাবতই পরের বছর দ্বিগুণ লোক এসে ধরনা দিল তার অফিসে। টাকা জমা দিল। এবং একদিন ভালয়-ভালয় ফিরেও এল হজ পালন করে।

এবার রীতিমত ধন্য-ধন্য পড়ে গেল মোগলটুলিতে। তার রেশ পড়ল তৃতীয় বছরে। রেকর্ড সংখ্যক লোক এসে ভিড় জমাল তার অফিসে।

এখানে বলে রাখা ভাল–ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণে এরই মধ্যে তার আমার অফিসে আসা বন্ধ হয়ে গেছিল।

একদিন হঠাৎ খবরটা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম।

হাওয়া হয়ে গেছে ছেলেটা। কোথাও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার এজেন্সিতেও ঝুলছে বিশাল বড় এক তালা।

প্রথমে হতবাক, পরে মাথায় যেন বাজ পড়ল সবার। অনেক লোকের বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে একেবারেই নাই হয়ে গেছে সে। ক্ষোভে ফেটে পড়ল হজ-যাত্রীরা। শুরু হলো হম্বিতম্বি...তোড়জোড়-অনুসন্ধান...পুলিস কেস...সবই ভেসে গেল গোমতি নদীতে।

পরের বছর ঢাকা চলে আসি আমি। কয়েক মাস পরের কথা। পত্রিকা পড়ছিলাম। হঠাৎ খবরটা চোখে পড়লঃ অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে দিল্লীতে বাংলাদেশি ট্রাভেল এজেন্ট গ্রেফতার। আগ্রহ জন্মাল। মন লাগালাম খবরটার ভেতরে।

সেই ছেলেটা! এজেন্সির নামও মেলে। টাকার বস্তা নিয়ে কুমিল্লা বর্ডার পেরিয়ে ওপারে অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছিল সে। বেশ অনেকদিন গা বাঁচিয়ে চলতে পারলেও শেষমেশ আর রক্ষা করতে পারেনি নিজেকে...খবরটা পড়ার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

একযুগ পার হয়ে গেছে এরপর। ওই ছেলের আর কোনও খবর পাইনি। জানি না সে

কি আজও ইণ্ডিয়ার কোনও জেলে আটকে আছে, নাকি ফিরতে পেরেছে দেশে? এক অদ্ভুত মিশ্র অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে সে আমার জীবনে। হয়তো সে কারণেই হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে তাকে। কানে ভাসে–'...কাউকে শেখানোর মত জ্ঞান আমার নেই। আমি শুধু যেটুকু শিখেছি তাই শেয়ার করি।'

আমার পোস্টিং তখন চট্টগ্রামে। সেখান থেকেই আমাকে দেখতে হত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি আর কক্সবাজার। প্রায় প্রতি মাসেই ভিজিট করতাম এই জায়গাগুলোয়। কাজের পাশাপাশি পাহাড়, জঙ্গল আর সমুদ্র দর্শনও চলত। বলা বাহুল্য, একজন নির্বাহীর জন্যে ওটা ছিল বড়ই আরাধ্য পোস্টিং।

হেডঅফিস থেকে তিন বস ভিজিটে এলেন একদিন। ওঁরা কাজ ধরবেন কক্সবাজার থেকে। আড়ালে এঁদেরকে আমরা 'মামু' ডাকতাম। এঁদের একজন এরিয়া ম্যানেজার। আমার সরাসরি রিপোর্টিং বস। ইনি কুট্টি মামু। মাঝেরজন সেল্‌স ম্যানেজার। এরিয়া ম্যানেজারের রিপোর্টিং বস। মাইঝলা মামু। তৃতীয়জন এঁদের সবার বস। হেড অভ সেল্‌স অ্যাণ্ড মার্কেটিং। ইনি হলেনগে বড় মামু।

মামুরা সবাই আমার নেতৃত্বে সমুদ্রে যাবেন। বর্ষার সিজন। ওঁরা আমার এরিয়ায় পায়ের কাদা দিয়েছেন। সো আমিই হোস্ট কাম গাইড। খুব সকালে হোটেল শৈবালের পিছনের সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে মামুদের বিচে নিয়ে এলাম। এদিকটায় দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে না বললেই চলে। আমাদের কারোরই গা ভেজানোর পরিকল্পনা ছিল না। তাই কেউই আমরা আর সাথে করে দ্বিতীয় কোনও বস্ত্র নিইনি।

সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, প্রবল বাতাস বইছিল। বিচে এসে দেখি, বড়-বড় ঢেউ সগর্জনে কান ফাটিয়ে ধেয়ে এসে ধপাস-ধপাস আছড়ে পড়ছে তীরে। আমরা আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো বৃষ্টি।

মাত্র এসেছি। এত তাড়াতাড়ি ফিরতে কারোরই মন চাইছিল না। মনের মত প্রস্তাব দিয়ে বসলেন বড় মামু। 'চলেন পানিতে নামি সবাই। বৃষ্টিতে চুবাচুবির মজাই আলাদা।'

'টাওয়েল, হাফপ্যাণ্ট কিছুই যে সাথে আনি নাই...' মাইঝলা মিন-মিন করে বললেন।

'অসুবিধা কী? আণ্ডি পইরাই নামুম! পরে রোদ উঠলে এমনিতেই গা শুকাইব। নইলে হোটেলে ফিরা শুকামু।'

'কিন্তু, স্যর, আমার যে লুঙ্গি পরা!' কুট্টি প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন।

'কাছা মারেন!' বড় মামু নির্বিকার মুখ বানিয়ে সহজ সমাধান দিলেন। 'খালি একটু খেয়াল রাইখেন, পানিতে আপনি আর লুঙ্গি যেন আবার আলাদা না হয়ে যান...তাইলে কিন্তু আপনারে আমরা কেউই চিনুম না!'

ততক্ষণে শার্টের বোতাম খোলা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। কথায় আছে রোদের চেয়ে বালির তাপ বেশি। বসকে শার্ট খুলতে দেখে মাইঝলা প্যান্টের চেইন নামিয়ে ফেললেন। কাছা মেরে রেডি হলেন কুট্টি মামু। আমিও 'মহাজ্ঞানী মহাজন যেভাবে হয়েছেন আধা-উদোম...' ফর্মুলা অবলম্বন করলাম।

চারজন টারজান, ৩৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে যাদের বয়স তখন, ব্যাঙের মত লাফাতে-লাফাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে। গায়ে বৃষ্টি সুঁই ফোটাচ্ছে। একটা বিশাল আকৃতির ডায়াবলিক ঢেউকে দেখলাম হেঁড়ে গলায় গগ্গারের মত ছুটে আসছে। আমরা লাইন করে ওটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখতে না দেখতেই গোলার ধাক্কায় তলিয়ে গেলাম সবাই। ঢেউ আমাদের ছুঁড়ে ফেলল বেলাভূমিতে।

পটভূমি: শিলং। ইণ্ডিয়ার মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী।

হোটেলের লবিতে অনেক রাত পর্যন্ত টানা আড্ডা দিলাম ভদ্রলোকের সাথে। হোটেলের ম্যানেজার তিনি। বাঙালি। বাড়ি কোলকাতা। সাধারণত বিদেশে এলে যা হয়, দিনভর অফিশিয়াল ব্যস্ততার কারণে রাতটাকেই বেছে নিই টো-টো করে ঘুরে নতুন দেশটাকে চেনা-দেখার জন্য। কিন্তু এখানে সেটার জো নেই। ম্যানেজার কঠিনভাবে বাইরে বেরুতে নিষেধ করলেন। ইন ফ্যাক্ট তাঁর কথা না মেনে অন্য উপায়ও ছিল না। শিলং-এ সেসময় রাত ৮টার পর ব্ল্যাক আউট। কারণ: বিচ্ছিন্নতাবাদীদের

তৎপরতা।

আলাপের এক ফাঁকে তাঁকে বেনসন অফার করলাম। চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। সাগ্রহে আর অতি উৎসাহে ওটা প্রায় কেড়ে নিয়ে শত জনমের উপোসীর মত টানা শুরু করলেন। তুমুল আড্ডা সেরে রুমে যখন ফিরলাম ততক্ষণে পুরো এক প্যাকেট ফিনিশ! যার অর্ধেকটাই তিনি মেরে দিয়েছেন এবং আমাকে কখনওই দ্বিতীয়বার সাধতে হয়নি।

পরদিন সকাল।

নাস্তা সেরেই ম্যানেজারের রুমে গেলাম। উদ্দেশ্য ডলার ভাঙাব। আগের রাতে তিনিই বলেছিলেন সকালে সরাসরি যেন তাঁর সাথে দেখা করি। ভদ্রলোক ভাবলেশহীন মুখে তাকালেন আমার দিকে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, মৃদু কণ্ঠে বসতে বললেন। পরিচিতির চিহ্ন মাত্র খুঁজে পেলাম না তাঁর চেহারায়। তাঁর চোখে প্রশ্ন দেখে বাধ্য হয়ে বললাম আসার উদ্দেশ্য। উনি কাজে হাত দিলেন। এক ফাঁকে পিয়নকে ডেকে বললেন চা দিতে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল মন। নাস্তার পর আরেক দফা চা–মন্দ কী! ট্রে-তে করে মাত্র এক কাপ চা নিয়ে এল পিয়ন। আমাকে উজবুক বানিয়ে কাপটা নিজের দিকে টেনে নিলেন তিনি। ঠোঁট ছোঁয়ালেন–যেন চুমু দিলেন আয়েশে, ধীরে-সুস্থে; পরে উদগ্র ফ্রেঞ্চ-কিসিং স্টাইলে সুড়ুত-সুড়ুত শব্দে শেষ করলেন চা-টা। আমি কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখে গেলাম। পরে পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে একটা ধরালেন। আমাকে অফার করার ঝামেলায় না গিয়ে প্যাকেটটা ফেরত পাঠালেন পকেটে। হুশ-হুশ শব্দে সিগারেট টানছেন...আমি বসেই আছি।

এত কিছুর মধ্যেও তাঁর কাজ কিন্তু থেমে নেই। যথাসম্ভব দ্রুত রুপিগুলো বুঝিয়ে দিলেন আমাকে। ভালমানুষের মত বিদায় নিলাম আমিও।

বসের সাথে ট্যুরে বেরিয়েছিলাম। এনরুটমেন্ট: কুমিল্লা-লাকসাম-লক্ষ্মীপুর-রায়পুর-ফরিদগঞ্জ-চাঁদপুর-হাজিগঞ্জ হয়ে ব্যাক টু কুমিল্লা–আমার তৎকালীন আস্তানা। এরপর বস ফিরে যাবেন তাঁর চট্টগ্রামের ডেরায়।

রাত প্রায় ৮টা। ইচুলি ফেরীঘাটে দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে। ওপারেই চাঁদপুর শহর। রাতটা ওখানেই হোটেলে কাটাব। ফেরী তখনও ঘাটে লাগেনি।

যখনকার কথা বলছি, ইচুলি ব্রিজ তখনও তৈরি হয়নি।

ঘাটের সাথে লাগোয়া বাজার। ছোট-ছোট রুই মাছ উঠেছে। তির-তির করে কাঁপছিল। মাত্র নদী থেকে ধরা। দেখলেই জিভে পানি আসে।

পানি এল বসের জিভেও। বিড়বিড় করে উঠলেন, 'আহ, একবার যদি খেতে পারতুম!' ওনার আবার শান্তিপুরী ভাষায় কথা বলার অভ্যাস। তাই আমি ইচ্ছা করেই তাঁর সাথে আমার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ মারতাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনে খাইবেন?'

তিনি ভ্রূ কুঁচকালেন। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছিলেন আমি ঠাট্টা করছি কি না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি সিরিয়াস?'

'আপনে খাইবেন কিনা সেইটা কন আগে...'

'কীভাবে? হোটেলওয়ালা নিশ্চয়ই আমাদের দেয়া মাছ আমাদের রেঁধে খাওয়াবে না...'

'সেইটা তো আমার মাথাব্যথা...আপনে খালি মাল ছাড়েন!'

বসের কাছ থেকে টাকা নিয়ে টাটকা মাছ কিনলাম। আরও কিনলাম এক প্যাকেট টাটকা বেনসনও! ততক্ষণে ফেরী এপারে চলে এসেছে। দু'জনে নদী পেরিয়ে রিকশায় চাপলাম।

সারাদিন ধরে থেমে-থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। রিকশায় চাপা মাত্র আবার শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। পর্দা ছিল, তবুও প্রায় কাকভেজা হয়ে হাজির হলাম শহরের এক সেলাই শিক্ষাকেন্দ্রে। ওটার পরিচালিকা আমাদের কোম্পানির সেলাই মেশিনসহ অন্যান্য প্রোডাক্টও বিক্রি করতেন।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে-উঠতে বস বললেন, 'তোমার মতলব বুঝেছি। এত রাতে ম্যাডামকে কষ্ট দেয়াটা কি ঠিক হবে?'

'কী কন, আপনে এত রাতে খাইতে আইসেন দেখলে তাইনে খুশিতে স্বর্গে যাইব...'

বসের ঠোঁটের কোণে আত্মতৃপ্তির ক্ষীণ হাসি...মনে হয় তাঁর নিজের অজান্তেই ফুটে উঠল। কে জানে নিজেকে তিনি তখন রোমিও

টাইপ কিছু ভেবে বসেছিলেন কি না!

কড়া নাড়ার শব্দে প্রৌঢ়া মহিলা নিজেই দরজা খুলে দিলেন। প্রথমে থতমত, পরে অবাক আর সবশেষে ফ্যাকাসে দেখাল তাঁকে। হয়তো ভেবেছিলেন ব্লাগার করেছেন কোনও আর আমরা এসেছি ট্রাবল-শ্যুটিং-এ।

'স্যর, আপনারা? এই রাতে? আপনাদের না কাল সকালে ভিজিট...' ততক্ষণে তাঁর স্বামীও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন উদ্বিগ্ন মুখে।

তাড়াতাড়ি মহিলার হাতে পোঁটলা ধরিয়ে দিলাম!

হড়বড় করে বলতে লাগলাম, 'বসের খিদে পেয়েছে...হেব্বি খিদে...জলদি মাছগুলো চুলায় দেন...আপনাদের ডাকাতিয়া নদীর মাছ... এক্কেরে ফ্রেশ...তরকারি করবেন মাখা-মাখা, ঝাল-ঝাল...বসের (আসলে আমার!) আবার খুব প্রিয়...সাথে কিঞ্চিৎ ডাল-ভাত, আর কিস্যু না...জলদি যান...সময় কম, খিদে বেশি...'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মহিলা প্রায় উড়ে গেলেন কিচেনে।

...রাত প্রায় ১২টা। ওয়াকিং ডিস্ট্যান্স, তাই হেঁটেই দু'জনে যাচ্ছিলাম হোটেলে। বৃষ্টি থেমে গেছে আগেই। বস বলে উঠলেন, 'ভালই দেখালে, এখন একটা বিড়ি দাও...তখন কিনলে না এক প্যাকেট, চোট্টামি করে!'

ভদ্রলোক আমার রংপুরের ডিলার। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাঁর অফিসে কাজের ফাঁকে গল্প হচ্ছিল। তিনি নিজ মুখে শোনাচ্ছিলেন তাঁর বাবা-কাহিনি।

'আমার বাবার ৮০ বছর বয়সে আমার মা মারা যান। তার কয়েক মাস পর সিদ্ধান্ত নিলেন বাবা–তিনি ফের বিয়ে করবেন।

'স্বভাবতই পরিবারের সবাই আমরা প্রথমে হতভম্ব হই, পরে অনেক বোঝাই তাঁকে, কিন্তু বাবার এক ধনুক-ভাঙা পণ। বিয়ে তিনি করবেনই।

'উপায়ান্তর না দেখে আমরা আট ভাইবোন মিলে বললাম, "বিয়ে করবেন ভাল কথা, তার আগে আমাদের সম্পত্তি আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

'মজার ব্যাপার দ্বিতীয়বার আর বাবাকে বলতে হয়নি। উনি আমাদের সম্পত্তি বেটে দিলেন। নিজের জন্য সামান্য কয়েক শতাংশ জমি ছাড়া কিছুই রাখলেন না। অথচ মুসলিম আইন অনুযায়ী তিনি কয়েক বিঘা জমি নিজের জন্য অনায়াসেই রাখতে পারতেন।

'এভাবে আমাদের সবার মুখ লগ-অফ করে তিনি শুরু করলেন স্ত্রী-আউটসোর্সিং। প্রতিদিন সকালে মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে বাসা থেকে বের হয়ে পড়তেন তিনি। আর মোটর সাইকেল কারা চালাত, জানেন?

'না, তিনি ছেলে, ভাই, শালা...এদের কারোরই সাহায্য নেননি। একেকদিন তাঁর একেকজন নাতি তাঁকে মোটর সাইকেলে চড়িয়ে বের হত–নতুন দাদি খুঁজতে...অতি উৎসাহে।

'আশপাশের দশ গ্রাম তিনি ফালাফালা করে ফেললেন বউয়ের খোঁজে। আমার মেজ ভাইয়ের বড় ছেলে নিজেকে বড়ই অহঙ্কারী ভাবে। সেদিন ওকে নিয়েই বের হয়েছিলেন বাবা। আধা-বয়সী এক বিধবাকে মনে ধরল তাঁর। ওই নাতিও তাল দিল। আসলে বিষয়টা তাঁর নাতিরাও একটা চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিযোগিতা হিসাবে নিয়েছিল।

'তো হয়ে গেল বিয়ে। নাতিনাতনিদের কল্যাণে মহা ধুমধামের সাথেই হলো।

'সাত বছর পার হয়ে গেছে। বাবার বয়স এখন ৮৭। ছোটমাকে নিয়ে আজও মহাসুখে ঘর করছেন তিনি।'

শীত তখনও পুরোপুরি কাটেনি, গরমও বসেনি জাঁকিয়ে, চমৎকার আবহাওয়া...এক জুনিয়র কলিগকে নিয়ে অফিসের কাজে অফিস থেকে বেরুলাম। যাব পুরান ঢাকা।

গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছি, ক্লায়েন্ট হঠাৎ মোবাইল করে জানাল–আকস্মিক ব্যস্ততার কারণে তিনি এখন সময় দিতে পারবেন না। ঘণ্টা দুয়েক পরে দেখা করবেন।

সময় কাটাতে বুড়িগঙ্গার তীরে হাঁটছিলাম দু'জনে, কলিগ প্রস্তাব দিয়ে বসল, 'স্যর, চলেন নৌকায় চড়ি।' উত্তম প্রস্তাব। ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করে দু'জনে একটা নৌকায় চেপে বসলাম।

'কেমন লাগছে?' খানিকক্ষণ পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'দারুণ, স্যর।' সে উজ্জ্বল মুখে জবাব

দিল।

'আচ্ছা। কালো পানি, বোটকা গন্ধ...তোমরা যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসো তাদের তো আবার এই নদী পছন্দ হয় না...'

'কী যে বলেন, জীবনে নদীই তো দেখিনি...জয়পুরহাটে আমার গ্রামের বাড়ির আশপাশে নদীর কোনও বালাই-ই নেই। প্র্যাক্টিক্যালি আজই পয়লা দেখা। প্রথম চড়াও।'

'কেন, আসা-যাওয়ার পথে যমুনা দেখো না?'

'সে তো সেতু থেকে...আজকের দিনটাই আলাদা।'

অদূরে বাবুবাজার ঘাটের দিকে চোখ পড়ল। প্রকাণ্ড একটা স্টীমারকে নোঙর ফেলে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। আঙুল তুলে কলিগকে দেখালাম ওটা।

'বুঝলে, ব্রিটিশ আমলের জাহাজ। এর আরেক নাম রকেট। বিয়ের পরপরই বউকে নিয়ে ওটায় চড়ে একবার ঢাকা-খুলনা মেরে এসো। পাক্কা এক দিনের জার্নি...দারুণ জমবে তোমাদের হানিমুন-যাত্রা। গ্যারান্টি দিচ্ছি–তোমরা যাবে দু'জন, কিন্তু ফিরবে তিনজন।'

দু'কানে গিয়ে ঠেকল তার হাসি। জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'সেরকম কেউ আছে নাকি? ডার্লিং-ফার্লিং?'

মুখের হাসি বিন্দুমাত্র ম্লান হলো না, বলল, 'ছিল–এখন নেই।' আমার চোখে নিশ্চয়ই প্রশ্ন দেখেছিল সে, নিজ থেকেই বলে গেল অনেক কথা। বাল্যপ্রেমের সেই পুরনো প্যাঁচাল আর ক্যাচাল। সবশেষে করুণ পরিণতি। বাড়ন্ত কিশোরী মেয়েকে জলদি বিয়ে দিতে চায় পাষণ্ড 'হতে পারত শ্বশুর', কিন্তু 'দেবদাস'-এর যে তখনও পড়ালেখাই শেষ হয়নি...ইত্যাদি, ইত্যাদি। পুরোটাই বলল সে স্বাভাবিক মুখে, কোনও রকম ইমোশনের ছাপ দেখলাম না। নার্ভ বটে একখান!

সময় শেষ। ঘাটে ভিড়ল নৌকা। নামতে-নামতে বলল সে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর। আপনার জায়গায় অন্য কোনও সিনিয়র থাকলে হয়তো আজ...'

বাধা দিলাম।

'অফিসে ফিরে আবার এই নৌভ্রমণের কিচ্ছা মাইকিং কোরো না...চাকরি একেবারে দু'জনেরই নট্!'

আবারও গালভরা হাসি দিয়ে 'জী, স্যর, জী, স্যর' করে উঠল ছেলেটা। ওই উজ্জ্বল হাসি দেখে কে আন্দাজ করবে–কলজেতে কত বড় ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে সে?

.

বেইজিং এয়ারপোর্ট।

লাউঞ্জে অসংখ্য চীনা, সবাই এসেছে কাউকে না কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে। প্রায় একইরকম ফেস কাটিং। নির্দিষ্ট করে আলাদা করা যায় না কাউকে। আমরা খেয়াল রাখা শুরু করলাম শত-জোড়া হাতের দিকে। নির্দিষ্ট প্ল্যাকার্ডটা নজর কাড়তে বেশি সময় অবশ্য নিল না। আমাদের দু'জনের নাম আর দেশের নাম জ্বলজ্বল করছে। আমি আর আশরাফ এগোলাম সেদিকে।

শ-মিং আর লিন। এই দুই চীনা তরুণ-তরুণীর সাথে ই-মেইলে অসংখ্যবার যোগাযোগ হলেও চর্মচক্ষুতে এই প্রথম দেখা। আমরা ওদের দিকে এগোচ্ছি দেখে কান পর্যন্ত সহজ-সরল হাসিতে ভরে উঠল দু'জনেরই মুখ।

কুশলাদি সেরে এয়ারপোর্ট থেকে সবাই বেরুলাম দল বেঁধে। প্রচণ্ড, বর্ণনার অতীত শীত আছড়ে পড়ছে সারা গায়ে। এর আগেই দুই দিন দুই রাত করে কাটিয়ে এসেছি শ্যানডং আর সাংহাই-এ। সেই অভিজ্ঞতায় বুঝলাম এখানেও তাপমাত্রা শূন্যের ১০ ডিগ্রি নিচে ছাড়া উপরে হবে না। পার্থক্য পেলাম একটা অবশ্য। প্রথম দেখলাম চীনের আকাশে ঝলমলে রোদ!

শ্যানডং-এর আবহাওয়া মেঘলা। সাংহাই-এ তুষারপাত। সবশেষে বেইজিং-এ সূর্যদেব দর্শন। কমন একটাই। সর্বত্রই কনকনে, হাড়ে ফাটল ধরানো ঠাণ্ডা। গায়ে একশো একটা ভারী পোশাক চাপিয়েও লাভ হয় না।

রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে জানতে চাইলাম, আজকের প্রোগ্রাম কী? ওরা জানাল আজ ফ্রী-ডে। খালি বেড়াও আর খাও। ওরা কিছু জায়গা

সিলেক্ট করে রেখেছে। কিন্তু নামগুলোর মধ্যে কোথাও গ্রেট ওয়াল পেলাম না। অথচ প্লেনেই দু'জনে ঠিক করে রেখেছিলাম–আর কোথাও যাই-না-যাই, গ্রেট ওয়ালে যাবই যাব। সরাসরি, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলে বসলাম সে কথা।

ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যে ওদের ভাষায় আলাপ জুড়ে দিল। খানিক পরে ওদের সাথে যোগ দিল গাড়ির ড্রাইভারও। চলছেই আলাপ। থামার নাম নেই। আশরাফ বাংলায় বলল, 'ঘটনা কী, স্যর? এতক্ষণ ধরে কী এত কিচিরমিচির করে এরা?'

'রাস্তা চেনে না, যায়নি বোধহয় কোনওদিন।' পরে বুঝেছিলাম আমার মন্তব্যই সহি ছিল। মক্কার মানুষ হজ পায় না!

অনেক উত্তেজনায় অধীর আর উৎকণ্ঠিত সময় পার করে অবশেষে গ্রেট ওয়ালে পৌঁছলাম। প্রথমে চাপতে হলো কেবল কারে। বেঞ্চপাতা ছোট্ট কাঁচ ঢাকা ঘরে বসে দুলতে-দুলতে এগোচ্ছি। নিচে বিস্তীর্ণ পাহাড়সারি। কোথাও সবুজ গাছগাছালিতে ভরা; কোথাও মাটিময়, ন্যাড়া। একসময় গুমটি ঘরের মত একটা ঘরের দরজার সামনে থামল দুলুনিযান। পরে জেনেছিলাম প্রাচীন আমলে প্রাচীরের পাহারারত রক্ষীরা বিশ্রাম নিত এই ঘরে। এ রকম অসংখ্য গার্ডরুম আছে গ্রেট ওয়ালে।

দুটো প্রকোষ্ঠ। পরেরটার সাথে লাগোয়া আরেকটা দরজা। ওটার মুখে এসে দাঁড়াতেই দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা সবেগে বাড়ি মারল। একে তো মাইনাস টেন ঠাণ্ডা, তার উপরে এই বজ্র হাওয়ার আচমকা আক্রমণ–মুহূর্তের জন্য দিশা হারালাম। তাল সামলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে পা রাখলাম গ্রেট ওয়ালের বুকে।

কীসের ঠাণ্ডা, কীসের ঝড়ো হাওয়া, সব মন থেকে ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে বিদায় নিল তৎক্ষণাৎ। কিছুই গায়ে লাগছে না আর। এই যে আমি, এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গ্রেট ওয়ালের ওপর...বাড়ির কাছের কথা? জীবনে কখনও ভেবেছিলাম? স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়? অথচ কত অবিশ্বাস্যভাবেই না গ্রেট ওয়াল ধরা দিল আজ আমার পদতলে! আর্মস্ট্রং ফেইল! নিজেরই আর্ম কত স্ট্রং আজ!

অদূরে আরেকটা গার্ডরুমে হেঁটে গেলাম সবাই। ভেতরে অপেক্ষা করছিল অন্যরকম বিস্ময়। প্রকাণ্ড একটা বোর্ড। বিশাল-বিশাল কাগজে সাঁটা। কত দেশের কত ভাষার ট্যুরিস্ট তাদের মনের কথায় ভরে ফেলেছে ওটা। এক কাগজে এত ভাষার সমাহার...ভাবাই যায় না। একেবারেই হিজিবিজি আর হিজিবিজি। অনেক কষ্টে একটু ফাঁকা জায়গা পেলাম। কলম ধরতে গিয়ে দেখি, আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অবশ-পাথর হয়ে গেছে। নো ফিলিংস। বহুকষ্টে কলম ধরে, কাঁপা-কাঁপা হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখতে পারলাম–'ভালবাসি তোমায়, বাংলাদেশ।'

ছয় বছর পার হয়ে গেছে। মন প্রায়ই জানতে চায়–লেখাটা কি এখনও আছে ওখানে? আবার মনই বলে–আছে। ভাষাটা যে বাংলা। কখনও মোছে না। মোছা যায়ও না। ১৯৪৮-এ কার্জন হলে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে জনৈক পাকিস্তানী আযম মুছতে চেয়েছিল। পেরেছিল?

হঠাৎ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেলেন গাইড। সাথে-সাথে আমরাও।

খুব ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি আমাদের দিকে। ঠোঁটে আঙুল চেপে সবাইকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিলেন।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সত্যি-সত্যিই কি খোদ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হলাম? জান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব তো?

পটভূমি: সুন্দরবন। সেল্স বিভাগের সবাই এসেছি সুন্দররনে। গাইডের পিছু নিয়ে ঘুরছিলাম দুর্ভেদ্য বনের ভেতরে। পই-পই করে বলা হয়েছিল আমাদের–গাইডের কথাই আইন। এর কোনও অন্যথা যেন না হয়।

ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠল তাঁর। না, ফিসফিসে গলায় না, আস্তে করেই কথা বললেন তিনি। কিন্তু আমাদের প্রায় তিরিশ জনের কানে বোধ হয় পরিষ্কার একই লয়ে শোনা গেল–'আর এগোবেন না কেউ।'

ভদ্রলোক কি ভেন্ট্রিলোকুইস্ট? জানি না। জিজ্ঞেস করা হয়নি। পরে আর কোনওদিন দেখাও হয়নি তাঁর সাথে। যা হোক, যা বলছিলাম।

আমাদের চোখে ভীতি দেখেই কিনা উনি মুচকি হাসলেন। একই ভঙ্গিতে বললেন, 'সামনে হরিণ।'

ও, হরিণ! তো এতে ঘাবড়ানোরই বা কী আছে? শরীরে রিল্যাক্সড্ ভাব এসে যাচ্ছিল মুহূর্তে, চাপা সুরে প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি, 'নড়বেন না কেউ, কথাও বলবেন না...'

থতমত খেয়ে আবার জমে গেলাম সবাই। কে যেন একজন আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'হরিণকে এত ভয় পাবার কী আছে?'

আগের মত ঠোঁট নেড়ে সংক্ষেপে জানালেন—বাচ্চা দিয়েছে একটা মা-হরিণ। ওর ধারে-কাছে যাওয়া যাবে না। একদিকে তর্জনী তুললেন তিনি। তাঁর নির্দেশিত পথ বরাবর সবার চোখ গেল। দুর্ভেদ্য ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে কিছুই পরিষ্কার দেখা গেল না। তবে মনে হলো প্রায় বিশ গজ দূরে কিছু যেন নড়াচড়া করছে।

আস্তে করে, প্রায় মিনতির সুরে বললাম, 'আরেকটু কাছে যাওয়া যায় না?' দয়া হলো ভদ্রলোকের। তাঁর পিছু নিয়ে আরও কয়েক গজ এগোনোর পর নীরবে আবার থামতে বললেন তিনি। ঠোঁট নাড়িয়ে সাবধান করে দিলেন—কোনওভাবেই যেন মা-হরিণটা টের না পায় আমাদের উপস্থিতি।

এবার মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পেলাম। চোখ জুড়ানো অপার্থিব এক দৃশ্য। একটা ঝোপের পাশে মা-টা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে টলমল পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ছানাটা। পড়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে দাঁড়ানোর, আবার পড়ে যাচ্ছে...ওর গা চেটে দিচ্ছে মা।

বলতেই হবে আমরা ভাগ্যবান, নইলে গভীর সুন্দরবনের ভেতরে এরকম একটা দৃশ্য দেখার কপাল হয়? সদ্যপ্রসূতি মা-হরিণ আর তার ছানা। যতক্ষণ গাইড সুযোগ দিলেন প্রাণভরে দেখেই যাচ্ছিলাম।

পরে জাহাজে ফিরে গাইড একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। জন্মের পর বাচ্চার গায়ের গন্ধের সাথে পরিচিতি হয় মায়ের। এই গন্ধই তাকে সাহায্য করে বাচ্চাটাকে চিনে রাখতে। বেশি এগোলে মা-টা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত, আর আমাদের শরীরের সম্মিলিত গন্ধ অনুপ্রবেশ করত বাচ্চাটার গায়ে। পরে মা ফিরে এলেও বাচ্চার গা থেকে আগের গন্ধটা পেত না। বিভ্রান্ত হত। চলে যেত বাচ্চাটাকে ছেড়ে। শুরুতেই শেষ হয়ে যেত বাচ্চাটার জীবন।

জঙ্গলের নিয়ম-কানুন যেমন অদ্ভুত, তেমনি কঠিন। একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

হলেই—অমোঘ সর্বনাশ!

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সেবারকার সুন্দরবন ভ্রমণকালে। যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমনি হাসিও পায় মনে পড়লে। আসলে কেউ যদি নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই টেনে এনে আমাদের মজা বিলায়, কী করার থাকে তখন বলুন?

খুলেই বলি তা হলে।

সেদিন সেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বনে-বাদাড়ে দাবড়ে বেড়িয়ে ইয়টে ফিরেছি। লাঞ্চ সেরে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম কেবিনের নরম বিছানায়। চোখ প্রায় লেগে এসেছিল, বিকট এক চিৎকারে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম শোয়া ছেড়ে।

অপার্থিব গা-শিউরানো সেই চিৎকারে গায়ের সব লোম এক লহমায় খাড়া হয়ে গেল। থামছে না, বরং ধাপে-ধাপে বেড়েই উঠছে উঁচু লয়ে। কান ফেটে যায় এমন অবস্থা। একছুটে কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। দেখি কেবল আমি না, কান-ফাটানো চিৎকার শুনে একে-একে খুলে যাচ্ছে আশপাশের সবগুলো কেবিনের দরজা। বেরিয়ে আসছে ভেতরের সবাই উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে।

সবগুলো চোখ গিয়ে পড়ল একটা নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে। ছুটে সবাই ভিড় করলাম ওটার সামনে। ভাগ্য ভাল দরজাটা ভেজানো ছিল। কয়েকজন ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমাদের কোম্পানির নারায়ণগঞ্জের তরুণ এজেন্ট ওটায় ছিল। ওর অবস্থা দেখে ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। সবার চোখগুলো কপালেও উঠে গেল একই সাথে।

শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, উবু হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে। ছটফটাচ্ছে, কাতরাচ্ছে; মোচড়াচ্ছে তার সারা শরীর। গ্যাঁ-গ্যাঁ করে চেঁচাতে-চেঁচাতে বোধহয় গলা ভেঙে গেছে, এখন মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে।

এবং লজ্জাজনক দৃশ্যটাও চোখে ধরা খেল। ছেলেটার দুটো হাতই মুঠো হয়ে শক্ত করে খামচে ধরেছে তার উরুসন্ধি।

যা হোক, তাকে সুস্থ করে তোলার পরে জানা গেল ভেতরের কাহিনি।

জঙ্গলে দল বেঁধে সবাই যখন ঘুরছিলাম, হঠাৎ করেই ছোট বাথরুম চেপে ধরে তাকে। ক্রমশ বেগ বাড়তে থাকায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। শ্লথ হয়ে পড়ে হাঁটার গতি এবং এক সময় দলের একেবারে পেছনে পড়ে যায়।

পুরোপুরি একা হতেই কালবিলম্ব না করে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্যান্টের চেইন টেনে নামিয়ে ফেলে।

আমরা কিন্তু এগিয়েই যাচ্ছি। ওর দিকে খেয়াল নেই কারও। বাড়ছে ব্যবধান। অবশেষে আড়াল হয়ে গেলাম দু'পক্ষই।

নিজেকে খালি করল সে। কিন্তু কাজ তো আরও বাকি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ আর সেজন্য দরকার পানি। কিন্তু এই বিভুঁই জঙ্গলে পানি আসবে কোত্থেকে? এ তো আর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের বর্ণিত জঙ্গল না যে মোড়ে-মোড়ে ঝরনা, জলপ্রপাত, ফোয়ারা মিলবে। নিদেন পক্ষে একটা সরু নালা। সাথে করে পানির বোতল আনেনি সে, আরও অনেকের মত বুদ্ধি করে টয়লেট পেপার ছিঁড়ে পকেটে ভরে রাখতেও ভুলে গেছিল। একবার ভাবল–চিৎকার করে পানি চেয়ে ডাকবে আমাদের। পরক্ষণেই বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। একাকী নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চিৎকার আমাদের কানে পৌঁছানোর আগেই যদি কোনও রয়েল বেঙ্গলের কানে ঢোকে, যদি আমাদের আগেই ছুটে আসেন তিনি, যেটা ঘটাই বরং অতি স্বাভাবিক, এবং এভাবে তাকে পোশাক পরিহিত অবস্থায়ও নগ্ন দেখে মাইও খান, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান গভীর জঙ্গলে...

অগত্যা অজানা ঝোপ থেকেই একটা পাতা ছিঁড়ল সে। ঢিলা বানাবে। কুলুখ করবে।

ছোট্ট, নরম, নিরীহ দর্শন পাতা। নিমেষেই দিব্যি শুষে নিল নির্যাসটুকু। কে জানে বিনিময়ে নিজের 'কিছু একটা' পাঠিয়ে দিয়েছিল কি না এজেন্টের বৃক্কে? তবে সাথে-সাথেই অ্যাকশনে যায়নি। গেছে ধীরে-সুস্থে।

যা হোক, অতঃপর খিঁচে একদৌড়ে আমাদের সাথে যোগ দিল সে।

ফেরার সময় এজেন্টের মনে হলো–কোথাও যেন কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। ক্ষীণ এক অস্বস্তি...ক্রমেই বাড়ছে...শেষমেশ যখন নিজের কেবিনে ঢুকল...

ততক্ষণে জায়গামত তার হাবিয়ার আগুন জ্বলে উঠেছে!

প্রথমেই বলে রাখি, দুই ভাবিরই নাম বদলে দিয়েছি, অক্ষর-সংখ্যা আর ছন্দ মিল রেখে।

বসের সাথে ট্যুরে বেরিয়েছিলাম। দূরের যাত্রা। বস ড্রাইভ করছিলেন, পাশে বসা আমি। পথে ছোট একটা শহরে এসে হঠাৎ ব্রেক কষলেন তিনি। গাড়ি পার্ক করলেন রাস্তার ওপর একটা ফার্মাসির পাশে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওষুধ কিনবেন নাকি, বস?'

ফার্মাসিটা দেখিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবির সাথে একটু জরুরি আলাপ করব। এদের ফোন আছে, এদিকে এলেই লং ডিস্ট্যান্স কল করি এখান থেকে।'

বুঝছেনই তো, সেসময় মোবাইল ফোনের চল ছিল না।

মিনিট দেড়েকের মধ্যেই বস ফিরে এলেন। মুখ চুন। ড্রাইভিং সিটে বসতে-বসতে বললেন, 'তোমার ভাবি ঠাশ করে ফোনটা রেখে দিল, কথা বলল না।'

'কেন, বস?'

বোকা-বোকা মুখ করে জবাব দিলেন তিনি, 'গ্যাঞ্জাম বাধায় বসেছি!'

'কী গ্যাঞ্জাম?' কৌতূহলের চোটে আমার তখন মরণ দশা।

মিনমিন করে বললেন, 'ইয়ে..."হ্যালো, জলি" বলতে গিয়ে মুখ ফস্কে "হ্যালো, সিমি" বলে ফেলেছি...ব্যস। বউ দিল লাইন কেটে।'

উদ্‌গত হাসি সামলাতে অনেক জোর খাটাতে হলো নিজের ওপর...

সিমি–বসের পয়লা বউ। দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এরপর ভেরি রিসেন্টলি বস বিয়ে করেছেন জলিকে।

ক-ত্ত-দি-নে-র পুরনো মধু-ডাক...পাল্টাতে সময় তো লাগবেই। ■

রোমাঞ্চ উপন্যাসিকা

ইকারাস

মূল ▮ এডমণ্ড হ্যামিলটন
রূপান্তর ▮ ডিউক জন

প্রসূতি ওয়ার্ডের করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডক্টর হ্যারিম্যান। 'সাতাশ নাম্বারের মহিলার খবর কী?'

করুণা দেখা দিল স্বাস্থ্যবতী শরীরে কেতাদুরস্তভাবে পোশাক চাপানো হেড নার্সের চোখে। 'মারা গেছে বেচারী! বাচ্চাটা জন্ম নেয়ার এক ঘণ্টা পর। জানেনই তো, ডাক্তার, হার্টটা দুর্বল ছিল মহিলার।'

মাথা ঝাঁকালেন চিকিৎসক। তাঁর মাংসহীন, পরিষ্কার কামানো মুখটায় চিন্তার ছাপ। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে এখন। মহিলা আর তার স্বামী বছর খানেক আগে সাবওয়েতে এক বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণে আহত হয়েছিল। সম্প্রতি মারা গেছে লোকটা। তা, কী অবস্থা বাচ্চাটার?'

ইতস্তত করছে নার্স। 'সুস্থ, সুন্দর একটা ছেলে। শুধু...'

'শুধু?'

নিচের পাঁজরগুলোর দিকে।

যমজ কুঁজ দুটো এতটাই লম্বা আর এত সুন্দরভাবে সরু হতে-হতে নিচের দিকে মিশে গেছে যে, মনেই হয় না, অঙ্গবৈকল্য এটা। দক্ষ হাতে ও-দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন ডক্টর হ্যারিম্যান। হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ডাক্তারকে।

'সাধারণ কোনও বিকৃতি মনে হচ্ছে না এটা,' বিমূঢ় গলায় বললেন তিনি। 'এক্স-রে করে দেখা দরকার। ডক্টর মরিসকে গিয়ে বলো তো যন্ত্রপাতি রেডি করতে।'

পরে, লাল-চুল, গাঁট্টাগোট্টা তরুণ ডাক্তার মরিসের চেহারাতেও সহানুভূতির ছাপ পড়ল বাচ্চাটাকে দেখে। এক্স-রে মেশিনের সামনে শায়িত শিশুটি কেঁদেই চলেছে চেহারা লাল করে।

'আহ, পিঠটা!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'কী দুর্ভাগ্য! ...শুরু করব, ডাক্তার?'

মাথা দোলালেন হ্যারিম্যান। 'করুন।'

'আমাদের মিলনের পথে মস্ত বড় বাধা এই পাখা। এমন কাউকে আমি স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পারব না, যাকে সভ্য মানুষের চাইতে বুনো একটা জানোয়ারই মনে হয় বেশি।'

'...পিঠে কুঁজ আছে বাচ্চাটার, ডাক্তার সাহেব!'

করুণায় আর্দ্র হলো হ্যারিম্যানের অন্তর। 'ছোট্ট বাবুটা! বেচারীর ভাগ্যটা কেমন, দেখো! এতিম হয়ে জন্মেছে, তা-ও আবার বিকলাঙ্গ।' চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। 'ওকে একবার দেখতে চাই আমি। হয়তো কিছু একটা করতে পারব আমরা বাচ্চাটার জন্যে।'

কিন্তু তিনি আর মহিলাটি যখন ঘের দেয়া কটটার উপরে ঝুঁকে পড়লেন, হতাশায় মাথা নাড়লেন ডাক্তার। বিছানায় শুয়ে–সম্ভবত খিদেয়–তারস্বরে চিৎকার করছে ছোট্ট ডেভিড র‍্যাণ্ড। চেহারাটা লালচে।

'নাহ,' বললেন হ্যারিম্যান। 'ওর পিঠটা নিয়ে কিছুই করার নেই আমাদের। খারাপই বলতে হবে বাচ্চাটার কপাল।'

ওই পিঠটা ছাড়া আর সব কিছুই ঠিকঠাক ডেভিডের। আর দশটা বাচ্চার মতই স্বাভাবিক শিশুটি। একটা নয়, দুটো কুঁজমত বেরিয়ে আছে শোলডার-ব্লেডের পিছন থেকে–দুটো কুঁজ দু'পাশে। ঠেলে বেরিয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেছে

মুড়মুড় আওয়াজ করতে থাকা সৃষ্টিছাড়া দেহটির ভিতরে প্রবেশ করল রঞ্জন রশ্মি। ফ্লুওরোস্কোপে চোখ রাখলেন হ্যারিম্যান। শক্ত হয়ে গেল তাঁর শরীরটা। দীর্ঘ, নীরব একটা মিনিটের পর ঝোঁকা অবস্থা থেকে সোজা হলেন ডাক্তার। মরা মানুষের মত সাদা হয়ে গেছে তাঁর মুখখানা। উৎকণ্ঠিত নার্স বিস্মিত হয়ে ভাবল, কী এমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব, যে কারণে এ অবস্থা ওঁর?

'মরিস!' সামান্য ভারী হয়ে গেছে হ্যারিম্যানের স্বর। 'একটা বার এসে দেখো তো! হয় ভুল দেখছি আমি, নয় তো নজিরবিহীন কোনও ঘটনা আমাদের সামনে!'

বিভ্রান্ত মরিস ভুরু কুঁচকে তাকালেন সুপিরিয়রের দিকে। তারপর চোখ রাখলেন যন্ত্রে। ঝটকা দিয়ে কেঁপে উঠল তাঁর মাথাটা।

'মাই গড!' বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠেছে লালচুলো ডাক্তারের।

'তুমিও দেখছ?' নিশ্চিত হলেন ডক্টর হ্যারিম্যান। 'এবার বুঝলাম, পাগল হয়ে যাইনি আমি। কিন্তু এটা...এই ঘটনা তো সমগ্র মানব

জাতির ইতিহাসে নজিরবিহীন!'

খানিকটা অসংলগ্ন মনে হচ্ছে ডাক্তারকে। হড়বড় করে বললেন, '...আর এই হাড়গুলো...পলকা...ভিতরের গোটা কাঠামোটাই অন্য রকম ওর...ওজন...'

চটজলদি শিশুটিকে ওজন মাপার যন্ত্রে শুইয়ে দিলেন হ্যারিম্যান। নড়ে উঠল পরিমাপ-সূচক কাঁটাটা।

'দেখেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'বয়স অনুযায়ী ওর যা ওজন হওয়া উচিত, দেখাচ্ছে তার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র!'

ঘোর লাগা চোখে কুঁজ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছেন তরুণ ডাক্তার। কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'কিন্তু এটা তো স্রেফ অসম্ভব–'

'কিন্তু সত্যি!' ফস করে বলে উঠলেন হ্যারিম্যান। উত্তেজনায় চকচক করছে তাঁর চোখ জোড়া। 'জিনের নকশায় যদি কোনও পরিবর্তন হয়–একমাত্র তা হলেই ঘটতে পারে এমন। জন্মের আগেই যদি–'

এক হাত দিয়ে আরেক হাতের তালুতে ঘুসি মারলেন ডাক্তার। 'পেয়েছি! ছেলেটার জন্মের বছর খানেক আগেই তো এক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল ওর মা। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কারণ–তীব্র তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহিলার জিন, বদলে গেছে। মুলারের এক্সপেরিমেন্টটার কথা মনে আছে?'

'কিন্তু এসব কী, ডাক্তার সাহেব?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল হেড নার্স। 'পিঠে কী হয়েছে বাচ্চাটার? ওর কি অবস্থা খুব খারাপ?'

'খারাপ?' শব্দটা আওড়ালেন ডক্টর হ্যারিম্যান। লম্বা দম নিলেন তিনি। তারপর নার্সের উদ্দেশে বললেন, 'এই ছেলে, ডেভিড র‍্যাণ্ড, এক অভূতপূর্ব ঘটনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে। যদ্দূর জানি আমরা–ওর মত আর কেউ ছিল না কখনও; বাচ্চাটার জীবনে যা ঘটতে চলেছে, আর কোনও মানুষের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটেনি। সব কিছুর মূলে ওই বিস্ফোরণ।'

'কিন্তু কী ঘটতে যাচ্ছে ওর জীবনে, ডাক্তার?' আতঙ্কিত গলায় জানতে চাইল নার্স।

'কী হবে?' গলা চড়িয়ে বললেন হ্যারিম্যান। 'পাখা গজাবে এই ছেলের! পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে যে কুঁজ দুটো, নিছক কোনও সাধারণ অস্বাভাবিকতা নয় ওগুলো–ও হচ্ছে ডানার পূর্বাবস্থা। শিগ্‌গিরই দৃশ্যমান হবে ও-দুটো, বাড়তে থাকবে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে।'

চোখ বড়-বড় করে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে হেড নার্স। 'মজা করছেন আপনি,' বলল অবশেষে। নিখাদ অবিশ্বাস মহিলার বক্তব্যে।

'হা, ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিম্যান। 'তা-ই ধারণা তোমার? এরকম একটা বিষয় নিয়ে কৌতুক করব আমি? তা হলে শুনে রাখো, তোমার মতই হতভম্ব হয়ে গেছি আমি, এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারার পরেও। এখন পর্যন্ত জন্ম নেয়া যে-কোনও মানুষের চাইতে একদমই আলাদা এই ছেলে। পাখির হাড়ের মতই পলকা ওর হাড়গুলো। স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ ওজন। রক্তও বোধ হয় অন্য রকম। শোলডার-ব্লেড থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখার হাড়, ওড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পেশির আভাস রয়েছে হাড়ের সঙ্গে। প্রাথমিক কিছু পালক আর অবিকশিত হাড়ের চিহ্নও ধরা পড়েছে এক্স-রেতে।'

'পাখা!' আচ্ছন্নের গলায় আওড়ালেন তরুণ ডাক্তার। এক মুহূর্ত পর বললেন, 'ও কি...ও কি–'

'হ্যাঁ, উড়তে পারবে!' ঘোষণা করে দিলেন হ্যারিম্যান। 'পুরোপুরি নিশ্চিত আমি। দেখতে পাচ্ছি, পাখাগুলো অনেক বড় হবে আকারে। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ডেভিডের শরীরটা এত হালকা হবে যে, অনায়াসেই ডানায় ভর দিয়ে বাতাসে ভাসতে পারবে ছেলেটা।'

'খোদা!' অসংলগ্ন গলায় ঈশ্বরের নাম জপলেন ডক্টর মরিস। পাগল-পাগল লাগছে তাঁকে। সামান্য ঝুঁকে তাকালেন শিশুটির দিকে। কান্নাকাটি থামিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটা। ছোট-ছোট হাত-পা ছুঁড়ছে দুর্বলভাবে।

'এ স্রেফ অসম্ভব!' বলে উঠল নার্স। কিছুতেই অনুমোদন করতে পারছে না বিষয়টা। 'কীভাবে একজন মানুষের পাখা গজাতে পারে?'

'পিতা-মাতার জিনে আমূল পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে এমনটা,' বললেন হ্যারিম্যান। 'এই জিন, জানো তুমি, অতি ক্ষুদ্র কোষ। যে-কোনও প্রাণেরই জন্মের পর কীভাবে বিকশিত

হবে সেটা, এর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে জিন। মায়ের জিনের গঠন বদলে দাও; দেখবে, মাতৃগর্ভে থাকা শিশুরও নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। এজন্য কেউ হয় লম্বা, কেউ খাট, কেউ ফরসা, কেউ-বা কালো। মানুষে-মানুষে এত পার্থক্য হয় কেন? জিনের গঠনে এই ভিন্নতার কারণে। কিন্তু এসব মামুলি পার্থক্য। জিনের সামান্য বদলেই হয়ে যায়। কিন্তু এর বেলায় সামান্য না, পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক। ওই বিস্ফোরণটা...বৈদ্যুতিক শক্তির আকস্মিক ঢেউটা মোটা দাগে ওলটপালট করে দিয়েছে জিনের ভিতরে। টেক্সাস ইউনিভার্সিটির মুলার বলেছেন, তেজস্ক্রিয়ার কারণে আমূল বদলে যেতে পারে জিন। এর ফলে তেজস্ক্রিয়ার শিকার নারী-পুরুষের সন্তানও শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে বাপ-মায়ের থেকে। দুর্ঘটনাটা ডেভিড র‍্যাঙের বাবা-মা-র মধ্যে নতুন ধরনের জিন-প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছিল, ফলাফল: পাখাঅলা মানুষের জন্ম। এ ধরনের মানুষদের বায়োলজিস্টরা বলে–মিউট্যান্ট।'

তরুণ মরিস আচমকা বলে উঠলেন, 'রক্ষে করো, ঈশ্বর! খবরের কাগজগুলোর কী প্রতিক্রিয়া হবে, যখন তারা খবরটা জানতে পারবে?'

'যাতে না পায়, সে চেষ্টাই করতে হবে,' সিদ্ধান্তের সুর ডক্টর হ্যারিম্যানের কণ্ঠে। 'জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট এক ঘটনা এই শিশুর জন্ম। এটা যাতে সস্তা বিনোদনের খোরাক না হয়, সেদিকটা দেখতে হবে আমাদের। মুখ একদম বন্ধ রাখতে হবে এ ব্যাপারে।'

তিনটা মাস গোপন রাখলেন তাঁরা বিষয়টা। হাসপাতালে আলাদা একটা কামরার ব্যবস্থা করা হলো ছোট্ট ডেভিডের জন্য। একা হেড নার্সের উপরে রইল বাচ্চাটার দেখাশোনার ভার। আর ওই দুই চিকিৎসকই কেবল দেখতে যেতেন শিশুটিকে। সবাই জানত, বিশেষ ওই কামরায় গোপন কোনও গবেষণা করছেন হ্যারিম্যান ও তাঁর সহকারী।

এই তিন মাসের মধ্যে সত্যে পরিণত হতে চলল ডক্টর হ্যারিম্যানের ভবিষ্যদ্বাণী। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বেড়ে চলল ডেভিডের পিঠের ওই কুঁজ দুটো। এক পর্যায়ে নরম ত্বক ফুঁড়ে বেরিয়ে এল হাড্ডিসার এক জোড়া জিনিস, যেগুলোকে ডানা ছাড়া আর কিছুই ভাবার উপায় নেই।

ডানা গজাবার সময় থেকেই চিৎকার-চেঁচামেচি মাত্রা ছাড়াল ছোট্ট ডেভিডের। নতুন দাঁত গজাবার ব্যথার মত অনুভূতি রক্তাক্ত করছে যেন ওকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে, তফাত কেবল যন্ত্রণাটা দাঁত ওঠার চাইতে বহু গুণ বেশি। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন দুই ডাক্তার। হালকা কিছু পালক সহ বেরিয়েছে ছোট্ট ডানা দুটো। এমনকী এখনও ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না চোখের সামনে দেখেও।

ডাক্তাররা দেখতে পেলেন, হাত-পায়ের মতই স্বচ্ছন্দে ডানা দুটো ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে বাচ্চাটি, ডানার গোড়ার শক্তিশালী পেশির সাহায্যে। এটাও খেয়াল করলেন যে, যতই ওজন বাড়ছে ডেভিডের, সেই ওজন কিন্তু বয়স অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, তার তিন ভাগের এক ভাগই থাকছে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়। ডেভিডের হার্টবিট। অসম্ভব দ্রুত ওর হৃৎস্পন্দন। আর, যে-কোনও স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক উষ্ণ শিশুটির রক্ত।

অবশেষে ঘটেই গেল অঘটনটা। অদ্ভুত শিশুটির কথা কাউকে বলতে না পেরে হাঁসফাঁস করছিল হেড নার্স, আর পারল না তথ্যটা পেটে রাখতে। কাউকে না বলার শপথ করিয়ে নিজের এক আত্মীয়কে জানিয়ে দিল সে অবিশ্বাস্য খবরটা। তারপর যা হয়। সেই আত্মীয় বলল আরেক আত্মীয়কে, অবশ্যই কথাটা গোপন রাখবার শর্তে। দু'দিন বাদে সংবাদটা চলে এল *নিউ ইয়র্ক* নামের খবরের কাগজে।

পাহারা বসানো হলো হাসপাতালের গেটে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ছুটে আসা রিপোর্টারদের ফিরিয়ে দেয়া হলো এক-এক করে। ফলটা হলো আরও খারাপ। মনগড়া খবর ছাপা হতে লাগল পত্রিকাগুলোতে। যেমন, এক কাগজ লিখেছে: গালে জিভঅলা অদ্ভুত এক শিশুর জন্ম হয়েছে অমুক হাসপাতালে। পড়ে হাসতে লাগল লোকজন। কাগজঅলাদের আর দোষ কী! পাখাঅলা শিশু! পত্রিকার কাটতি বাড়াতে এ ধরনের খবর ছাপতে হয় বটে মাঝে-মধ্যে। কিন্তু এ তো রীতিমত গল্পের গরু আকাশে ওড়ার মত

ব্যাপার।

কিন্তু কিছু দিন পরই সুর বদলে গেল পত্রিকাঅলাদের। হাসপাতালের অন্য কর্মচারীরা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল পত্রিকার খবর পড়ে। ডেভিডের কামরায় উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল তারা। দেখতে পেল হাত-পা-পাখা নেড়ে কলকল করতে থাকা শিশুটিকে। তারাই ছড়িয়ে দিল বাইরে, পাখাঅলা বাচ্চার গুজবটা সত্যি। এদের একজন আবার শখের ফটোগ্রাফার, চট করে একটা ছবিও নিয়ে নিল ডেভিড র‍্যাণ্ডের। শুধু খবরটা কতজনে বিশ্বাস করত—সন্দেহ, কিন্তু ছবি সহ ছাপা হওয়ায় আর কোনও উপায়ই রইল না হেসে উড়িয়ে দেয়ার। সত্যিই পাখা রয়েছে শিশুটির। পিঠ ফুঁড়ে বেড়ে উঠছে ওগুলো।

দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হলো হাসপাতালটিকে, আরও কড়াকড়ি আনা হলো পাহারায়। কিন্তু এতে করে ফটকের বাইরে প্রতিবেদক এবং ফটোগ্রাফারদের ভিড় বাড়লই কেবল। বিশেষ প্রহরীদের বাধার মুখে হল্লা করতে লাগল তারা। প্রধান সংবাদপত্র সংস্থা পক্ষীমানব সংক্রান্ত এক্সক্লুসিভ খবর আর ছবি বিক্রির প্রস্তাব দিল ডক্টর হ্যারিম্যানকে। এদিকে এত লুকোছাপার কারণে কাহিনির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগতে শুরু করল লোকেদের মনে।

শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হলো হ্যারিম্যানকে। জনা বারো প্রতিবেদক, ফটোগ্রাফার এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকদের একটা কমিটিকে বাচ্চাটিকে দেখবার অনুমতি দিলেন তিনি।

বিছানায় শুয়ে বড়-বড় নীল চোখে পলকহীন তাকিয়ে রইল ডেভিড র‍্যাণ্ড, যখন উৎসুক দলটা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শিশুটিকে। নিজের পায়ের আঙুল নিয়ে খেলছে বাচ্চাটি।

'অবিশ্বাস্য!' মন্তব্য করলেন চিকিৎসকরা। 'কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্যিই দেখছি পাখা আছে বাচ্চাটার!'

হড়বড় করে প্রশ্ন করতে শুরু করল রিপোর্টাররা। 'পাখাগুলো যখন বড় হবে, তখন কি সে উড়তে পারবে আকাশে?'

অল্প কথায় জবাব সারলেন হ্যারিম্যান। 'আমরা এখনও জানি না, ঠিক কীভাবে বেড়ে উঠবে সে। তবে সব কিছু ভালয়-ভালয় এগোলে, কোনওই সন্দেহ নেই, উড়তে পারবে ছেলেটা।'

'গুড লর্ড!' গুঙিয়ে উঠল এক খবর-শিকারি। 'এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে আমাকে!'

বলে সারতে পারল না, বিশৃঙ্খল একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সবার মধ্যে। সকলেই চাইছে, সবার আগে ফোনে খবরটার সত্যতা নিশ্চিত করতে।

অল্প কয়েকটা ছবি তুলবার অনুমতি দিলেন ডাক্তার। কাজটা শেষ হলে, এক রকম তাড়িয়েই বের করে দিলেন দর্শনার্থীদের।

এরপর কাগজগুলোর প্রধান শিরোনাম হয়ে উঠল ডেভিড র‍্যাণ্ড। রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠল শিশুটি। অতি বড় সংশয়বাদীকেও নতি স্বীকার করাল পক্ষীমানবের ছবিগুলো।

বড়-বড় জীববিজ্ঞানীরা ডেভিডকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লম্বা-লম্বা বুলি কপচালেন জিন-তত্ত্বের উপরে। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করার চেষ্টা করলেন, সুদূর অতীতে এ ধরনের উদ্ভট ডানাঅলা মানুষের জন্ম হয়েছে কি না। না, সেরকম কোনও ইতিহাস নেই। পুরাণের নিষ্ঠুর পক্ষীমানবী, ভ্যাম্পায়ার আর ইকারাসের কিংবদন্তি জ্যান্ত হয়ে উঠল মানুষের মনে। ভিন্ন মতাবলম্বী মাথামোটা কিছু লোক কেয়ামত দেখে ফেলল এর মধ্যে। ডেভিড র‍্যাণ্ডের জন্মকে অভিশাপ হিসাবে দেখতে লাগল তারা।

সার্কাস থেকে মোটা অঙ্কের প্রস্তাব এল নিরাপদ কাচের ঘেরের মধ্যে শিশুটিকে রেখে প্রদর্শনের। খবরের কাগজ আর সংবাদ সংস্থাগুলো যেন নিলাম ডাকতে শুরু করে দিল হ্যারিম্যানের তরফ থেকে এক্সক্লুসিভ আরও খবরের আশায়। টাকার অঙ্কে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সেই প্রতিযোগিতায় মত্ত। হাজারো খামার থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ এল—তারা ছোট্ট ডেভিডের নামে বাচ্চাদের খেলনা, খাবার এবং আরও অনেক কিছুর নামকরণের অনুমতি চায়।

এই সমস্ত হট্টগোলে ডেভিড র‍্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হলো কী রকম? বিশেষ কিছুই না। অবোধ শিশুটি আগের মতই শুয়ে রইল ছোট্ট বিছানায়, গড়াগড়ি খেল, দুর্বোধ্য আওয়াজ করল মুখ দিয়ে, কখনও-বা কেঁদে উঠল তারস্বরে।

আর, সব সময়ের মত বাড়ন্ত ডানা দুটো ঝাপটাতে লাগল প্রবল তেজে, যা শঙ্কিত করে তুলল গোটা পৃথিবীকে। ডক্টর হ্যারিম্যান চিন্তিত হয়ে পড়লেন শিশুটিকে নিয়ে।

'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে,' আপন মনে বললেন তিনি। 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নালিশ জানাচ্ছে প্রতিনিয়ত, এই ভিড়ভাট্টা, হইচইয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে হাসপাতালের।'

'কিন্তু কোথায় নেবেন ওকে?' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইলেন মরিস। 'বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন—কেউ তো নেই বাচ্চাটার। এরকম একটা বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে রাখাও উচিত হবে না।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ডক্টর হ্যারিম্যান। 'প্র্যাকটিস ছেড়ে দিচ্ছি আমি। এখন আমার একমাত্র কাজ হবে ডেভিডকে পর্যবেক্ষণ করা। ওর বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট করতে চাই আমি। ডেভিডের আইনসম্মত অভিভাবক হিসেবে আবেদন করব আমি, এরপর ওকে নিয়ে পালাব এই হাঙ্গামা থেকে দূরে কোথাও। কোনও দ্বীপ কিংবা নির্জন কোনও জায়গায়। দেখা যাক, পাই কি না।'

তেমন একটা জায়গা সত্যিই পেয়ে গেলেন হ্যারিম্যান। মেইন উপকূল থেকে দূরে, ছোট্ট একটা দ্বীপ। অকাজের গাছপালা জন্মে আছে ওখানকার নিষ্ফলা মাটিতে।

দ্বীপটা লিজ নিলেন তিনি। একটা বাংলো তৈরি করলেন, এবং ডেভিড আর বয়স্কা একজন হাউসকিপার-নার্সকে নিয়ে থিতু হলেন সেখানে। শক্তসমর্থ এক নরওয়েজিয়ান পাহারাদারকেও নিয়োগ দিলেন তিনি। খুবই করিতকর্মা লোকটা। নাছোড়বান্দা রিপোর্টারদের নৌকা কয়েক বারই চেষ্টা করল দ্বীপে ভিড়তে। প্রত্যেক বারই ভাগিয়ে দিল ওদের প্রহরী।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল সংবাদপত্রগুলো। ডেভিডের বেড়ে ওঠার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোকে যেসব তথ্য আর ছবি সরবরাহ করলেন হ্যারিম্যান, সেগুলোই পুনর্মুদ্রণ করতে লাগল তারা।

দ্রুত বেড়ে উঠছিল ডেভিড। পাঁচ বছরের মধ্যে হলুদ চুলের ছোট্ট এক বলিষ্ঠ বালকে পরিণত হলো শিশুটি। ছোট-ছোট তামাটে পালকে ঢাকা পাখা দুটোও হলো আগের চেয়ে বড়। আর দশটা বালকের মতই হাসে, খেলে, ছুটোছুটি করে ডেভিড। ব্যতিক্রম শুধু জোরে-জোরে পাখা ঝাপটানোর ব্যাপারটা।

উড়তে শেখার আগেই দশে পা দিল ডেভিড। আগের তুলনায় ছিপছিপে এখন সে। চকচকে তামাটে ডানা জোড়া নেমে এসেছে গোড়ালি পর্যন্ত। হাঁটার সময় কিংবা শোয়া বা বসা অবস্থায় পাখা দুটো পিঠের উপর গুটিয়ে রাখে ছেলেটা। কিন্তু যখনই মেলে দেয় ওগুলো, দু'হাত ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর বিস্তৃত হয় ডানা দুটো।

ডক্টর হ্যারিম্যান চেয়েছিলেন, আস্তে-আস্তে নিজে থেকেই ওড়া শিখবে ডেভিড। ছেলেটার ক্রমবিকাশের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ ও ছবিতে ধরে রাখবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু ঘটনাগুলো সেভাবে এগোচ্ছিল না। পাখি যেভাবে প্রথম উড়তে শেখে, সেভাবেই প্রথম বার আকাশে উড়ল ডেভিড, আপনা-আপনি।

ওর নিজের অবশ্য পাখা-টাখা নিয়ে কখনওই খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। সে শুধু খেয়াল করেছে, ডক্টর জনের (যে নামে ডাকে ও ডাক্তারকে) পাখা নেই ওর মত। নেই ফ্লোরা নামের বেঁটেখাট বৃদ্ধা নার্স কিংবা হলফ নামধারী, সারাক্ষণ দাঁত বের করে থাকা নিরাপত্তা-রক্ষীটিরও। এ তিনজন ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখেনি ডেভিড। কাজেই, ধরে নিল, দুনিয়ায় দু'ধরনের মানুষ রয়েছে—যাদের পাখা আছে; যাদের পাখা নেই। সে এমনকী এটাও জানত না, পিঠের ওই পাখা দুটো কী কাজে লাগে, যদিও ডানা ঝাপটাতে ভালই লাগে তার। খালি গায়ে যখন দৌড়ে যায়, তখন তো অন্য রকম মজা।

তারপর এপ্রিলের এক সকালে পাখার রহস্য উন্মোচিত হলো ডেভিডের কাছে।

পাখির বাসা দেখতে ন্যাড়া, পুরানো এক ওক গাছে উঠেছিল ডেভিড। অনেক লম্বা গাছটা। ছোট এই দ্বীপের পাখিদের নিয়ে সীমাহীন কৌতূহল ছেলেটার। পাখিরা যখন তীরবেগে নেমে আসে নিচের দিকে, চক্কর কাটতে থাকে মাথার উপরে, উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে ডেভিড, হাততালি দেয়। প্রত্যেক শরতে পরিযায়ী পাখির

দল যখন দক্ষিণে রওনা হয়, আর বসন্তে উত্তরে, অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে সে ওদের জীবনযাত্রা নিয়ে। নিজেও পাখাঅলা বলেই হয়তো।

তো, বাসাটায় উঁকি দিতে গাছটার প্রায় মগডালের কাছে উঠে পড়ল ডেভিড। ডালপালায় যাতে বেধে না যায়, সেজন্য শক্ত করে মুড়ে রেখেছে ও দুই ডানা। বাসাটার কাছে পৌঁছে গেছে ডেভিড, আর মাত্র একটা ধাপ পেরোনো বাকি, কিন্তু যেই না ধরতে গেছে ডালটা, তখনই ঘটল অঘটন। ডালটা ছিল মরা, ওটার গোড়াটা ছিল পচা। মড়াত করে ভেঙে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে লাগল ডেভিড।

সাঁত করে শব্দ হলো। আপনা-আপনিই খুলে গেছে ডানা দুটো। সহজাত প্রবৃত্তি তার কাজ করেছে, মুহূর্তের মধ্যে। হেঁচকা টান অনুভব করল ও ডানায়, প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হলো কাঁধের পেশিতে। পরক্ষণেই দেখা গেল, আর পড়ে যাচ্ছে না ডেভিড, বরঞ্চ দৃঢ়ভাবে মেলে দেয়া ডানায় ভর করে সুন্দরভাবে নেমে আসছে বাতাসে দীর্ঘ বাঁক সৃষ্টি করে।

আনন্দ আর উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ, প্রলম্বিত চিৎকার বেরিয়ে এল বুকের গভীর থেকে। নামছে...নামছে...উড়ন্ত পাখির ছোঁ মারার ভঙ্গিতে মাটির দিকে নেমে আসছে ডেভিড। প্রবল বাতাসের ঝাপটা গায়ে-মুখে। দীর্ঘ দুই ডানা বাতাস কাটছে সাবলীলভাবে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি! আদিম এক শিহরণ। যার সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় হয়নি কখনও। আহ্, এত আনন্দ বেঁচে থাকায়! এত সুখ!

আবার চিৎকার দিল ডেভিড। সহসা ডানা ঝাপটানোর তাগিদ অনুভব করল ও, বাতাসের গায়ে চড় বসাল বিশাল দুই পাখা দিয়ে। হাত দুটো সোজা করে রেখেছে ও ডানার সমান্তরালে। পা জোড়াও টান-টান, ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে।

উপরের দিকে উঠছে এখন ডেভিড। দ্রুত দূরত্ব বাড়ছে মাটির সঙ্গে। সকালের রোদ ঝলসে উঠল ওর চোখের তারায়। কানের পাশে শোঁ-শোঁ শব্দ। চিৎকার করার জন্য আবার মুখ খুলল ডেভিড। কিন্তু বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা বাতাসের দমক রুদ্ধ করে দিল ওর স্বর। অদম্য আবেগে ডানা ঝাপটে আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল ডেভিড র‍্যাণ্ড।

খানিক বাদেই ডক্টর হ্যারিম্যান যখন বাংলো থেকে বেরোলেন, ওভাবেই আবিষ্কার করলেন ডেভিডকে। তীক্ষ্ণ একটা উত্তেজিত চিৎকার কানে আসতেই আকাশের অনেক উঁচুতে দেখতে পেলেন তিনি ছেলেটাকে। অত উপরে রয়েছে বলে ছোট্ট দেখাচ্ছে।

ডেভিডও দেখতে পেয়েছে ডাক্তারকে। সাঁ করে নেমে এল, যেন সূর্যালোকিত স্বর্গ থেকে।

শ্বাস বন্ধ করে অপূর্ব দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইলেন হ্যারিম্যান। এই ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে ডেভিড, এই উঠে যাচ্ছে উপরে, এই আবার চক্কর কাটছে তাঁকে ঘিরে। আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা একেবারে। শেখাতে হয়নি; কীভাবে উড়তে হবে, সেটা ওর রক্তের মধ্যেই সুপ্ত ছিল। সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। কী করে বাঁক নিতে হবে, কী করে খেতে হবে ডিগবাজি—সব ওর আয়ত্তে এসে গেছে আপনা-আপনি। তবে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা আনাড়িপনার ছাপ রয়েছে তাতে।

শেষ পর্যন্ত যখন ঝট করে পাখা গুটিয়ে ডাক্তারের সামনে মাটিতে নামল ডেভিড, ছেলেটার চোখে অত্যুজ্জ্বল আনন্দের ঝিলিক দেখতে পেলেন হ্যারিম্যান।

'আমি...আমি উড়তে পারি!'

সায় জানালেন ডক্টর হ্যারিম্যান। 'হ্যাঁ, ডেভিড। ...জানি, উড়তে বারণ করে লাভ নেই এখন, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে...কখনওই এই দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া চলবে না তোমার।'

দেখতে-দেখতে সতেরোয় পৌঁছে গেল ডেভিড। এখন আর ওকে চোখে-চোখে রাখবার কোনও মানে নেই। আর-সব পাখিদের মত দিনের বেশির ভাগ সময় আজকাল আকাশে-আকাশেই কাটায় ছেলেটা।

লম্বা, একহারা গড়ন ডেভিডের। এক মাথা হলদে চুল। শর্টস ছাড়া আর কিছুই পরে না। অবশ্য দরকারও নেই। স্বাভাবিক মানুষের চাইতে উষ্ণ ওর শরীর। ধারাল চেহারা আর বুদ্ধিদীপ্ত নীল দুই চোখে খেলা করে অস্থির, বুনো এক প্রাণপ্রাচুর্য।

ডানা জোড়াও বেড়েছে বয়সের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে। দু'দিকে যখন ছড়িয়ে দেয় ওগুলো, এক মাথা থেকে আরেক মাথার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় দশ ফিটেরও বেশি। আর যখন পিঠের উপর গুটিয়ে রাখে, নিচের দিকের পালকগুলো স্পর্শ করে গোড়ালি।

দ্বীপ ও এর চারপাশের সমুদ্রের উপর দিয়ে ওড়াউড়ির ফলে পাখার মাসল শক্ত হলো ডেভিডের, সহনক্ষমতা বাড়ল। এখন তো সারা দিনই আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে ও। পাখা না নেড়ে ধীরেসুস্থে নিচে নামার বিদ্যেটাও রপ্ত করেছে ভালই।

উড়তে-উড়তে পাখিদের তাড়া করে ডেভিড। দৌড়ের পাল্লায় প্রায় সমস্ত পাখিকে হারিয়ে দিতে সক্ষম ও। ফেজন্টের ঝাঁককে যখন ধাওয়া করে, আতঙ্কিত পাখিগুলোর কাণ্ড দেখে হা-হা করে আকাশ কাঁপিয়ে হাসে তরুণটি। কখনও দুষ্টুমি করে পলায়নরত হিংস্র বাজের লেজ থেকে খসিয়ে আনে পালক। বাজ পাখির চাইতেও দ্রুত গতিতে নেমে এসে খরগোশ কিংবা কাঠবিড়ালিকে তুলে নিতে পারে নিচে থেকে।

কোনও-কোনও দিন যখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে দ্বীপটা, মাথার উপরের ধূসর শামিয়ানার উপর থেকে উল্লসিত চিৎকার ভেসে আসে ডক্টর হ্যারিম্যানের কানে। তিনি বুঝতে পারেন যে, উপরেই কোথাও রয়েছে ডেভিড। কখনও-কখনও সূর্যালোক পড়া পানির উপরে নেমে আসে ও অভিকর্ষজ ত্বরণে। একদম শেষ মুহূর্তে এসে ঝট করে মেলে দেয় পাখা। ঢেউয়ের মাথা থেকে এক খাবলা ফেনা তুলে নিয়েই উড়াল দেয় আবার। চিৎকার করতে-করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় গাংচিলের দল।

যদিও কখনও দ্বীপের বাইরে যায়নি ডেভিড, কিন্তু মাঝেসাঝেই মেইনল্যাণ্ডে গিয়ে দেখেছেন হ্যারিম্যান, উড়ন্ত মানুষকে নিয়ে দুনিয়াজোড়া কৌতূহল মরে যায়নি এখনও। বিজ্ঞান-সাময়িকীগুলোকে যেসব ছবি দিচ্ছিলেন তিনি, সেগুলো আর পাঠক-চাহিদা মেটাতে পারছিল না। কৌতূহল মেটাতে নিজেরাই তারা আজকাল প্রায়ই লঞ্চ কিংবা প্লেনে চেপে দ্বীপের কাছাকাছি ভিড়বার চেষ্টা করছে উড়ন্ত মানুষের ভিডিয়ো-চিত্র নেবার জন্য।

এরকমই একটা বিমান ডেভিড র‍্যাণ্ডের চলমান ছবি নিতে সক্ষম হলো, যা ওটার আরোহীদের আগামী দিনগুলোতে গল্প ফাঁদার রসদ জোগাল। সংখ্যায় ওরা ছিল দু'জন—পাইলট আর ক্যামেরাম্যান। আর সময়টা ছিল দুপুর। ডক্টর হ্যারিম্যানের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উড়ন্ত তরুণের খোঁজে দ্বীপের আকাশসীমায় চক্কর কাটতে লাগল ওরা কর্কশ আওয়াজ তুলে।

ওরা যদি উপরে তাকাত, তা হলে দেখতে পেত ডেভিডকে—ওদের থেকে অনেক উঁচুতে বিন্দুর মত চক্কর কাটছে।

তাচ্ছিল্য মেশানো তীব্র কৌতূহল নিয়ে বিমানটা দেখছিল ডেভিড। এ ধরনের উড়োজাহাজ আগেও দেখেছে ছেলেটা। দেখে করুণাই হয় ওর। কেমন শক্ত হয়ে থাকে ওগুলোর জবড়জং ডানা দুটো। ভটভট শব্দে মোটর চলে। ওড়ার কী প্রাণান্ত চেষ্টা পাখা-ছাড়া মানুষদের!

ডাইভ দিয়ে বিমানটার পিছনে নেমে এল ডেভিড। প্রপেলার থেকে বেরোনো বাতাসের স্রোত ঠেলে পিছু নিল ওটার।

খোলা ককপিটে বসা পাইলটের হার্ট-অ্যাটাক হবার উপক্রম হলো, যখন পিছন থেকে লোকটার কাঁধে চাঁটি মারল কেউ। চমকে ঘুরে তাকিয়েই উড়ন্ত মানুষকে দেখতে পেল পাইলট। বিপজ্জনকভাবে হামাগুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে ফিউজেলাজের উপরে, বত্রিশ দন্ত বিকশিত। মুহূর্তের জন্য মাথাটা ঘুরে উঠল চালকের, যার ফলে পাশে কাত হয়ে গিয়ে নিচে পড়তে আরম্ভ করল বিমান।

শব্দ করে হেসে উঠেই ফিউজেলাজ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ডেভিড, সঙ্গে-সঙ্গেই পাখা দুটো মেলে দিল উপরে উঠবার জন্য। সংবিৎ এবং বিমানের নিয়ন্ত্রণ একই সঙ্গে ফিরে পেল পাইলট। ডেভিড দেখল, সোজা মেইনল্যাণ্ডের দিকে হারিয়ে গেল ওটা। একদিনের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে আরোহী দু'জনের।

এ ধরনের কৌতূহলী দর্শকের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছিল, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ডেভিড র‍্যাণ্ডের আগ্রহ। ওর ভাবনা জুড়ে রইল—কী আছে নীল সাগরের ওপারে, মূল ওই ভূখণ্ডে? ডেভিডের মাথায়ই

ঢোকে না, কেন ডক্টর জন মেইনল্যাণ্ডে যেতে মানা করেন ওকে। উড়ে-উড়ে ওখানে যাওয়া তো ছেলেখেলা ওর জন্য!

'শিগ্‌গিরই তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব আমি, ডেভিড,' বলেন ডক্টর হ্যারিম্যান। 'কিন্তু একটা কথা তোমাকে ভালভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে যে, বাইরের পৃথিবীতে খাপ খাওয়াতে পারবে না তুমি। অন্তত এখনই নয়।'

'কেন নয়?' বিভ্রান্ত গলায় জানতে চাইল ডেভিড।

'কারণ, তোমার পাখা আছে,' ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার। 'দুনিয়ার আর কারও তা নেই। এই কারণে ওখানকার জীবন কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে তোমার জন্য।'

'কিন্তু কেন?'

শুকনো চোয়াল ডলতে লাগলেন হ্যারিম্যান। চিন্তান্বিত গলায় বললেন, 'ওখানে গেলে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে তুমি। উদ্ভট কিছু হিসেবে দেখা হবে তোমাকে। মানুষ তোমার প্রতি কৌতূহলী হবে, কারণ, সবার চাইতে একেবারেই আলাদা তুমি। একই কারণে তোমাকে দেখা হবে নিচু চোখে। এসব এড়ানোর জন্যই লোকালয় ছেড়ে চলে আসি আমি তোমাকে নিয়ে। বাইরে তুমি যাবে অবশ্যই। তবে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

ঝট করে আকাশের দিকে একটা হাত তুলল ডেভিড। স্পষ্টতই রাগ হয়েছে ওর। বুনো হাঁসের একটা ঝাঁক শিস দিতে-দিতে উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণে—সেদিকে আঙুল নির্দেশ করছে ডেভিড। শারদ সূর্যাস্তের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে পাখিগুলোকে।

'ওরা তো অপেক্ষা করে না!' কাতরে উঠে বলল ও। 'প্রত্যেক শরতে এলাকা ছেড়ে চলে যায় ওরা। প্রত্যেক বসন্তে ফিরে আসে। তা হলে আমাকেই কেন ছোট্ট এই দ্বীপে বন্দি হয়ে থাকতে হবে!' মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা ঠিকরে বেরোতে লাগল ডেভিডের নীল চোখ জোড়া থেকে। 'আমিও ওদের মত বাইরের দুনিয়ার স্বাদ নিতে চাই...এখানে, ওখানে, সবখানে।'

'নিশ্চয়ই যাবে। আর সেটা খুব শিগ্‌গিরই,' কথা দিলেন ডাক্তার। 'আমিই তোমাকে নিয়ে যাব ওখানে।'

সেই সন্ধ্যায়, গোধূলির অন্ধকারে হাতের উপর চিবুক ঠেকিয়ে বসে দক্ষিণগামী পাখিদের পিছিয়ে পড়া দলটাকে দেখছিল ডেভিড। মনটা ওর স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। পরদিনও মনমরা রইল সে। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল দ্বীপের উপর দিয়ে। আর ব্যাকুল দৃষ্টিতে বার-বার তাকাতে লাগল যে পথ ধরে অজানার পানে হারিয়ে গেছে পাখিরা।

দেখে-দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ চিকিৎসক। ডেভিডের চোখের এই আকুলতার মানে বুঝতে পারছেন তিনি।

'বড় হয়ে গেছে ছেলেটা,' ভাবলেন হ্যারিম্যান। 'পাখি বড় হলে যেমন নীড় ছেড়ে চলে যায়, সেরকম লক্ষণই দেখা যাচ্ছে ডেভিডের মধ্যে। খুব বেশি দিন ওকে আটকে রাখতে পারব না...'

কিন্তু হ্যারিম্যানই আগে দ্বীপ ছেড়ে বিদায় নিলেন। মাঝে-মাঝেই বুকে ব্যথা উঠত ডাক্তারের। আর সেটাই কাল হলো একদিন। এক সকালে আর ঘুম থেকে জাগলেন না তিনি। তিনি যে আর কখনওই জাগবেন না, সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে বোবা হয়ে গেল ডেভিড। হতবুদ্ধি চেহারা নিয়ে তাকিয়ে রইল অভিভাবকের নিথর হয়ে যাওয়া ফ্যাকাসে মুখটার দিকে।

সারাটা দিন ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদল বুড়ি হাউসকিপার। নৌকা নিয়ে মেইনল্যাণ্ডের দিকে চলে গেল নরওয়েজিয়ান। শেষকৃত্যের জোগাড়যন্ত্র করতে হবে।

সেদিন আর উড়ল না ডেভিড। হাতের উপর থুতনি রেখে তাকিয়ে রইল নীল সাগরের দিকে।

বাংলোর চারপাশে অন্ধকার আর নীরবতার ভারী চাদর নেমে এলে পরে গুটিগুটি পায়ে চির-ঘুমে ঘুমিয়ে থাকা ডাক্তারের কামরার দিকে চলল ডেভিড। অন্ধকারেই স্পর্শ করল ও হ্যারিম্যানের শীতল, শীর্ণ হাত। দরদর করে তপ্ত অশ্রু গড়াচ্ছে ডেভিডের চোখ থেকে। বড়সড় কিছু একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে যেন গলার কাছে।

মৃদু পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ডেভিড।

পুব সমুদ্রের উপরের আকাশে ঝুলে আছে চাঁদটা। শরতের শুষ্ক বাতাস কী ঠাণ্ডা! সেই বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে রাতচরা পাখিদের বুক ধড়ফড় করা ডাক।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ডেভিডের। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে উপরে উঠে গেল ও। শোঁ-শোঁ ডানা ঝাপটে উঠে যাচ্ছে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। হিমশীতল হাওয়ার সাগরে সাঁতার কাটছে যেন ছেলেটা, হু-হু শব্দ হচ্ছে কানে। নাক-মুখ দিয়ে ঢুকে গিয়ে শ্বাস রোধ করবার উপক্রম করছে ঠাণ্ডা হাওয়া। মনের মধ্যে ভর করা বিষাদের মেঘকে ছাপিয়ে উঠল যেন মুক্তির অফুরন্ত আনন্দ।

উড়তে-উড়তে নিশাচরদের ঝাঁকটার মাঝে পৌঁছে গেল ডেভিড। 'দানব পাখি'-র আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বেচারীদের ভয় পাইয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগল ছেলেটা।

পাখিগুলো যখন দেখল, পাখাঅলা বিচিত্র জীবটা ওদের কোনও ক্ষতি করছে না, ফের ঝাঁক বাঁধল তারা। আবছা, তরঙ্গিত জল-সমতল ছাড়িয়ে বহু উপরে আলো বিলাচ্ছে মরা চাঁদটা; বহু দূরে চোখে পড়ে মূল ভূখণ্ডের ইতস্তত বাতি। দক্ষিণের যাত্রী হয়ে পাখা ঝাপটে উড়ে চলল ডেভিড।

সারা রাত, এমনকী পরদিনও আকাশে ভেসে রইল ছেলেটা। মাঝে সামান্যই বিশ্রাম নিল। প্রথমে অন্তহীন নীল সাগর; তারপর সবুজ, উর্বর ভূমি এল দৃশ্যপটে।

খিদে পেলে পাকা ফলের ভারে নত গাছ লক্ষ্য করে নেমে এল ডেভিড। রাত কাটাবার জন্য আশ্রয় নিল জঙ্গলের উঁচু এক ওকের মগডালে।

পাখাঅলা মানুষ লোকালয়ে এসেছে, এ খবর বেশি দিন অজানা রইল না সভ্য জগতের কাছে। শহর কি গ্রামবাসীরা, পাড়াগাঁয়ের খামারিরা অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের মাথার অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া হালকা-পাতলা দেহটার দিকে। মূর্খ কালো আদমিরা, যারা কখনও ডেভিড র‍্যাণ্ডের কথা শোনেনি, বিস্ময় আর আতঙ্কে অভিভূত হয়ে লাফঝাঁপ শুরু করে দিল এ দৃশ্য দেখে।

গোটা শীতকালটা ধরেই দক্ষিণাঞ্চল থেকে খবর আসতে লাগল ডেভিডের ব্যাপারে। সেসব খবর থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল, জঙ্গলে থেকে-থেকে একরকম জংলিই হয়ে উঠেছে শিক্ষিত ছেলেটা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নীল জলরাশির উপর দিয়ে রৌদকরোজ্জ্বল দিনগুলো কাটাচ্ছে ও ইচ্ছামত উড়ে বেড়িয়ে, ছোঁ মেরে পানি থেকে তুলে নিচ্ছে রুপালি মাছ। মাছ না পেলে ফল খাও। রাতে বিছানা পাতছে তারাদের কাছাকাছি। ঘুম থেকে জেগে উঠে আরেকটি দিনের শুরু। মোট কথা, শৃঙ্খলহীন জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করছে ডেভিড র‍্যাণ্ড। এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে ওর কাছে?

সময়ে-সময়ে নানান শহরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় ডেভিড। কারও চোখে যাতে ধরা না পড়ে, সেজন্য রাতের সময়টা বেছে নিয়েছে ও। কৌতূহল ভরে উঁকিঝুঁকি মারে মানুষ আর যানবাহনে ভরা ঘিঞ্জি রাস্তায়। বিশাল জায়গা জুড়ে বিশৃঙ্খলভাবে ঝলমল করতে থাকে শহরের বাতি। শহরের ভিতরে কখনও প্রবেশ করে না বলে ধারণাতেই আসে না ওর, কীভাবে নগরবাসীরা যাপন করছে ওখানে জটিলতায় ভরা 'অসম্ভব' এক জীবন, যে জীবনে অসীম নীল আকাশে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ার বুনো আনন্দের কোনও স্থান নেই। মাটির বাঁধনে বাঁধা পড়ে থাকা পিঁপড়ের মত ওই লোকগুলোর জীবনের অর্থ কী, ভেবেই পায় না ডেভিড।

বসন্তকালীন সূর্য যখন ধীরে-ধীরে তপ্ত হয়ে উঠল, অবস্থান নিল আকাশের অপেক্ষাকৃত উঁচুতে, কিচিরমিচির করতে-করতে যাযাবর পাখিরা আবার জোট বাঁধতে শুরু করল বাড়ি ফিরবার তাগিদে। নিজেও ডেভিড অনুভব করল, কিছু একটা টানছে ওকে উত্তরে। কাজেই, নতুন পাতা গজানো জমিনের উপর দিয়ে উড়ে চলল সে উত্তর দিকে। বিশাল দুই তামাটে ডানা অক্লান্তভাবে আঘাত করে চলল বাতাসের গায়ে। রোদে পুড়ে নিজেও তামাটে হয়ে উঠেছে ডেভিড।

অবশেষে দ্বীপে পৌঁছল ছেলেটা, যেখানে ও জীবনের বেশির ভাগটা সময় কাটিয়েছে।

বিরান পড়ে রয়েছে দ্বীপটা, কেউ আর থাকে না এখন ওখানে। পরিত্যক্ত বাংলোর সব কিছুর উপরে পড়েছে ধুলো। এক কালের সুন্দর

বাগান ভরে গেছে আগাছায়।

কিছুটা সময় কাটাল ওখানে ডেভিড। ঘুমাল পোর্চে। ওই দ্বীপেই কাটল ওর মৌসুমটা। ফুলেরা যখন মরে যেতে শুরু করল, বাতাস হয়ে উঠল শীতার্ত, ভিতরের অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় আবারও ডেভিড যোগ দিল দক্ষিণগামী পাখিদের দলে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ থেকে উত্তর–তিনটা বছর কাটল এভাবেই। এই তিন বছরে পাহাড়, উপত্যকা, নদী, সাগর–সব কিছুই চিনল ডেভিড। অভিজ্ঞতা হলো ঝঞ্ঝা আর শান্ত প্রকৃতির, পরিচয় ঘটল ক্ষুধা আর তৃষ্ণার সঙ্গে। ততদিনে সভ্য জগৎ প্রায় ভুলেই গেছে ওর কথা। তারপর একদিন...

আরেকটি বসন্ত শুরু হলো। বরাবরের মত উত্তর অভিমুখে চলেছে ডেভিড। সন্ধের দিকে খিদে পেল ওর। ততক্ষণে আধাশহুরে একটা এলাকায় এসে পড়েছে ছেলেটা। বিশাল ফলবাগানের মাঝখানে একটা ম্যানশন চোখে পড়ল ওর। সদ্য বেরি এসেছে গাছে, ফলের লোভে নিচের দিকে নেমে এল ডেভিড। গাছগুলোর কাছাকাছি এসেছে, এই সময় গর্জে উঠল একটা বন্দুক।

চোখে অন্ধকার দেখল যুবক। ব্যথার একটা খোঁচা অনুভব করল ও মাথার মধ্যে। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে একটা বিছানায় আবিষ্কার করল ডেভিড। উজ্জ্বল রোদে ঘর ভর্তি। স্নেহময় এক বৃদ্ধ আর এক তরুণীকে দেখতে পেল ও কামরায়। আরও একজন রয়েছেন ঘরে, চেহারা-সুরতে যাকে ডাক্তার বলে মনে হলো। টের পেল, মাথার চারপাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ওর। তীব্র কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে এই তিনটি প্রাণী।

'তোমার নাম কি ডেভিড র‍্যাণ্ড, বহুল আলোচিত সেই পাখাঅলা মানুষ?' জিজ্ঞেস করলেন দয়ালু চেহারার বৃদ্ধটি। 'ভাগ্যটা খুবই ভাল যে, বেঁচে গেছ। আসলে হয়েছে কী, গতকাল সন্ধ্যার আগে আমাদের মালি বাজ পাখি ভেবে গুলি করেছে তোমাকে, প্রায়ই যেটা আমাদের মুরগির বাচ্চা চুরি করে,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'সামান্য আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে গুলিটা...'

'এখন কি একটু ভাল বোধ করছ?' নরম গলায় জানতে চাইল মেয়েটি। 'ডাক্তার বলছেন, শিগ্‌গিরই আগের মত হয়ে উঠবে তুমি।' তারপর বলল, 'আমার বাবা ইনি–উইলসন হল। আর আমি–রুথ হল।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল ডেভিড। ওর মনে হলো, এত সুন্দর কাউকে দেখেনি ও এর আগে। কোঁকড়া, কালো চুল লাজুক চেহারার মেয়েটার মাথায়। বাদামি চোখ দুটো মমতা আর উদ্বেগে ভরা।

আচমকা ধাঁধাটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেভিডের কাছে, কেন প্রজনন ঋতুতে জোড় বাঁধে পাখিরা। অন্য রকম একটা অনুভূতি টের পেল বুকের মধ্যে। অমোঘ আকর্ষণে টানছে ওকে মেয়েটা। ভালবাসা কী, সে সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই ডেভিডের। কিন্তু প্রথম দেখাতেই রুথ হলকে ভালবেসে ফেলল ও।

'আমি...ঠিক আছি,' আস্তে করে বলল ডেভিড।

'পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে তোমাকে,' জানিয়ে দিল মেয়েটা। 'আমাদের চাকরটা প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল তোমাকে। ঋণ পরিশোধের সুযোগটা অন্তত দাও আমাদের।'

সুতরাং, থেকে গেল ডেভিড। ক্ষত সারছিল ওর আস্তে-আস্তে। চারদেয়ালের ভিতরে ভাল লাগে না ওর, কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। তেমনি পছন্দ করে না খবরের কাগজের প্রতিবেদক আর ক্যামেরাম্যানদের। পাখিমানুষের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উইলসন হলদের বাড়িতে হাজিরা দিচ্ছে তারা চমকপ্রদ কিছুর প্রত্যাশায়। তবে সেটাও বন্ধ হলো অচিরেই। তার কারণ, ডেভিড র‍্যাণ্ড সম্বন্ধে পাঠকদের আগের সেই উৎসাহ মিইয়ে গেছে।

এদিকে ভালবাসার কথাটা বলতে না পেরে ভিতরে-ভিতরে পুড়ে যাচ্ছে ডেভিড। রুথ হলের পাশে যুবকটির আর-সব আকাঙ্ক্ষা ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটা ওকে ভালবাসবে কেন? যেহেতু এখনও অনেকটাই বুনো রয়ে গেছে ডেভিড। তা ছাড়া মানুষের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, অল্পই ধারণা রয়েছে ওর সে

ব্যাপারে; মুখ ফুটে হৃদয়ের গভীর, গোপন অনুভূতির কথা জানানো তো পরের ব্যাপার!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল ঠিকই। সূর্যালোকিত বাগানে, রুথের পাশে বসে ডেভিড যখন মনের কথা উগরে দিল, মেয়েটার নম্র চোখ দুটোতে খেলে গেল অস্থিরতা।

'তুমি চাও, আমি তোমাকে বিয়ে করি?'

'বিয়ে? কেন নয়?' খানিকটা ইতস্তত করে বলল ডেভিড। 'এভাবেই তো জুড়ি খুঁজে নেয় মানুষ, তা-ই না? সঙ্গিনী হিসেবে চাই আমি তোমাকে, রুথ!'

'কিন্তু তোমার পাখা–' চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

হাসল ডেভিড। 'আমার পাখায় তো কোনও সমস্যা নেই। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ও-দুটো। এই দেখো!'

পায়ের পাতার উপরে লাফ দিল ডেভিড। বাতাসের গায়ে রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল দুই ডানার চাবুক কষিয়ে উড়াল দিল আকাশে। নীল পটভূমিতে পৌরাণিক একটা চরিত্রের মতই দেখাতে লাগল ওকে।

একটু পরে নেমে এল। দুশ্চিন্তা তখনও মোছেনি রুথের চোখ থেকে। 'তা বলিনি আমি,' ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। 'আমি আসলে বলতে চাইছি, তোমার এই পাখার কারণেই আর-সবার থেকে আলাদা তুমি। তুমি যে উড়তে পারো, অবশ্যই এটা বিশেষ কিছু, কিন্তু একই কারণে লোকে অস্বাভাবিক মনে করে তোমাকে...'

'তুমিও কি তা-ই মনে করো, রুথ?' সরাসরি জানতে চাইল ডেভিড।

'অবশ্যই না,' জোর দিয়ে বলল মেয়েটা। 'একটু অন্য রকম লাগে তোমাকে...ঠিক মানুষ না...'

'মানুষ না?' প্রতিধ্বনি করল ডেভিড। 'কিন্তু আমি তো মানুষ! পাখা আছে, কিন্তু মানুষ তো! ...আমি চাই তোমাকে নিয়ে উড়তে...একবার আকাশে উঠলেই টের পাবে, বেঁচে থাকা কাকে বলে!'

দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল রুথ। 'আমি পারব না, ডেভিড! আমি জানি, কথাগুলো হাস্যকর শোনাচ্ছে, কিন্তু যখনই আমি উড়তে দেখি তোমাকে, তোমাকে তখন মানুষ মনে হয় না; মনে হয়, বিরাট একটা পাখি...'

সহসা মুষড়ে পড়ল ডেভিড। 'এই পাখার কারণেই আমাকে বিয়ে করতে চাইছ না তুমি?' শক্তিশালী বাহুতে খপ করে মেয়েটাকে জাপটে ধরল যুবক। এক জোড়া ঠোঁট খুঁজতে লাগল আরেক জোড়াকে।

'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি, রুথ!' ডুকরে উঠল ডেভিড। 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না!'

সেরাতেই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলল দ্বিধাগ্রস্ত রুথ। রুপালি জোছনায় প্লাবিত তখন উদ্যানটা। পাশাপাশি বসে আছে ওরা।

'ডেভিড,' বলল মেয়েটা। 'একটা উপায় আছে! হ্যাঁ, এভাবেই আমরা পরস্পরকে বিয়ে করে সুখী হতে পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে, অতটা ত্যাগস্বীকার করতে পারবে কি না তুমি–'

'তোমাকে পাবার জন্য যে-কোনও কিছু করতে রাজি আমি!' কেঁদে ফেলবে যেন ডেভিড।

তা-ও দ্বিধা করছে মেয়েটা। তারপর বলল, 'আমাদের মিলনের পথে মস্ত বড় বাধা এই পাখা। এমন কাউকে আমি স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পারব না, যাকে সভ্য মানুষের চাইতে বুনো একটা জানোয়ারই মনে হয় বেশি। এমন কাউকে জীবনসঙ্গী করতে পারব না, লোকে যাকে ঘৃণ্য একটা বিকলাঙ্গ মানুষ হিসেবে দেখে। তবে তুমি যদি তোমার ডানা দুটো কেটে ফেলো...'

থ হয়ে গেল ডেভিড। 'কেটে ফেলব!'

উৎসাহের সঙ্গে, খানিকটা তাড়াহুড়ো করে বিষয়টা বোঝাতে লাগল রুথ। 'খুবই সম্ভব ব্যাপারটা। ডক্টর হোয়াইটকে তো চেনো। উনি বলেছেন, সার্জারি করে পাখা দুটো বাদ দেয়া নাকি কোনও ব্যাপারই না। একটুও বিপদ নেই এতে। অপারেশনের পর সামান্য উঁচু হয়ে থাকবে পিঠের ওখানটা। ওটা কোনও সমস্যা হবে না। পাখা দুটো না থাকলে স্বাভাবিক মানুষের মত দেখাবে তোমাকে।' রুথের কোমল মুখখানা ব্যগ্র দেখাচ্ছে। আকুল আবেদনের ভঙ্গি সেখানে। 'আব্বুর ব্যবসায় যোগ দিতে পারবে তুমি। ভবঘুরে জীবন ছেড়ে পাবে একটা স্বাভাবিক জীবন।'

'পাখা যদি না কাটি, তা হলে বিয়ে করবে না আমাকে?' মেনে নিতে পারছে না ডেভিড।

'পারব না আমি!' যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে বলল রুথ। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি, ডেভিড। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে আর দশটা পুরুষের মতই দেখতে চাই।'

'আর কোনও দিন উড়তে পারব না!' ফাঁকা স্বরে স্বগতোক্তি করল ডেভিড। জোছনায় রুপালি চেহারাটা আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর। 'না!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল যুবক। 'আমি এটা পারব না! পাখা কাটব না আমি আমার! আমি–' থেমে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে রুথ।

হাত দুটো টেনে নিল যুবক। চিবুক ধরে উঁচু করল অশ্রুসিক্ত মুখটা।

'কেঁদো না, রুথ!' কাতর স্বরে বলল। 'এর মানে এই না যে, তোমাকে ভালবাসি না আমি। বাসি–পৃথিবীর যে-কোনও কিছুর চাইতেও বেশি। কিন্তু...' মেয়েটাকে ছেড়ে দিল ডেভিড। 'ঘরে যাও, রুথ। কিছুক্ষণ চিন্তা করতে দাও আমাকে।'

যুবককে চুমু খেল মেয়েটা। তারপর চলে গেল বাড়ির ভিতরে। এক রাশ বিশৃঙ্খল চিন্তা মগজে নিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ডেভিড।

কী করবে ও? পাখা দুটো কেটেই ফেলবে? চিরতরে বিদায় জানাবে আকাশটাকে? নাকি রুথের আশা ত্যাগ করবে? বিসর্জন দেবে শরীরের প্রতিটি অণুতে স্পন্দিত অন্ধপ্রেমকে? এরপর কী? দুঃসহ নিঃসঙ্গতা? বাকিটা জীবন মেয়েটার জন্য প্রতীক্ষা? কীভাবে থাকবে ও রুথকে ছেড়ে? পারবে না! পারবে না ও!

বাগানবাড়ির দিকে ছুটে গেল ডেভিড। চন্দ্রালোকিত বারান্দায় ওরই অপেক্ষাতে ছিল মেয়েটা।

'ডেভিড!' অস্ফুটে বলে উঠল ও।

'হ্যাঁ, রুথ। কাটব আমি! তোমার জন্য করব আমি কাজটা!'

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ডেভিডের বুকে আশ্রয় নিল রুথ হল। এ ওর সুখের কান্না। 'আমি জানতাম, সত্যিই আমাকে ভালবাসো তুমি! জানতাম আমি!'

দু'দিন পর। হাসপাতালে, ঘুমপাড়ানি গ্যাসের আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে বিচিত্র অনুভূতি হলো ডেভিডের। চুলকাচ্ছে, জ্বালা করছে পিঠটা। রুথ আর ডক্টর হোয়াইট ঝুঁকে আছে ওর বিছানার উপরে।

'ওয়েল, ইয়ং ম্যান, অপারেশন পুরোপুরি সাকসেসফুল!' বললেন ডাক্তার। 'কিছু দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন আপনি।'

ঝলমল করছে রুথের চোখ জোড়া। 'যেদিন হাসপাতাল ছাড়বে তুমি, সেদিনই বিয়ে করব আমরা, ডেভিড!'

ওরা দু'জন চলে গেলে আস্তে-ধীরে নিজের পিঠ স্পর্শ করল যুবক। নেই, পাখা নেই! ব্যাণ্ডেজের নিচে কেবল উঁচু হয়ে থাকা দুটো জায়গা।

মাথা ঘুরছে ডেভিডের। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর আর কেমনই-বা লাগবে! তবু রুথকে পাচ্ছে বলে আর কিছু ভাবতে চায় না ও।

সত্যি। ভালবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে স্বামীকে ডানার অভাব ভুলিয়ে দিল মেয়েটা। দ্বিতীয় জীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করল ডেভিড র‍্যাণ্ড।

মেয়ে আর জামাতাকে শহরের কাছাকাছি, গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ের উপরে চমৎকার একটি সাদা কটেজ উপহার দিলেন উইলসন হল। ডেভিডকে ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন তিনি, ধৈর্য ধরে কাজ শেখাতে লাগলেন। প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে শহরে যায় ডেভিড, সারা দিন কাজ করে অফিসে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আগুনের ধারে বসে সময়টা কাটায় ও স্ত্রীর সঙ্গে। স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে গল্পগুজব করে রুথ হল।

'ডেভিড,' জিজ্ঞেস করে রুথ। 'কাজটা করার জন্য তোমার কোনও আফসোস নেই তো?'

হাসে ডেভিড। 'অবশ্যই না, ডারলিং। তোমাকে কাছে পাওয়া যে-কোনও কিছুর চাইতে বেশি।'

নিজেকেও একই প্রবোধ দেয় ডেভিড–ডানা হারিয়ে খারাপ নেই সে। উড়ে বেড়াবার দিনগুলো অবিশ্বাস্য একটা স্বপ্নের মত মনে হয় ওর কাছে। যেন সেই ঘুম ভেঙে সত্যিকারের জীবনে ফিরে এসেছে। সত্যিকারের সুখী জীবন।

'ডেভিড তো দারুণ করছে অফিসে,' মেয়েকে বলেন উইলসন হল। 'ওকে নিয়ে যে

ভয়টা ছিল, সেটা এখন নেই। সব কিছুর সাথে মানিয়ে নিয়েছে ও।'

'আমি জানতাম, পারবে ও,' রুথের কথায় গর্ব প্রকাশ পায়। 'সবাই ওকে এত পছন্দ করে।'

রুথ আর ডেভিডের বিয়েটা নিয়ে এক সময় যারা ভুরু কুঁচকেছিল, তারাই আজকাল স্বীকার করছে যে, না, কোনও ভুল করেনি মেয়েটা।

তো, এভাবেই পেরিয়ে যেতে লাগল মাসগুলো। ছোট্ট কটেজে সুখের সংসার ডেভিড আর রুথের। তারপর এল সেই শরৎ...ডেভিড-রুথের সুখী জীবনে প্রথম ছন্দপতন।

এখনই তুষার পড়তে শুরু করেছে পাহাড়ে। প্রত্যেক সকালে দেখা যায়, রুপালি চাদর বিছিয়ে আছে লনে। মেপলের পাতায়-পাতায় আজব রং।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ডেভিডের। শুয়ে-শুয়ে চিন্তা করতে লাগল ও, কেন এভাবে ভেঙে গেল ঘুমটা। পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ওর স্ত্রী। নিঃশ্বাস পড়ছে নিয়মিত ছন্দে।

তারপর ঘুম ভাঙার কারণটা ধরতে পারল ও। একটা আওয়াজ। এত দূর থেকে আসছে যে, প্রায় শোনাই যায় না। কিন্তু এ আওয়াজ ওর চেনা। হাওয়া-বদল করতে যাচ্ছে পাখিরা। ওদের উচ্ছল চিৎকারে মুক্তির বার্তা। বুকটা ধুকধুক করতে লাগল ডেভিডের।

চট করে জানালার কাছে চলে গেল ও। উঁকি দিল রাতের আকাশে। ওই তো ওরা! বড় একটা ঝাঁক বুনো হাঁসের। নক্ষত্রের নিচ দিয়ে পাড়ি ধরেছে দক্ষিণের।

ছটফট করে উঠল ডেভিড। মনটা চাইছে, পরিষ্কার, ঠাণ্ডা রাত্রিতে সঙ্গী হয় ওদের। তিরতির কাঁপন উঠল পিঠের পেশিতে। কিন্তু ওর তো পাখা নেই!

সহসাই নেতিয়ে পড়ল ডেভিড। না, উড়তে পারছে না, সেজন্য নয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য রুথের কথা বিস্মৃত হয়েছিল ও। তীব্র একটা অপরাধবোধে জর্জরিত হলো মনটা।

কোনও মতে বিছানায় ফিরে এল ডেভিড। শুয়ে পড়ল। এখনও কানে আসছে পাখিদের উচ্ছ্বসিত ডাকাডাকি। সহ্য করতে না পেরে কানে হাত চাপা দিল বেচারা যুবক।

পরদিন অফিসে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে রাতের ঘটনা ভুলতে চাইল ডেভিড। কিন্তু টের পেল, বার-বারই জানালা দিয়ে চোখ চলে যাচ্ছে নীল আকাশের দিকে। হপ্তার পর হপ্তা পেরোল, দীর্ঘ শীত গিয়ে এল বসন্ত, ডেভিডের বুকের উন্মাদনা তবু শান্ত হলো না। ভিতরে-ভিতরে রক্তাক্ত হয়ে পড়ল যুবক।

'আহাম্মক তুমি!' তীব্র ভর্ৎসনা করে ও নিজেকে। 'রুথের মত মেয়েকে পেয়েছ, ওর ভালবাসা পেয়েছ। আর কী চাই?'

নির্ঘুম এক রাতে নিজেকে বুঝ দিল ও, 'রুথকে নিয়ে সত্যিই সুখী আমি, নিজের স্বাভাবিক জীবন নিয়ে সুখী।'

কিন্তু পুরানো স্মৃতি ফিসফিস করে চলল ওর মগজে। 'তোমার কি মনে আছে প্রথম ওড়ার দিনটা? প্রথমবারের সেই পাগলা উত্তেজনা?'

রাতের বাতাস প্রলোভন দেখাল, 'মনে করে দেখো, এক সময় আমার সাথে পাল্লা দিতে তুমি। নক্ষত্রের নিচ দিয়ে, ঘুমন্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে ছুটে চলতাম আমরা। আমার গায়ে ডানার চাবুক কষিয়ে কী রকমভাবে হেসে উঠতে তুমি, মনে আছে?'

বালিশে মুখ গুঁজে বিড়বিড় করে ডেভিড: 'মনে নেই! কিচ্ছু মনে নেই আমার!'

এক রাতে জেগে উঠল রুথ। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ডেভিড? কোনও সমস্যা?'

'না, ডিয়ার,' আশ্বস্ত করল ডেভিড। কিন্তু রুথ আবার চোখ বুজতেই চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল ওর। 'নিজের সাথে প্রতারণা করছি আমি,' নিজেকেই শোনাল ডেভিড। 'আমি আবার উড়তে চাই!'

কিন্তু উপায় কী! তা তো আর সম্ভব নয়। কাজেই, নিজের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলল ডেভিড। নিষ্ফল একটা লড়াই। কেউ যখন আশপাশে থাকে না, সূর্যাস্তের পটভূমিতে আবাবিলদের উড়ে যাওয়া দেখে ও ভাঙা মন নিয়ে। দেখে, আকাশের অনেক উঁচুতে কীভাবে উঠে যাচ্ছে বাজ; নীলের বুকে কালো একটা বিন্দু। মাছরাঙারা যখন ঝাঁপ দেয় পানিতে, বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেভিড।

একদিন লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল রুথ, 'এই, শুনছ? আগামী শরতে...একজন আসছে

আমাদের দু'জনের মাঝে...'

চমকে উঠল ডেভিড। 'রুথ!' তারপরই সচেতন হলো ও বাস্তবতা সম্পর্কে। 'তোমার কি ভয় লাগছে না? ও যদি–'

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়ল রুথ। 'না, ডেভিড। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, আমাদের বাচ্চার অস্বাভাবিক হিসেবে জন্ম নেয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যে জিন-বৈশিষ্ট্যের কারণে পাখা গজিয়েছিল তোমার, তা খুবই বিরল একটা ঘটনা। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের বাচ্চার উপরে এটার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। ...খুশি?'

'নিশ্চয়ই!' পরম আদরে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল ডেভিড। 'আমাদের বাবু...দারুণ একটা ব্যাপার হতে চলেছে এটা।'

খবরটা শুনে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মিস্টার হল। 'নাতি-নাতনির মুখ দেখব...ওহ!' জামাইকে বললেন, 'ডেভিড, বাচ্চার জন্মের পর কী করব আমি, বলো তো? অবসর নেব। তুমিই এরপর থেকে হাল ধরবে ব্যবসার।'

'ওহ, আব্বু!' খুশিতে বাপকে চুমু খেল মেয়ে।

আধো গলায় শ্বশুরকে ধন্যবাদ দিল ডেভিড। ভাবল, এ-ই বোধ হয় ভাল হলো। একজন দায়িত্বশীল পুরুষ হিসাবে ওর এখন আরও বেশি করে ভাবতে হবে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর কথা, অনাগত সন্তানের ভবিষ্যতের কথা। পুরানো জীবনের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সময় কই?

নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজে মন দিল ডেভিড। কয়েক হপ্তার মধ্যে পুরোপুরি ভুলে গেল ও ঘুমহীন রাতগুলোর কথা। মন জুড়ে রয়েছে কেবল আগামী।

আর ঠিক তখনই হলো দ্বিতীয় ছন্দপতনটা...

ইদানীং মাঝে-মাঝেই পিঠে ব্যথা করত ডেভিডের। একদিন আয়নায় দাঁড়িয়ে পিঠটা পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল ভীষণ। ছোট-ছোট কুঁজ দুটো কখন এত বড় হয়ে গেল! তা হলে কি–?

পরদিনই ডক্টর হোয়াইটের শরণাপন্ন হলো ও। এক কথা, দু'কথায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডাক্তার, ধরুন, আমার যদি পাখা গজায় আবার?'

বিষয়টা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন ডাক্তার। 'সম্ভাবনা আছে। গোসাপের যেমন হারানো অঙ্গ নতুন করে গজাতে পারে, টিকটিকির যেমন, আপনারও তেমনি পাখা গজাতে পারে নতুন করে। একবার অন্তত ঘটতে পারে এমন ঘটনা। চিন্তা করবেন না। সেরকম কিছু ঘটলে আবারও অপারেশন করা যাবে।'

ধন্যবাদ দিয়ে চলে এল ডেভিড। তারপর থেকে প্রতিদিনই লক্ষ করতে লাগল ও কুঁজ দুটো। এক পর্যায়ে নিশ্চিত হলো, শিগ্‌গিরই ফলতে চলেছে ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী।

দিনে-দিনে আরও বড় হচ্ছে ডেভিডের পিঠের কুঁজ। বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরি পোশাকের বদৌলতে পরিবর্তনটা চোখে পড়ল না কারও। গ্রীষ্মের শেষ দিকে কুঁজ ফুঁড়ে বেরোল পাখা! ছোট এখনও, কিন্তু সত্যিকারের পাখা তো! জামা-কাপড়ের নিচে ও-দুটো লুকিয়ে রাখল ডেভিড।

কিন্তু কত দিন আড়াল করে রাখতে পারবে ওগুলো? ডেভিড বুঝল, দেরি না করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ওর, আর-বেশি বড় হওয়ার আগেই ফেলে দেয়া উচিত ডানা জোড়া। নিজেকে বোঝাল ও, ডানার দরকার নেই ওর। সব কিছু মিলিয়ে জীবনটা এখন অর্থবহ ওর কাছে।

তারপরও যাচ্ছি-যাব করে যাওয়া হয়ে উঠল না ডাক্তারের কাছে। পোশাকের নিচে নীরবে বড় হতে লাগল ডানা দুটো। কাউকে কিচ্ছুটি বুঝতে দিল না ডেভিড। ভাঁজ করা থাকে বলে বোঝাও যায় না বাইরে থেকে। মা হতে চলেছে, এ সময় এসব বলে চিন্তায় ফেলতে চায় না ও রুথকে।

আগেরগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এবারের ডানা দুটো দুর্বল। এগুলোর সাহায্যে উড়তে পারবে, এ ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত নয় ডেভিড। যদিও সে চায় না উড়তে।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জন্ম নিল ডেভিড-রুথের পুত্রসন্তান। চমৎকার স্বাস্থ্য। কোথাও কোনও খুঁত নেই শরীরে। এ ছেলের কখনও পাখা গজাবে না।

'খুশি হয়েছ তুমি?' গর্বিত মা জিজ্ঞেস করল স্বামীকে।

কিছু বলতে পারল না ডেভিড। মাথা নাড়ল নীরবে। আবেগ উথলে উঠতে চাইছে ঘুমন্ত শিশুটির দিকে চেয়ে। ওর সন্তান!

বাচ্চাটির দাদু সগর্বে ঘোষণা করলেন, আজই আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ থেকে অব্যাহতি নেবেন তিনি। ব্যবসার সব ভার এখন জামাতার কাঁধে।

বুড়ো উইলসন বিদায় নিলে, রুথ যখন ঘুমিয়ে, একা হয়ে পড়ল ডেভিড। আচমকা উপলব্ধি করল ও সত্যটা। নিজের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এতগুলো মাস নিজেকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি, মিথ্যে অজুহাত তৈরি করেছ ডানাগুলোকে বাড়তে দেয়ার। এর মানে হলো, তোমার আশা ছিল, আবার হয়তো উড়তে পারবে তুমি। স্বীকার করো, আর না-ই করো।'

একা-একাই হাসল ডেভিড। 'তা-ই যদি হয়ে থাকে, ওসবের আর প্রয়োজন দেখছি না। এখন আমি পিতা হয়েছি। রুথকে নিয়ে, আমার সন্তানটিকে নিয়ে এখন আমি পরিপূর্ণ। এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ডানা দুটো ফেলে দিয়ে আসছি।'

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতেই তড়িঘড়ি করে কটেজ থেকে বেরিয়ে এল ডেভিড। রাত নেমে এসেছে। শরতের তাজা হাওয়া বইছে বাইরে। পুব দিকে বৃক্ষসারির উপরে ঝুলে আছে নিষ্প্রভ চাঁদ।

গ্যারাজের উদ্দেশে পা চালাল ডেভিড। প্রবল উত্তুরে হাওয়ায় নুয়ে পড়েছে চারপাশের গাছগুলো। তীক্ষ্ণ শব্দ উঠছে ডালে-ডালে লেগে।

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াল ও। বহু দূর থেকে আসা একটা চাপা শব্দ থামিয়ে দিয়েছে ওকে। ক্রমে বাড়ছে শব্দটা...বাড়ছে...বাড়ছে...

বুনো হাঁস।

বাতাসে চুল উড়ছে ডেভিডের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ও অন্ধকার আকাশে। মাত্র একবার ওদের সঙ্গে উড়তে চায় ডেভিড! মাত্র একবার! তারপর চির-জীবনের জন্য ভুলে যাবে অতীতটা। পাখা দুটো তো কেটেই ফেলবে। বেশি দূর যাবে না ও। ফিরে এসেই ছুটবে ডাক্তারের কাছে। কেউ কখনও জানতে পারবে না ওর ওড়ার ব্যাপারে।

তাড়াতাড়ি গা থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলল ডেভিড। বাঁধনমুক্ত হতেই ঝাড়া দিয়ে দু'পাশে ছড়িয়ে গেল বন্দি ডানা দুটো। ওগুলোর সাহায্যে কি উড়তে পারবে ও? কয়েকটা মিনিট কি ভাসিয়ে রাখতে পারবে না ওকে কমজোরি ডানা দুটো? বোধ হয়—না।

বাতাসটা বেড়ে যেতেই গোঙানির আওয়াজও বেড়ে গেল গাছেদের। হাঁটু ভাঁজ করল ডেভিড। ফরসা মুখে একাগ্রতার ছাপ। পারবে? নাকি পারবে না? বাতাস যেন বলে গেল কানে: 'চেষ্টা করো! আমি সাহায্য করছি তোমাকে! আবার আমরা পাল্লা দিয়ে ছুটব!'

উড়ন্ত পাখিরাও যেন আহ্বান করছে: 'এসো, ডেভিড, এসো! আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে!'

লাফ দিল ডেভিড। হলো না! প্রথমে এমনটাই ভেবেছিল ও। তারপরই দেখল—উড়ছে! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিচে পড়ল গাছপালা, কটেজের আলোকিত জানালা, এমনকী গোটা পাহাড়টাই।

উঠছে...উঠছে...কী যে ভাল লাগছে ঠাণ্ডা বাতাসের আলিঙ্গন! আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল ডেভিড।

পাখিদের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলল ও। আচমকা উপলব্ধি করছে, এটাই ওর জীবন! পিছনে পড়ে থাকা 'সুখী' জীবনটা আদতে মায়া ছাড়া কিছুই না...স্বপ্ন! স্বপ্নটা টুটে গেছে...ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে ডেভিড র‍্যাণ্ড!

সারা রাত ধরে উড়ে চলল ডেভিড। উড়তে-উড়তে বহু দূর চলে এসেছে ও। এক সময় জমিন ছাড়িয়ে রুপালি সাগরের উপর দিয়ে উড়তে লাগল। ডেভিড জানে, পাগলামি ছাড়া কিছুই না এটা। এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ডানা দুটো। তারপরও ফিরে যাওয়ার চিন্তা আসছে না মাথায়। শেষ বারের মত উড়ছে আজ, ইচ্ছামত আশ মিটিয়ে নেবে মনের।

তারপর...ডানার শক্তি হারিয়ে নিচে পড়তে আরম্ভ করল ডেভিড। বহু নিচ থেকে ছুটে আসছে রুপালি সাগর, কিন্তু একটুও ভয় নেই ডেভিডের বুকে। বরং কেমন একটা অবসন্ন আনন্দ পরিতৃপ্তির।

বিদায়, পৃথিবী! শেষ বারের মত আকাশের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল ডেভিড র‍্যাণ্ড। ■

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ

অন্বেষা বড়ুয়া

মনু আর তার তিন বন্ধু সম্পর্কেও বীণার কথাবার্তা রহস্যময়।

রেস্তোরাঁয় গুলিবিদ্ধ হয়ে বারটেণ্ডারের মৃত্যু। ভাবছেন, এ আর এমন কী! এমন তো অহরহই ঘটছে। কিন্তু আর দশটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটু তফাত রয়েছে এখানে। কেননা, এলেবেলে কোনও ব্যক্তি নন এই বারটেণ্ডার, একজন মডেল তিনি।

দিনটা ছিল বুধবার। এপ্রিলের ৩০ তারিখ। অকুস্থল দিল্লির কুতুব মিনারের পাশে অভিজাত ট্যামারিণ্ড কোর্ট রেস্টুরেন্ট। আর ভিকটিমের নাম জেসিকা লাল। বয়স ৩৪। সেলিব্রেটি বারমেইড হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি সেখানে।

ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসার দশা। সুন্দর, সমৃদ্ধ জীবনের আড়াল থেকে প্রকাশ্যে চলে আসে কুৎসিত কিছু চরিত্র।

বলা হয়ে থাকে, দিল্লিতে দুটো জিনিসের কোনও অভাব নেই–টাকা আর একঘেয়েমি। ট্যামারিণ্ড কোর্টের স্বত্বাধিকারী, ফ্যাশন ডিজাইনার মালিনী রমানি এ কারণেই বলেছেন, 'এ শহরে যাবার কোনও জায়গা নেই। বুধবার আমার জন্য লাকি, তাই বুধবারকে *ফান* ডে ঘোষণা দিয়ে পার্টির আয়োজন করি। এটা ছিল সবার জন্যই উন্মুক্ত।'

এই 'সবাই'-এর মধ্যে কেবল পকেটভারী লোকেরাই ছিল। হাজির হয়েছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার রোহিত বল, রিনা ঢাকা আর তরুণ তাহিলিয়ানি। এই ত্রিমূর্তিকে ছাড়া দিল্লির কোনও পার্টিই সম্পূর্ণ হয় না। আরও ছিলেন নামিদামি আর্ট ডিলার, ধনী ব্যবসায়ী, হলিউড স্টার স্টিভেন সেগাল, প্রাক্তন মন্ত্রী কমল নাথের ছেলে নকুল–এঁরা। এমনকী পুলিসের জয়েন্ট কমিশনার এস. দ্বারওয়ালও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

দারুণ জমেছিল পার্টিটা। উদ্দাম নাচ-গানে মেতে উঠেছিল প্রায় প্রত্যেকে।

বারের পিছনে বসে ড্রিঙ্ক-কুপন বিক্রি করছিলেন জেসিকা। কোমরে-গিঁট-দেয়া সাদা শার্ট আর ডেনিম শর্টস পরনে। সাবেক মন্ত্রী বিনোদ শর্মার ছেলে, ২৪ বছর বয়সী মনু শর্মা এসেছিল রাত দশটার দিকে। সঙ্গে তিন বন্ধু। প্রচুর মদ্যপান করে চার মূর্তি।

প্রচণ্ড ভিড় থাকার দরুন রাত দুটোর দিকে মদের স্টক ফুরিয়ে গিয়েছিল। মনু জেসিকার কাছে গিয়ে মদ চাইলে অপারগতা জানান তিনি। দাম হিসেবে তখন এক হাজার রুপি অফার করে মন্ত্রীপুত্র।

ওই সময় ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মালিনী। মনুর কথা শুনে জবাব দিলেন তিনি: 'লাখ টাকা দিলেও এক চুমুক মদ মিলবে না এখন।'

নেশাগ্রস্ত মনু তখন জেসিকার দিকে তাকায়। অশ্লীল ভঙ্গিতে বলে, 'ক্যান আই হ্যাভ আ সিপ অভ ইউ?'

কথাটা বলেই .২২ ক্যালিবার পিস্তল বের করে দুটো গুলি করে পর-পর। প্রথমটা সিলিং-এ, দ্বিতীয়টা জেসিকার মাথা লক্ষ্য করে।

মালিনীর মা বীণা মনুর কলার চেপে ধরলেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় হত্যাকারী। পরে আত্মসমর্পণ করে হিমাচল প্রদেশে।

তদন্তের সময় সব কিছু অস্বীকার করে মনু। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ? এখানেই শুরু হয় ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড়। যে-বীণা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আটকাতে চেষ্টা করেছিলেন অপরাধীকে, তাঁরই বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে আলামত নষ্টের। পুলিস আসার আগেই মেঝেতে পড়া রক্ত ধুয়ে ফেলেছিল বারের কর্মচারীরা। এ ব্যাপারে সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন বীণা, প্রতিদিন যেভাবে সব কিছু পরিষ্কার করে রেস্তোরাঁ বন্ধ করা হয়, সেদিনও তা-ই হয়েছে।

মনু আর তার তিন বন্ধু সম্পর্কেও বীণার কথাবার্তা রহস্যময়। মালিনীর বাবা ঘাতকের টাটা সাফারির নম্বর দিয়েছেন পুলিসকে, অথচ বীণা বলছেন, রেস্তোরাঁর নিয়মিত খদ্দের এই চার যুবককে তিনি নাকি চেনেনই না।

এসব অসহযোগিতার কারণে বিচারকাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে বার-বার। অন্য দিকে আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া তো ছিলই।

ফলো-আপ

১৯৯৯ সালে হয়েছিল খুনটা। দীর্ঘ সাত বছর পর, ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয় মনু শর্মা। দণ্ডিত হয় আমৃত্যু কারাদণ্ডে। ■

৭/৫/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
অনুবাদ
রবার্ট ই. হাওয়ার্ড-এর
কোনান দ্য সিমেরিয়ান
রূপান্তর: ডিউক জন

কে এই কোনান? পরোপকারী এক স্বাধীন বীর। কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়। তবে ওর প্রতিবাদের ধরনটা বুনো। কোমল আচরণের কোনও বালাই নেই সিমেরিয়ান যুবকটির মাঝে। কোনানের সাফ কথা: যা ওর ভালো মনে হবে, তা-ই করবে সে। পথে যদি কোনও বাধা এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে উপড়ে ফেলবে। আসুন, এই আদিম, *বর্বর* যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হই। ঘুরে আসি সমৃদ্ধ অতীতের বিস্মৃত সব জনপদ থেকে।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রহস্য উপন্যাসিকা

এরকুল পোয়ারোর কাহিনি

স্বপ্নবৃত্তান্ত

মূল ▮ আগাথা ক্রিস্টি

রূপান্তর ▮ ইসমাইল আরমান

প্রশংসার দৃষ্টিতে বিশাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন এরকুল পোয়ারো। চোখ বুলিয়ে আশপাশটাও দেখে নিলেন একই সঙ্গে। বেশ কিছু দোকান দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে। ডানদিকে একটা বড় ফ্যাক্টরি বিল্ডিং। উল্টোদিকে রয়েছে কিছু সস্তাদরের ফ্ল্যাটবাড়ি। ঘুরে ফিরে আবারও তাঁর দৃষ্টি প্রাসাদোপম নর্থওয়ে হাউসের উপর গিয়ে পড়ল। পুরনো আমলের বনেদি বাড়ি। সে-আমলে সবুজ প্রান্তর ঘিরে রাখত অহঙ্কারী ইমারতটাকে। ধীরে, মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলত সময়। মানুষের হাতেও ছিল অফুরন্ত অবকাশ। কিন্তু আজ বাড়িটা বিবর্ণ, বিস্মৃত। আধুনিক লণ্ডনের মাঝে এর অস্তিত্ব লোকে ভুলতে বসেছে। ঠিকানা বলতে পারে, এমন মানুষ খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু তা-ই নয়, বাড়ির মালিকের নামও তারা জানে কি না সন্দেহ।

যায়, রঙ-বেরঙের বিভিন্ন কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি যে ড্রেসিং গাউনটা তিনি সচরাচর ব্যবহার করেন, সেটা নাকি আটাশ বছরের পুরনো। বাঁধাকপির সুপ আর ক্যাভিয়ার ছাড়া কিছুই নাকি তাঁর মুখে রোচে না। বেড়াল প্রজাতির প্রতি রয়েছে তাঁর তীব্র ঘৃণা। আর সবার মত পোয়ারোও এসব কেচ্ছা-কাহিনি শুনেছেন। এবং সত্যি বলতে কী, যে-মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন, ওঁর বিষয়ে এটুকুই তাঁর জ্ঞানের দৌড়। পকেটে যে-চিঠিটা রয়েছে, তাতে একটা বাড়তি কথাও লেখা নেই।

প্রাচীন বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো, তারপর সিঁড়ি ধরে উঠে এলেন সদর দরজার সামনে। বেল বাজালেন। চকিতে কবজিতে বাঁধা হাতঘড়িটায় চোখও বুলিয়ে নিলেন। ন'টা ত্রিশ বাজে। তারমানে একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন।

ঠিক তিনটা আটাশে... টেবিলের ড্রয়ার খুলে আমি আমার গুলিভরা রিভলভার বের করি। তারপর রিভলভারের নলটা কপালের পাশে ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপি আমি... আত্মহত্যা করি!

এমনটা হবার কিন্তু কথা নয়, কারণ বাড়ির মালিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। তবে টাকা যেমন মানুষকে পরিচিতি এনে দেয়, ঠিক তেমনি কেউ যদি গোপনীয়তা চায়, তো সেটাও টাকার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব। খেয়ালি ধনকুবের বেনেডিক্ট ফার্লি দ্বিতীয় দলে পড়েন। লোকচক্ষুর সামনে তিনি সচরাচর বেরোন না। বেরোন শুধু কোম্পানির বোর্ড মিটিঙে অংশ নিতে হলে। আর তখন তাঁর একহারা শীর্ণ দেহ, তীক্ষ্ণ চেহারা আর বাজখাঁই গলার সামনে বোর্ডের সদস্যরা কেঁচোর মত গুটিয়ে যায়।

সত্যিকার এক রহস্যমানব এই বেনেডিক্ট ফার্লি। যেন কিংবদন্তির কোনও চরিত্র। মানুষের মুখে মুখে ফেরে তাঁকে নিয়ে বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য হাজারো কাহিনি। কোনোটায় তিনি হৃদয়হীন পাষাণ, আবার কোনোটায় বদান্যতার পাহাড়। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর আচার-আচরণ আর পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মুখরোচক গল্প। শোনা

খানিক পরেই খুলে গেল দরজা। দেখা গেল ধোপদুরস্ত এক বাটলারকে।

সৌজন্য দেখিয়ে পোয়ারো বললেন, 'মি. বেনেডিক্ট ফার্লির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, স্যর?' পরিশীলিত কণ্ঠে জানতে চাইল বাটলার।

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম, স্যর?'

'এরকুল পোয়ারো।'

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল বাটলার। তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঢুকতে দিল অতিথিকে। পোয়ারো ভিতরে ঢুকলে আবার নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল দরজাটা। কাছে এসে টুপি, ছড়ি আর ওভারকোট নিতে নিতে বলল, 'মাফ করবেন, স্যর, আপনার কাছে একটা চিঠি থাকবার কথা...'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিলেন

পোয়ারো। বাটলার সেটা উল্টেপাল্টে দেখে আবার ফিরিয়ে দিল তাঁর হাতে। সাধারণ এক চিঠি। বক্তব্য খুব পরিষ্কার।

নর্থওয়ে হাউস, ডব্লিউ ৮
মসিয়ো এরকুল পোয়ারো,
মহাত্মন,
মি. বেনেডিক্ট ফার্লি একটি জরুরি বিষয়ে আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করছেন। যদি কোনও অসুবিধা বোধ না করেন তো, আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ন'টায় উপরের ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন।
আপনার বিশ্বস্ত,
হিউগো কর্নওয়ার্দি
(সেক্রেটারি)
পুনশ্চ: অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা সঙ্গে আনবেন।

ইতিমধ্যে ছড়ি, টুপি আর ওভারকোট নিয়ে নিয়েছে বাটলার। সসম্ভ্রমে বলল, 'আসুন, স্যর, মি. কর্নওয়ার্দির অফিসে আপনাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাকে।'

বাটলারের পিছু পিছু প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলেন পোয়ারো। অভিভূত হচ্ছেন চারদিকে তাকিয়ে। মূল্যবান শিল্পকর্মের বিপুল সমাবেশ দেখতে পাচ্ছেন বাড়িতে। তিনি নিজেও একজন শিল্প-অনুরাগী।

দোতলার একটা কামরার দরজায় টোকা দিল বাটলার। ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না—অভিজাত কোনও বাটলার এভাবে দরজায় টোকা দেয় না।

ঘরের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে এল। দরজা খুলে ধরল বাটলার। ঘোষণা করল পোয়ারোর আগমনবার্তা।

'যে-ভদ্রলোকের জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন, তিনি এসে গেছেন, স্যর।'

আরেক দফা ভ্রূকুটি করলেন পোয়ারো। কামরায় ঢুকলেন খুঁতখুঁতানি নিয়ে। বেশ বড়সড় একটা কামরা, তবে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। ফাইলিং কেবিনেট, রেফারেন্স বইপত্রে বোঝাই শেলফ, একটা প্রমাণ সাইজের ডেস্ক আর গোটা দুই চেয়ার... ব্যস, এ-ই। ভিতরটা ছায়ায় ঢাকা। আলো বলতে একটা ডেস্ক-ল্যাম্প জ্বলছে। বালবটা এতই শক্তিশালী যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

চোখ পিট পিট করলেন পোয়ারো। আলোর পিছনে, ডেস্কের ওপাশে, আর্মচেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছেন একজন শীর্ণদেহী বৃদ্ধ। চেহারা ভাল করে না দেখা গেলেও গায়ের রঙ-বেরঙের বিখ্যাত গাউন থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর পরিচয়—বেনেডিক্ট ফার্লি। মাথাটা গর্বিত ভঙ্গিমায় উঁচু করা, নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মত তীক্ষ্ণ। কপালের উপর পড়ে আছে এক গোছা সাদা চুল। চোখে চশমা। পুরু লেন্সের পিছন থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বোলালেন নবাগতের দিকে।

'হুম,' হঠাৎ কথা বললেন ফার্লি; কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও খসখসে, একটু যেন জড়ানো। 'তা হলে আপনিই এরকুল পোয়ারো?'

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন পোয়ারো। 'জী। আমিই পোয়ারো।'

'বসুন, বসুন,' বললেন বৃদ্ধ। তবে তাতে সৌজন্যের আভাস পাওয়া গেল না।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন পোয়ারো। টেবিল ল্যাম্পের তীব্র আলো এখন ভালমতই তাঁর চোখে এসে পড়ছে। ফার্লির অবয়ব ছাড়া আর কিছু বোঝা কঠিন। তবে অনুমান করলেন, বৃদ্ধ কোটিপতি তাঁকে চোখ দিয়ে মাপছেন।

'আচ্ছা,' আচমকা বললেন ফার্লি, 'আপনিই যে এরকুল পোয়ারো, তার নিশ্চয়তা কী?'

পকেট থেকে চিঠিটা আবারও বের করলেন পোয়ারো, এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধের দিকে।

'হ্যাঁ, এবার নিশ্চিন্ত হলাম,' মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। 'এই চিঠি আমিই কর্নওয়ার্দিকে লিখতে বলেছিলাম।' চিঠিটা ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিলেন পোয়ারোকে। 'তা হলে আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা?'

মৃদু হাসলেন পোয়ারো। 'বিখ্যাত কি না জানি না, তবে আমি গোয়েন্দাই বটে। আমার নামটাও এরকুল পোয়ারো।'

'কথাটা কোনও ভুয়া লোক এলেও বলবে,' বিরক্ত গলায় বললেন ফার্লি। পরমুহূর্তে সামলালেন নিজেকে। 'কী, আমাকে খুব সন্দেহপ্রবণ বলে মনে হচ্ছে বুঝি? তাতে ক্ষতি নেই, আমি সত্যিই সন্দেহপ্রবণ। কাউকে বিশ্বাস করি না। ধনী লোকরা কাউকে সহজে বিশ্বাস করেও না। করলে ধনী হওয়া সম্ভব নয়।'

তাঁকে বাধা দিলেন পোয়ারো। 'কেন ডেকেছেন, সেটা জানতে পারি?'

একটু থমকালেন বৃদ্ধ। 'অবশ্যই, অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'বলব বলেই তো ডেকেছি। আসল কথা কী, জানেন? আমি সব সময় সেরা জিনিসটা চাই। সে মানুষ হোক, বা কোনও জড় বস্তু। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমি আপনার ফি জানতে চাইনি? চাইবও না। কাজ শেষে শুধু বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। যত চড়া পারিশ্রমিকই চান, সেটা পরিশোধ করা হবে। সেরা লোকের জন্য সেরা পারিশ্রমিক দিতে আপত্তি নেই আমার। তাই বলে ভাববেন না যে দরাদরি করতে পারি না। না, স্যর, কাঁচাবাজারে গেলে সবজি কেনার সময় ঠিকই দামাদামি করব আমি। দোকানদার যা চাইবে, তা দিয়ে আসব না।'

অপ্রয়োজনীয় কথা বলছেন ভদ্রলোক, কিন্তু তাতে বাদ সাধলেন না পোয়ারো, শুধু ঘাড়টা একদিকে সামান্য কাত করে নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে গেলেন। কিন্তু মনে মনে একটু হলেও হতাশ হয়েছেন। কীসের জন্য, সেটা ঠিক বলতে পারবেন না... তবে বুঝতে পারছেন যে, কল্পনার তুলিতে বেনেডিক্ট ফার্লির যে-ছবি এঁকেছিলেন, এই বৃদ্ধ সেটার প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। লোকটাকে বাচাল এবং নিতান্তই নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক কোটিপতিকে দেখেছেন পোয়ারো, তাঁদের অনেকেই পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন; কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের ভিতরেই কোনও না কোনও ধরনের প্রাণশক্তি লক্ষ করেছেন তিনি... দেখেছেন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগাবার মত ব্যক্তিত্ব। তালি মারা গাউন যদি তাঁরা পরেন, তো সেটার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ থাকবে। কিন্তু ফার্লির গাউনটাকে নাটকের পোশাক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না তিনি। লোকটার পুরো আচার-আচরণেই এক ধরনের নাটুকেপনা রয়েছে। এটাই তাঁর স্বাভাবিক আচরণ কি না বোঝা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পোয়ারো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন ডেকেছেন আমাকে, সেটা কি এবার খুলে বলা যায়?'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বৃদ্ধ কোটিপতির হাব-ভাব। সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। খাদে নেমে এল কণ্ঠস্বর। 'সমস্যাটা জটিল। হয় ডাক্তার, নয়তো গোয়েন্দার কাছে যেতে হবে আমাকে। ভাবলাম সেরা গোয়েন্দাকেই ডেকে আনি।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বুঝবেন কী করে?' একটু যেন রেগে গেলেন বৃদ্ধ। 'এখনও তো বলতেই শুরু করিনি।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। হুট করে এমন একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, যেটা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'মসিয়ো পোয়ারো, স্বপ্ন সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

'স্বপ্ন?' অবাক হলেন পোয়ারো। 'কীসের স্বপ্ন?'

'কাব্যিক নয়, আক্ষরিক অর্থে স্বপ্নের কথা বলছি। ঘুমালে যেটা দেখে মানুষ।'

হকচকিয়ে গেলেন পোয়ারো। এই ধরনের প্রশ্ন আশা করেননি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যদি স্বপ্ন সম্পর্কেই জানতে চান তো নেপোলিয়নের বুক অভ ড্রিমস্ বইটা পড়ে দেখতে পারেন... কিংবা চলে যেতে পারেন হার্লি স্ট্রিটের কোনও আধুনিক সাইকোলজিস্টের কাছে।'

'দুটোই চেষ্টা করে দেখেছি, লাভ হয়নি,' শান্ত গলায় বললেন ফার্লি। বিরতি নিলেন একটু। এরপর যখন মুখ খুললেন, ফিসফিসানি থেকে ধীরে ধীরে চড়া হলো তাঁর কণ্ঠ। 'একই স্বপ্ন দেখছি আমি... রাতের পর রাত। ভয়ে শুকিয়ে আসছে বুক। হ্যাঁ, মসিয়ো পোয়ারো, ভয় পাচ্ছি আমি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী

জানেন, দৃশ্যগুলো হুবহু সেই একই রকম থাকে। এই ঘরের পাশের কামরায় আমি আমার নিজের চেয়ারে বসে আছি। ডেস্কের উপরে ঝুঁকে পড়ে লিখছি কিছু। সামনে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালে দেখি, কাঁটায় কাঁটায় তিনটা বেজে আটাশ। কখনও তার এক চুল নড়চড় হয় না।' ঢোক গিললেন বৃদ্ধ। 'ঘড়ির দিকে তাকাবার পরেই মনের ভিতরে জেগে ওঠে একটা তীব্র ইচ্ছা। জঘন্য... বিশ্রী ইচ্ছা... কিন্তু সেটা না করে আমার উপায় নেই। করতেই হবে...'

থেমে গেলেন ফার্লি। কাঁপছেন।

নির্বিকার রইলেন পোয়ারো। জানতে চাইলেন, 'কী সেই ইচ্ছা?'

খসখসে গলায় ফার্লি বললেন, 'ঠিক তিনটা আটাশে... টেবিলের ডানদিকে, দ্বিতীয় ড্রয়ার খুলে আমি আমার গুলিভরা রিভলভারটা বের করি। ওটা নিয়ে হেঁটে চলে যাই জানালার পাশে। তারপর... তারপর...'

'বলে যান, তারপর কী ঘটে?'

ফিসফিস করে উঠলেন বৃদ্ধ, 'রিভলভারের নলটা কপালের পাশে ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপি আমি... আত্মহত্যা করি!'

থমথমে নীরবতা নেমে এল কামরায়।

খানিক অপেক্ষা করে পোয়ারো বললেন, 'এটাই আপনার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ।'

'হুবহু এসবই প্রতি রাতে দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর কী ঘটে?'

'আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি জেগে উঠি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'ওই বিশেষ ড্রয়ারটায় সত্যিই কি আপনি রিভলভার রাখেন?'

'হ্যাঁ, রাখি,' সায় জানালেন ফার্লি।

'কেন রাখেন?'

'সতর্কতার জন্য। আমি সবসময় বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি থাকি।'

'কীসের বিপদ?'

বিরক্ত হলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'টাকাঅলা লোকের অনেক রকম শত্রু থাকে, মসিয়ো। আমারও আছে।'

এ-নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না পোয়ারো। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু আমাকে ঠিক কী কারণে ডেকে পাঠিয়েছেন আপনি? আমি তো স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞ নই।'

'ধৈর্য ধরুন, সবই বলব। প্রথমেই জেনে রাখুন, আপনাকে ডাকার আগে আমি ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি... তাও একজন নয়, তিন-তিনজন নামকরা ডাক্তার!'

'হুম। কী বলেছেন তাঁরা?'

'প্রথমজন বললেন, হজমের গোলমালে এসব হচ্ছে। ডায়েট বদলাতে হবে। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দ্বিতীয়জনের বয়স বেশি নয়, এখনও যুবকই বলা চলে। তার চিকিৎসা-পদ্ধতি একেবারে আধুনিক। তার ধারণা, ছোটবেলার কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাই বর্তমানের এই দুঃস্বপ্নটার উৎস। এবং সেই বিশেষ ঘটনাটাও ঠিক তিনটা বেজে আটাশ মিনিটে ঘটেছিল। আমার অবচেতন মন নাকি ঘটনাটা চাপা দেবার জন্য এতই মরিয়া যে, স্বপ্নে আমাকে দিয়ে আত্মহত্যা করাচ্ছে।'

'আর তৃতীয়জনের কী বক্তব্য?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

ফার্লি এবার রীতিমত খেপে গেলেন। বললেন, 'ওই ছাগলটার কথা আর বলবেন না। আজগুবি এক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বলছে, আমার জীবন নাকি এমন এক দুর্বিষহ মোড়ে এসে পৌঁছেছে যে, আমি মনে মনে নিজের মৃত্যুকামনা করছি! এটা কোনও কথা হলো? আমি কি ব্যর্থ মানুষ? কেন নিজের জীবনকে দুর্বিষহ ভাবব?'

'তার মানে... ওই ডাক্তার বলতে চাইছে যে, আপনি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে চান?'

'ছাগল কি আর এমনি এমনি বলছি? আমি সম্পূর্ণ সুখী একজন মানুষ। জীবনে যা চেয়েছি, তা-ই পেয়েছি। টাকা-পয়সা বলুন, বা প্রভাব-

প্রতিপত্তি... কোনোকিছুরই অভাব নেই। আমি কেন আত্মহত্যা করতে চাইব?'

গম্ভীর চোখে বৃদ্ধকে দেখলেন পোয়ারো। গলায় যতই দৃঢ়তা ফোটান, কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সত্যিই কি তিনি সুখী?

'এখানে আমার ভূমিকা কোথায়, মসিয়ো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

নিজেকে সংযত করলেন ফার্লি। ডেস্কের উপর টোকা দিলেন আঙুল দিয়ে। বললেন, 'এর আরেকটা ব্যাখ্যা আছে। আর সেটা যদি সঠিক হয়, তো আপনিই পারবেন প্রমাণ করতে, মসিয়ো পোয়ারো। আপনার দক্ষতার খবর আমার কানে এসেছে। অসংখ্য কেসের সমাধান করেছেন—দুর্দান্ত, অবিশ্বাস্য সব কেস। আপনিই পারবেন বের করতে!'

'কী বের করব?'

'ধরুন কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে। তার পক্ষে কি এভাবে কাজটা সমাধা করা সম্ভব? সে কি আমাকে রাতের পর রাত এই একই স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করতে পারে?'

'মানে, সম্মোহন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

জবাব দেবার আগে ভেবে নিলেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করাই ভাল।'

'কেন, আপনি কখনও এ-ধরনের কোনও কেস পাননি?'

'না, ঠিক এ-ধরনের কোনও ঘটনার কথা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু আমার সন্দেহটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন? কৌশলে একই দুঃস্বপ্ন বার বার দেখানো হচ্ছে আমাকে, যাতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে আমি আত্মহত্যা করে বসি।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'আপনি কি বলতে চাইছেন এটা অসম্ভব?' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ফার্লি।

'একেবারে অসম্ভব আমি বলতে চাই না, তবে...'

'সম্ভাবনা খুবই কম, এই তো?'

'হ্যাঁ, বাস্তব সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।'

'ডাক্তারও একই কথা বলেছে,' বিড়বিড় করলেন ফার্লি। 'কিন্তু প্রতিদিন কেন ওই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছি আমি? কেন?'

পোয়ারো কোনও কথা বললেন না। শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

ফার্লি শেষবারের মত জানতে চাইলেন, 'আপনি কি নিশ্চিত যে, এ-ধরনের কোনও ঘটনার মুখোমুখি হননি?'

'পুরোপুরি, মসিয়ো,' বললেন পোয়ারো।

'হুম। এটাই আমার জানা দরকার ছিল।'

সাবধানে গলা খাঁকারি দিলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। বলুন কী জানতে চান।'

'ঠিক কাকে সন্দেহ করছেন আপনি? কে আপনাকে খুন করতে চায় বলে ভাবছেন?'

থতমত খেয়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'না, না... আমি কাউকে সন্দেহ করছি না। আমাকে আবার কে খুন করবে?'

'কিন্তু এইমাত্রই তো খুনের কথা বললেন!'

'খুনের কথা বলিনি। ও-রকম কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, জানতে চেয়েছি।'

'আমার অভিজ্ঞতায় সেটা প্রায় অসম্ভবই মনে হয়,' পোয়ারো বললেন। 'কিন্তু জানা দরকার, কেউ কোনোদিন আপনাকে সম্মোহিত করেছিল কি না।'

'কী যে বলেন না!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল ফার্লির গলায়। 'সম্মোহন... আর আমি? ওসবে আমি বিশ্বাসই করি না!'

'তা হলে তো বলতেই হচ্ছে, আপনার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন... অবাস্তব।'

'কিন্তু... কিন্তু স্বপ্নটা তো সত্যি!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। আর সেটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। অল্প থেমে আবার বললেন, 'স্বপ্নের বাস্তব অংশটা আমি একবার নিজ চোখে দেখতে চাই। আপনার

সেই কামরা, টেবিল, ঘড়ি আর রিভলভারটা।'

'নিশ্চয়ই। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। পাশের কামরাটাই আমার।'

গাউনটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ফার্লি। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে যেন নিরস্ত করলেন নিজেকে। বললেন, 'না, থাক। ওখানে দেখার কিছুই নেই। যা দেখবেন, তার সবই আপনাকে জানিয়েছি আমি।'

'কিন্তু আমি একবার নিজের চোখে দেখে নিলে...' বলতে চাইলেন পোয়ারো।

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' তাঁকে থামিয়ে দিলেন ফার্লি। 'আপনি তো নিজের মতামত জানিয়েই দিয়েছেন। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'আপনার যা অভিরুচি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। 'আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারলাম না বলে আমি খুবই দুঃখিত, মি. ফার্লি।'

সৌজন্যের ধার ধারলেন না বৃদ্ধ। কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'এখানে যেসব কথা হলো, তা গোপন রাখবেন। আমি চাই না কেউ এ-নিয়ে ফুসুর-ফাসুর করুক। আপনাকে সমস্যাটা বলা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তার কোনও সমাধান দিতে পারেননি... ব্যস, ঘটনা এটুকুই। কনসাল্টেশন বাবদ যদি কোনও ফি পাওনা হয়, তো বিল পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে?'

'পাঠাব,' শুষ্ক গলায় বললেন পোয়ারো। উল্টো ঘুরে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

'দাঁড়ান!' পিছন থেকে ডাক দিলেন ফার্লি। 'চিঠিটা ফেরত দিয়ে যান।'

'কোন্ চিঠি? আপনার সেক্রেটারি যেটা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওটাই। ওটার আর প্রয়োজন নেই আপনার।'

আবারও ভ্রূকুটি করলেন পোয়ারো। তবে কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে বের করে দিলেন চিঠিটা। ভদ্রলোক ওটা হাতে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর রেখে দিলেন টেবিলের উপর।

বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোলেন পোয়ারো। যে-গল্প তাঁকে শোনানো হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবছেন। কোথায় যেন একটা গড়বড় আছে। দরজার হাতল ধরতেই মনে পড়ল সেটা। ভুল করেছেন তিনি। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'মাফ করবেন, মি. ফার্লি,' বললেন পোয়ারো। 'অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল করে ফেলেছি। আসলে... আপনার ওই অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা ভাবতে গিয়েই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। আপনি যখন চিঠিটা ফেরত চাইলেন, তখন আমি অন্যমনস্ক হয়ে বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার চিঠিটা ছিল ডান পকেটে...'

'মানে কী?' খেঁকিয়ে উঠলেন ফার্লি। 'কী বলতে চান আপনি?'

'যে-চিঠিটা আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, সেটা অন্য চিঠি। শার্টের রঙ জ্বালিয়ে ফেলেছে বলে ক্ষমা চেয়ে আমাকে ওই চিঠিটা পাঠিয়েছিল লণ্ড্রির মালিক।' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন পোয়ারো। কোটের ডান পকেট থেকে বের করলেন আরেকটা চিঠি। 'আপনার চিঠি আসলে এটা।'

'এত বেখেয়াল থাকেন কেন?' গজগজ করে উঠলেন ফার্লি।

ক্ষমা চেয়ে আসল চিঠিটা টেবিলে রাখলেন পোয়ারো। তুলে নিলেন অন্যটা।

'আসি,' বলে বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে।

বাইরের ল্যাণ্ডিঙে এসে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন পোয়ারো। জায়গাটা প্রশস্ত। অপেক্ষাগারের মত একটা অংশ রয়েছে—টেবিলের উপর পত্রিকার স্তূপ, ফুলদানি; দু'পাশে দুটো আর্মচেয়ার। যেন কোনও ডেন্টিস্টের ওয়েটিং রুম।

সিঁড়ি ধরে নিচের হলঘরে নামতেই বাটলারের দেখা পেলেন। তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে সে।

'আপনাকে ট্যাক্সি ডেকে দেব, স্যর?'

'না, ধন্যবাদ। রাতটা চমৎকার। হাঁটতেই ভাল লাগবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। ব্যস্ত রাস্তা পার হবার জন্য পেভমেন্টের ধারে দাঁড়ালেন একটু। মাথায় চিন্তার ঝড়। কপালে ভাঁজ পড়ে আছে।

'নাহ্,' আপনমনে বললেন তিনি। 'কিছুই বুঝতে পারছি না। অর্থ পাচ্ছি না কোনোকিছুর। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই... আমি, এরকুল পোয়ারো... এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত।'

ওটা ছিল নাটকের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত ঘটল সপ্তাহখানেক পরে। আর সেটা শুরু হলো ডাক্তার জন স্টিলিংফ্লিটের টেলিফোন দিয়ে।

পোয়ারোই ধরলেন ফোনটা। ওপাশ থেকে ভেসে এল তাঁর পুরনো বন্ধুর দুষ্টুমিমাখা কণ্ঠ।

'কে... পোয়ারো নাকি? স্টিলিংফ্লিট বলছি, বুড়ো খোকা।'

'হ্যাঁ, বন্ধু,' হাসলেন পোয়ারো। 'কী খবর?'

'খবর মানে... খুবই খারাপ খবর। আমি এখন নর্থওয়ে হাউসে। কোথায়, বুঝতে পারছ তো? বেনেডিক্ট ফার্লির বাড়িতে।'

'তা-ই?' চঞ্চল হয়ে উঠলেন পোয়ারো। 'কী হয়েছে?'

'ফার্লি মারা গেছেন। আত্মহত্যা। আজ দুপুরে নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

'খুব একটা অবাক হয়েছ বলে মনে হচ্ছে না,' বললেন স্টিলিংফ্লিট। 'তুমি কি কিছু জানো এ-ব্যাপারে?'

'এমনটা ভাবছ কেন?'

'তার জন্য অন্তর্যামী হতে হয় না, বুড়ো খোকা। এখানে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। সপ্তাহখানেক আগে ফার্লির সঙ্গে দেখা করেছ তুমি।'

'আচ্ছা!'

'এদিককার অবস্থা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ। এমন নামকরা এক কোটিপতি মারা গেলে কী হতে পারে? পুলিশের এক ইন্সপেক্টর এসেছে, সে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তাই ভাবলাম, তুমি যদি ঘটনার উপর একটু আলোকপাত করতে পারো। একবার ঘুরে যাবে নাকি এদিকটায়?'

'আমি এখুনি আসছি।'

'শুনে খুশি হলাম, বুড়ো খোকা। নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোনও প্যাঁচ আছে, তাই না?'

'সাক্ষাতে কথা হবে।'

'টেলিফোনে বেশি কিছু বলতে চাইছ না বুঝি? বেশ, তা হলে চলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।'

ট্যাক্সি নিয়ে মিনিট পনেরো পরেই নর্থওয়ে হাউসে পৌঁছুলেন পোয়ারো। নিচতলার পিছনদিকে, লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। একে একে সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। ডা. স্টিলিংফ্লিট ছাড়াও কামরায় উপস্থিত রয়েছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর বার্নেট, মি. ফার্লির স্ত্রী মিসেস লুইস ফার্লি, তাঁর একমাত্র কন্যা জোয়ানা ফার্লি এবং সেক্রেটারি হিউগো কর্নওয়ার্দি।

বেনেডিক্ট ফার্লির চেয়ে তাঁর স্ত্রীর বয়স অনেক কম। প্রায় যুবতীই বলা চলে। যথেষ্ট সুন্দরী। মাথাভরা কালো চুল। চেহারায় এক ধরনের রুক্ষতা রয়েছে, চোখদুটো শীতল। মনের ভিতরে কী ভাব খেলে বেড়াচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। অন্তর্মুখী বলে মনে হলো তাঁকে। সে-তুলনায় জোয়ানা ফার্লি বেশ চটপটে। এ-ও সুন্দরী, মাথায় সোনালি চুল। মুখে গুটি গুটি দাগ। নাক আর চোয়ালের গঠন দেখে মনে হলো দুটোই বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ। হিউগো কর্নওয়ার্দি একেবারেই সাদামাঠা এক যুবক। ফিটফাট পোশাক পরেছে। হাবভাবে তাকে বুদ্ধিমান ও কর্মঠ বলে মনে হলো।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে নিজের কাহিনি

খুলে বললেন পোয়ারো। কেন দেখা করতে এসেছিলেন মি. ফার্লির সঙ্গে... কী কথা হয়েছিল... বাদ দিলেন না কিছুই।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' পোয়ারোর কথা শেষ হলে মন্তব্য করল বার্নেট। 'স্বপ্নে নিজেকে আত্মহত্যা করতে দেখা! এ-ব্যাপারে আপনি কিছু জানতেন, মিসেস ফার্লি?'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা। 'স্বপ্নটার কথা আমাকে বলেছিল ও। অস্থিরও হয়ে উঠেছিল। ক্... কিন্তু আমি মোটেই গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম পেটের গোলমাল হয়েছে। ওর খাওয়াদাওয়া একটু অন্য পদের ছিল কি না! আমি ওকে ডা. স্টিলিংফ্লিটের কাছে যেতে বলেছিলাম।'

স্টিলিংফ্লিট মাথা নাড়লেন। 'আমার কাছে আসেননি উনি। পোয়ারোর কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে সরাসরি হার্লি স্ট্রিটে গিয়েছিলেন।'

তাঁর দিকে ঘাড় ফেরালেন পোয়ারো। 'সমস্যাটার ব্যাপারে আমি তোমার ডাক্তারি মতামত শুনতে আগ্রহী, জন। ফার্লি বলেছিলেন, তিনি তিনজন স্পেশালিস্টের কাছে গেছেন। ওদের থিয়োরিগুলো কতটা বাস্তবসম্মত?'

শ্রাগ করলেন স্টিলিংফ্লিট। 'বলা কঠিন। এটাও মনে রাখতে হবে যে, ফার্লি যা বলেছেন, সেটা হয়তো বিশেষজ্ঞদের হুবহু বক্তব্য নয়। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের কথাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, ডাক্তারদের কথা ফার্লি বুঝতেই পারেননি?'

'ঠিক তা নয়। তবে ডাক্তাররা যদি মেডিক্যাল টার্মে কথা বলে থাকেন, মি. ফার্লির কাছে সেটার অর্থ একটু এদিক-সেদিক হয়ে যেতেই পারে।'

'তা হলে কি ধরে নেব, ডাক্তারদের মতামত আর মি. ফার্লির বক্তব্যের মাঝে বিস্তর ফারাক আছে?'

'বিস্তর না হলেও, কিছুটা ফারাক থাকাই স্বাভাবিক।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেলেন পোয়ারো। 'কোন্ তিনজন ডাক্তার দেখেছেন মি. ফার্লিকে, তা কি জানেন আপনারা?'

মিসেস ফার্লি নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

জোয়ানা বলল, 'বাবা যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, এটাই তো জানতাম না আমরা।'

'আপনাকে কি উনি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'না,' জোয়ানা বলল।

'আর আপনাকে, মি. কর্নওয়ার্দি?'

'না, আমাকেও কিছু বলেননি,' বলল হিউগো। 'আমি শুধু তাঁর নির্দেশে আপনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কেন দেখা করতে চাইছেন, তার কিছুই জানতাম না। ভেবেছিলাম হয়তো ব্যবসায়িক কোনও সমস্যার তদন্ত করাতে চাইছেন।'

পোয়ারো এবার নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। 'বেশ, এখন তা হলে আজকের ঘটনাটা শোনা যাক।'

মিসেস ফার্লি আর ডা. স্টিলিংফ্লিটের দিকে পালা করে তাকাল বার্নেট, তারপর নিজেই দায়িত্ব নিল ঘটনার বিবরণ দেবার।

'প্রতিদিন দুপুরেই দোতলায় নিজের কামরায় বসে কাজ করতেন মি. ফার্লি। শুনেছি খুব শীঘ্রি নাকি একটা নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছিলেন তিনি...'

'কনসোলিডেটেড কোচলাইন্স্,' তার কথার মাঝখানে বলে উঠল হিউগো। 'নতুন একটা যাত্রী পরিবহন সার্ভিস চালু করতে চাইছিলেন।'

'যা হোক,' কথার খেই ধরল ইন্সপেক্টর, 'ওই ব্যাপারেই আজ অ্যাসোশিয়েটেড নিউজ গ্রুপ আর অ্যামালগ্যামেটেড প্রেস শিটের দু'জন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছিলেন তিনি... গত পাঁচ বছরে এই প্রথম। ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিকই বলতে হবে, সচরাচর পত্রিকাঅলাদের এড়িয়ে চলতেন ফার্লি। যা হোক, আমার তদন্ত থেকে জানতে পেরেছি যে,

সোয়া তিনটায় উপস্থিত হন দুই সাংবাদিক। দোতলার ওয়েটিং এরিয়ায় বসতে দেয়া হয় তাঁদেরকে। ডাক না পড়া পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করার নিয়ম। তিনটা বিশে কনসোলিডেটেড কোচলাইনের অফিস থেকে জরুরি কিছু কাগজপত্র নিয়ে এক বার্তাবাহক আসে। সরাসরি মি. ফার্লির কামরায় ঢুকে কাগজগুলো দিয়ে আসে সে। লোকটাকে বিদায় দেবার সময় কামরার দরজা পর্যন্ত আসেন মি. ফার্লি। ওখান থেকেই পাল্লা ফাঁক করে কথা বলেন অপেক্ষমাণ দুই সাংবাদিকের সঙ্গে।'

'কী বলেছিলেন তিনি?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

হাতের নোটবুক খুলল বার্নেট। পড়ে শোনাল: 'দুঃখিত, জেন্টলমেন, আপনাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। জরুরি একটা কাজ চলে এসেছে। যত তাড়াতাড়ি পারি ওটা শেষ করে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'হুম। তারপর?'

'দুই সাংবাদিক—মি. অ্যাডামস্ আর মি. স্টডার্ট—ফার্লিকে বিনয় দেখিয়ে বললেন যে, কোনও অসুবিধে নেই; যতক্ষণ প্রয়োজন অপেক্ষা করবেন তাঁরা। এ-কথা শুনে ধন্যবাদ জানান মি. ফার্লি। দরজা বন্ধ করে দেন। জীবিত অবস্থায় তখনই তাঁকে শেষবার দেখা গেছে।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। চারটা বাজার খানিক পরে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে আসেন মি. কর্নওয়ার্দি। সাংবাদিকেরা তখনও বসে আছে দেখে অবাক হন তিনি। মি. ফার্লির কাছেই যাচ্ছিলেন কর্নওয়ার্দি, কয়েকটা চিঠিতে সই নেবার জন্য। ভাবলেন, সেই সুযোগে তাঁকে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের কথাও স্মরণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি প্রথমে কাউকে দেখতে পেলেন না। মি. ফার্লির চেয়ারটা খালি পড়ে ছিল। ভালমত তাকাতেই ডেস্কের পিছন থেকে একটা জুতোর ডগা বেরিয়ে থাকতে দেখলেন। সেখানে যেতেই দেখতে পেলেন, মেঝেতে পড়ে আছে মি. ফার্লির প্রাণহীন দেহ, পাশে তাঁর রিভলভার। মি. কর্নওয়ার্দি তখন তাড়াহুড়ো করে কামরা থেকে বেরিয়ে বাটলারকে ডেকে পাঠান, তাকে নির্দেশ দেন ডা. স্টিলিংফ্লিটকে খবর দিতে। পরে ডাক্তারের পরামর্শে পুলিশেও খবর দেয়া হয়।'

'গুলির আওয়াজ কেউ শোনেনি?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'না। ডেস্কটা জানালার পাশে, আর জানালার পাল্লা ছিল খোলা। নিচের রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চলে। হর্ন আর ইঞ্জিনের আওয়াজে সম্ভবত চাপা পড়ে গিয়েছিল।'

ডাক্তারের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'ক'টার সময় মারা গেছেন ফার্লি, সেটা আন্দাজ করতে পারো?'

স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'এখানে পৌঁছেই মৃতদেহ পরীক্ষা করি আমি, তখন বাজে চারটা বত্রিশ। আমার ধারণা, তার অন্তত এক ঘণ্টা আগে মারা গেছেন ফার্লি।'

'তার মানে... যে-সময়টার কথা তিনি বলেছিলেন আমাকে... মানে, তিনটা আটাশেই মারা গিয়ে থাকতে পারেন?'

'খুবই সম্ভব,' সায় দিলেন ডাক্তার।

'রিভলভারে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, মি. ফার্লিরই ছাপ।'

'আর রিভলভারটাও নিশ্চয়ই তাঁর?'

'ঠিকই ধরেছেন,' বলল বার্নেট। 'মিসেস ফার্লি কনফার্ম করেছেন, ওটা মি. ফার্লিরই রিভলভার। ডেস্কের ডান দিকের দ্বিতীয় ড্রয়ারে রাখতেন। সবকিছু ওই স্বপ্নের মতই ঘটেছে। কোনও ভুল নেই। কামরায় ঢোকার দরজা ওই একটাই। বাইরের ল্যাণ্ডিঙে পুরো সময়টাই বসে ছিলেন দুই সাংবাদিক। তাঁরা কসম কেটে বলেছেন, ফার্লি যখন শেষবার তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, আর চারটার পরে যখন কর্নওয়ার্দি ওখানে ঢুকলেন... এর মাঝে আর কেউই ওই কামরায় যায়নি বা বেরিয়ে আসেনি।'

'তা হলে এ-কথা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সত্যিই আত্মহত্যা করেছেন মি. ফার্লি?'

একটু হাসল ইন্সপেক্টর। 'সন্দেহের আসলে

কোনও অবকাশ ছিল না। কিন্তু একটা মাত্র কারণে...'

'কীসের কথা বলছেন?'

'আপনার কাছে লেখা চিঠিটার কথা।'

এবার পোয়ারোও হাসলেন। 'বুঝতে পেরেছি। ঘটনার সঙ্গে যেহেতু আমার যোগাযোগ আছে, আপনারা একে সাধারণ আত্মহত্যা বলে ভাবতে পারছেন না!'

'ঠিক তাই,' শুকনো গলায় বলল বার্নেট। 'এখন আপনি যদি আমাদের সন্দেহটা দূর করে দেন, তা হলেই...'

তাকে বাধা দিলেন পোয়ারো। 'এক মিনিট।' ঘুরলেন মিসেস ফার্লির দিকে। 'আপনার স্বামীকে কেউ কখনও সম্মোহন করেছিল?'

'না তো!' হকচকিয়ে গেলেন মিসেস ফার্লি।

'সম্মোহন বিষয়ে কোনও আগ্রহ ছিল তাঁর? কখনও পড়াশোনা করতে দেখেছেন ওসব নিয়ে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস ফার্লি। 'আমার তো মনে পড়ে না।' পরক্ষণেই আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন তিনি। ভেঙে পড়লেন কান্নায়। 'ওই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটাই এর জন্য দায়ী! রাতের পর রাত ওকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে ওটা... তাড়িয়ে বেড়িয়েছে মৃত্যুর দিকে!'

একই ধরনের কথা মি. ফার্লির মুখেও শুনেছেন, মনে পড়ল পোয়ারোর। তিনি বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস ফার্লি। আচ্ছা, কখনও কি আপনার স্বামীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষ করেছেন?'

'না,' চোখ মুছলেন মিসেস ফার্লি। 'তবে মাঝে মাঝে বেশ অদ্ভুত আচরণ করত ও...'

'বাজে বোকো না তো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জোয়ানা। 'বাবা আর যা-ই করুক, আত্মহত্যা করতে পারেন না। সে-ধরনের মানুষই ছিলেন না তিনি।'

'যারা আত্মহত্যা করে, তারা কখনও বলে-কয়ে করে না, মিস ফার্লি,' বললেন স্টিলিংফ্লিট। 'বললে তো ঠেকানোই যেত।'

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। 'ঘটনাস্থলটা আমি একবার দেখতে চাই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বললেন মিসেস ফার্লি।

স্টিলিংফ্লিট সঙ্গী হলেন পোয়ারোর। দোতলায় মি. ফার্লির ব্যক্তিগত কামরায় গিয়ে ঢুকলেন দু'জনে। আগেরবার সেক্রেটারির কামরা দেখেছেন পোয়ারো, এটা তার চেয়ে অনেক বড়। মেঝেটা পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। শৌখিন ও বিলাসবহুল আসবাবপত্রেরও কোনও অভাব নেই। এক ধারে বার্নিশ করা বিশাল রাইটিং ডেস্ক আর গদিমোড়া চেয়ার।

ডেস্ক পেরিয়ে জানালার কাছে চলে গেলেন পোয়ারো। কার্পেটের গায়ে ফুটে রয়েছে তাজা রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। ফার্লির বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তাঁর: *'ঠিক তিনটা আটাশে... টেবিলের ডানদিকে, দ্বিতীয় ড্রয়ার খুলে আমি আমার গুলিভরা রিভলভারটা বের করি। ওটা নিয়ে হেঁটে চলে যাই জানালার পাশে। তারপর রিভলভারের নলটা কপালের পাশে ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপি আমি...'*

বড় করে শ্বাস নিলেন পোয়ারো। তারপর জানতে চাইলেন, 'জানালাটা কি এভাবেই খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন স্টিলিংফ্লিট। 'তবে এখান দিয়ে কারও পক্ষে ঘরে ঢোকা অসম্ভব।'

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখলেন পোয়ারো। নিচে কোনও কার্নিশ বা প্যারাপেট নেই। নেই কোনও পাইপও। মসৃণ দেয়াল সোজাসুজি নেমে গেছে নিচে। একটা বেড়ালের পক্ষেও এ-দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব নয়। জানালার উল্টোদিকে রয়েছে ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের দেয়াল। সেটাও ন্যাড়া। একটা জানালাও নেই। যেন একটা সীমানা-প্রাচীরের মত রুদ্ধ করে রেখেছে দৃষ্টিসীমা।

স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'ফার্লি যে নিজের জন্য কেন এই কামরাটা বাছলেন, কে জানে। ওই দেয়াল দেখলে তো মনে হয় জেলখানায় আছি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' বললেন পোয়ারো। তারপর ইশারা করলেন ইঁটের দেয়ালটার দিকে। 'তবে আমার ধারণা, এই রহস্যের সঙ্গে দেয়ালটার ভূমিকা আছে।'

বোকা বোকা চোখে তাঁর দিকে তাকালেন স্টিলিংফ্লিট। 'সাইকোলজিক্যাল এফেক্টের কথা বলছ?'

জবাব দিলেন না পোয়ারো। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে একটা চিমটা তুলে নিলেন। লেজি টং বলে এগুলোকে। হাতল এবং মাথার মাঝখানের অংশটা ভাঁজ-করা লোহার পাত দিয়ে তৈরি। ইচ্ছেমত ছোট-বড় করা যায় চিমটার দৈর্ঘ্য। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে পুরোপুরি লম্বা করলেন পোয়ারো। তারপর ওটার সাহায্যে কার্পেটের উপর থেকে একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি ওঠালেন, ফেললেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

'করছটা কী?' বিরক্ত গলায় বললেন স্টিলিংফ্লিট।

'কাজ করে কি না দেখলাম,' বললেন পোয়ারো। জিনিসটা আবার ভাঁজ করে রেখে দিলেন টেবিলের উপরে। 'চমৎকার যন্ত্র!' বলে ফিরলেন বন্ধুর দিকে। 'আচ্ছা, ঘটনার সময় মি. ফার্লির স্ত্রী আর মেয়ে কোথায় ছিল?'

'তিনতলায় নিজের রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মিসেস ফার্লি,' বললেন স্টিলিংফ্লিট। 'আর মিস ফার্লি ছিল চিলেকোঠায়... তার স্টুডিওতে। ছবি আঁকছিল।'

টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে আনমনে টোকা দিলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'মিস ফার্লির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। ওকে কি এখানে ডেকে আনতে পারবে?'

'বেশ, আমি ডাকছি।'

বেরিয়ে গেলেন স্টিলিংফ্লিট। কয়েক মিনিট পরেই জোয়ানা ফার্লি প্রবেশ করল কামরায়।

সৌজন্য দেখিয়ে পোয়ারো বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, মাদমোয়াজেল, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'যা খুশি জিজ্ঞেস করুন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জোয়ানা।

'আপনার বাবা যে তাঁর ডেস্কের মধ্যে একটা গুলি-ভরা রিভলভার রাখতেন, এ খবর কি আপনি জানতেন?'

'না।'

'মিসেস ফার্লিকে দেখে মনে হলো না তিনি আপনার জন্মদাত্রী। সৎ-মা নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল জোয়ানা। 'লুইস আমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার চেয়ে বয়সে মাত্র আট বছরের বড়।'

'হুম। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমি যখন এলাম, তখন আপনাদের কাউকেই দেখিনি। কোথায় ছিলেন আপনারা?'

'বৃহস্পতিবার?' একটু ভাবল জোয়ানা। 'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে... থিয়েটারে গিয়েছিলাম দু'জনেই। একটা নাটক দেখেছি।'

'আপনার বাবা যাননি?'

'নাহ্। নাটকে আগ্রহ ছিল না বাবার। কখনোই যেতেন না।'

'তা হলে একাকী বাড়িতে কী করতেন?'

'পড়াশোনা। এই কামরাতেই বইপত্র নিয়ে সময় কাটাতেন।'

'খুব সামাজিক ছিলেন না বোধহয়?'

পোয়ারোর চোখে চোখ রাখল জোয়ানা।

মাস্টার লাইব্রেরী অ্যাণ্ড স্টেশনারী
প্রোপ্রাইটর: আলহাজ্ব মোঃ নজির আহম্মদ মাস্টার
ব্যাংক রোড, চৌমুহনী
নোয়াখালী।
এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সমস্ত নতুন বই পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৭১২-১৩৭৩২৪, ০১৭১৮-৬২০৬৯২

'এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। বাবা খুব রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না। সামাজিকতা করতে চাইলে তো ঘনিষ্ঠ মানুষ লাগবে, তাই না?'

'কথাটা খুব সরাসরি বলে ফেললেন, মাদমোয়াজেল।'

'আমি আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাতে চাইছি, মসিয়ো পোয়ারো। কী জানতে চাইছেন, সেটা বুঝতে পারছি না। সরাসরি আরও কয়েকটা কথা বলে দিই। আমার সৎ-মা টাকার জন্যেই আমার বাবাকে বিয়ে করেছে। আর আমি কেন এখানে পড়ে আছি, জানেন? সে-ও এই টাকার জন্যেই। অন্য কোথাও গিয়ে ওঠার মত টাকা নেই আমার। গরিব এর্ক ছেলেকে ভালবাসি, আর বাবা সেটা জানতে পেরে এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, যাতে ছেলেটা চাকরি হারায়। গরিব জামাতা তাঁর পছন্দ ছিল না। সবসময় চেয়েছেন আমি কোনও ধনীর দুলালকে বিয়ে করি।'

'কিন্তু এখন তো আপনার বাবার সম্পত্তি আপনিই পাবেন?'

'পুরোপুরি না। লুইসের জন্য আড়াই লাখ পাউণ্ড রেখে গেছেন তিনি, সেই সঙ্গে কিছু সম্পত্তি। বাকিটা... মানে সিংহভাগই আমার।' হঠাৎ হাসল জোয়ানা। 'দেখতেই পাচ্ছেন, বাবার মৃত্যু চাইবার পিছনে জোরালো মোটিভ রয়েছে আমার।'

পোয়ারোও হাসলেন। 'আমি শুধু দেখছি যে, আপনিও আপনার বাবার মত বুদ্ধিমান।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিমান,' বিমর্ষ গলায় বলল জোয়ানা। 'তার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিত্ব, প্রাণশক্তি আর অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। কিন্তু সেগুলো অর্জন করতে গিয়ে তিনি নিজের মানবিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়েছিলেন। দয়ামায়ার কোনও স্থান ছিল না তাঁর হৃদয়ে।'

'খোলাখুলিভাবে কথা বলায় ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল।'

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'দুটো বিষয়ে জানতে চাইব।' টেবিলের উপর রাখা চিমটার দিকে ইশারা করলেন পোয়ারো। 'এটা কি সবসময় এখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ। ঘরের মধ্যে ময়লার টুকরো পড়ে থাকাটা একেবারেই পছন্দ করতেন না বাবা। ওটা দিয়ে কুড়িয়ে বাস্কেটে ফেলতেন।'

'শেষ প্রশ্ন—আপনার বাবার দৃষ্টিশক্তি কেমন ছিল?'

'ভাল না,' বলল জোয়ানা। 'ছোটবেলা থেকেই চোখের অবস্থা খারাপ। চশমা ছাড়া কিচ্ছু দেখতেন না।'

'চশমা পরলে তো দেখতেন? খবরের কাগজ পড়তে পারতেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'ধন্যবাদ। আমার আর কিছু জানার নেই, মাদমোয়াজেল।'

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল জোয়ানা। ভ্রূকুটি করে টেবিলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। তারপর স্বগতোক্তির সুরে বললেন, 'আমি আসলে একটা গাধা। এই জিনিস আরও আগে খেয়াল করলাম না কেন? নাকের তলায় পড়ে আছে, আর আমি কিনা... প্রদীপের তলায় অন্ধকার বোধহয় একেই বলে।'

দ্বিতীয়বার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে নিচে তাকালেন তিনি। বাড়ি আর ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের মাঝ দিয়ে একটা গলি গেছে। সেখানে কালচে রঙের কী যেন একটা পড়ে আছে।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। এরপর ফিরে গেলেন নিচতলায়। সবাই তখনও লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। ভিতরে ঢুকেই সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মি. কর্নওয়ার্দি, আপনার একটু সাহায্য চাই। কখন এবং কীভাবে গত বৃহস্পতিবারে মি. ফার্লি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দরকার। যেমন ধরুন চিঠির ব্যাপারটা। ভাষাটা কী হবে, সেটা কি উনিই বলে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বলল হিউগো।

'কখন?'

'বুধবার বিকেলে। সাড়ে পাঁচটার দিকে।'

'কীভাবে পাঠাতে হবে, সে-বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন?'

'বলেছিলেন, আমি যেন নিজে গিয়ে ওটা পোস্ট করি।'

'আপনি তা-ই করেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি আসার পর কী করতে হবে, সে-ব্যাপারে কি বাটলারকে কোনও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আমার মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। বাটলার জেমসকে বলতে বলেছিলেন, সাড়ে ন'টায় এক ভদ্রলোক আসবেন; তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতে হবে, এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে মি. ফার্লির চিঠি আছে কি না সেটাও দেখে নিতে হবে।'

'অদ্ভুত নির্দেশ, কী বলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল হিউগো। বলল, 'মি. ফার্লি নিজেও একটু অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন।'

'আর কোনও নির্দেশ?'

'হ্যাঁ। সন্ধ্যাটা আমাকে ছুটি নিতে বলেছিলেন তিনি।'

'নিয়েছিলেন?'

'হুঁ। ডিনারের পর পরই বেরিয়ে গেছি বাড়ি থেকে। সিনেমা দেখেছি।'

'ফিরেছেন কখন?'

'সোয়া এগারোটায়। আমার কাছে চাবি আছে, নিজেই দরজা খুলে ঢুকেছিলাম বাড়িতে।'

'সে-রাতে আর দেখা হয়নি মি. ফার্লির সঙ্গে?'

'না।'

'তারমানে পরদিন সকালে দেখেছেন তাঁকে। তখন কি আমার বিষয়ে তিনি কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

'না তো।'

একটু বিরতি নিলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'আজব ব্যাপার কি, জানেন? আমি যখন মি. ফার্লির সঙ্গে দেখা করতে আসি, তখন আমাকে তাঁর কামরায় নেয়া হয়নি।'

'জানি,' বলল হিউগো। 'আমাকে বলে দিয়েছিলেন, সাক্ষাতের ব্যবস্থা যেন আমার কামরায় করা হয়। জেমসকে জানিয়ে দিয়েছিলাম সেটা।'

'কামরা বদলালেন কেন, বলতে পারেন?'

মাথা নাড়ল হিউগো। 'আমি জিজ্ঞেস করিনি। কখনও করতামও না। নিজের খেয়ালে কাজ করতেন মি. ফার্লি, প্রশ্ন করলে খেপে যেতেন।'

'কিন্তু... নিজের কামরায় কি কখনোই কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না?'

'তাও করতেন। আসলে ঠিক-ঠিকানা ছিল না—কখনও এ-কামরা, কখনও ও-কামরা... যখন যেটা ইচ্ছে আর কী।'

'কখনও কৌতূহল হয়নি আপনার, নিজের কামরা ছেড়ে সেক্রেটারির কামরা কেন ব্যবহার করছেন তিনি?'

'কী জানি,' ঠোঁট উল্টাল হিউগো। 'ওভাবে কখনও চিন্তা করিনি।'

'হুম।' এবার মিসেস ফার্লির দিকে ফিরলেন পোয়ারো। 'আপনার বাটলারকে একটু ডাকবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘন্টি বাজালেন মিসেস ফার্লি। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো জেমস। যথারীতি কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাউ করে জানতে চাইল, 'আমাকে ডেকেছেন, ম্যাডাম?'

'আমি না, উনি,' পোয়ারোকে দেখিয়ে দিলেন মিসেস ফার্লি।

'বলুন, স্যর।' পোয়ারোর দিকে ফিরল বাটলার।

'গত বৃহস্পতিবারে আমার ব্যাপারে তুমি কী নির্দেশ পেয়েছিলে, সেটা একটু খুলে বলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

গলা পরিষ্কার করে নিল জেমস। বলল, 'বৃহস্পতিবারে ডিনারের পর মি. কর্নওয়ার্দি আমাকে বলেন যে, সাড়ে ন'টায় এরকুল পোয়ারো নামে এক ভদ্রলোক আসবেন। বাড়িতে ঢুকতে দেবার আগে আমাকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতে হবে, এবং সাক্ষাতের বিষয়ে মি. ফার্লির লেখা একটা চিঠি তিনি সঙ্গে এনেছেন কি না,

সেটা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। তারপর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে মি. কর্নওয়ার্দির কামরায়।'

'কামরায় ঢোকার আগে দরজায় টোকা দেবার কথাও কি মি. কর্নওয়ার্দি বলেছিলেন?'

'জী-না। ওটা মি. ফার্লিরই হুকুম। ঘরে মেহমান ঢোকানোর আগে টোকা দিতে হয়।'

'হুম। বাটলাররা সাধারণত টোকা দেয় না, সেটা অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার কাছে। যাক গে, আর কোনও নির্দেশ পেয়েছিলে?'

'না, স্যর। মি. কর্নওয়ার্দি বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ওটুকুই বলেছিলেন আমাকে।'

'সেটা কখন?'

'ন'টা বাজার দশ মিনিট আগে।'

'এর পরে মি. ফার্লির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে, স্যর। ন'টার সময় এক গ্লাস গরম পানি দিতে হয় তাঁকে। সেদিনও দিতে গিয়েছিলাম।'

'তখন তিনি কোন্ কামরায় ছিলেন? নিজেরটায়, নাকি মি. কর্নওয়ার্দির কামরায়?'

'নিজের কামরায়, স্যর।'

'কামরার ভিতরে অস্বাভাবিক কোনও কিছু দেখেছিলে?'

'অস্বাভাবিক?' অবাক হলো জেমস। 'না তো।'

'মিসেস ফার্লি আর মিস ফার্লি তখন কোথায় ছিলেন?'

'ওঁরা থিয়েটারে গিয়েছিলেন—নাটক দেখতে।'

'ধন্যবাদ, জেমস। এবার তুমি যেতে পারো।'

নড করে চলে গেল বাটলার।

এবার মিসেস ফার্লির দিকে ফিরে পোয়ারো বললেন, 'আরেকটা প্রশ্ন, ম্যাডাম। আপনার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি কেমন ছিল?'

'খারাপ। চশমা ছাড়া কিছুই দেখত না।'

'কাছের জিনিসও না?'

'উঁহুঁ। চশমা না পরলে প্রায় অন্ধই হয়ে যেত।'

'ধরে নিচ্ছি, একাধিক চশমা ছিল তাঁর?'

'তা তো ছিলই।'

'আহ্!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। হেলান দিলেন চেয়ারে। 'তা হলে তো সব চুকেবুকেই গেল। পুরোটাই এখন পানির মত পরিষ্কার।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। বোকা বোকা চোখে সবাই তাকিয়ে রইল বেলজিয়ান গোয়েন্দাটির দিকে। তিনি তখন হাসিমুখে গোঁফে তা দিচ্ছেন।

কিছু সময় পার হলে মুখ খুললেন মিসেস ফার্লি। বললেন, 'আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না, মসিয়ো পোয়ারো। আমার স্বামীর স্বপ্নটা...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন পোয়ারো, 'স্বপ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

কেঁপে উঠলেন মিসেস ফার্লি। 'অলৌকিক ঘটনায় আমার কোনোকালেই বিশ্বাস ছিল না, মসিয়ো। কিন্তু এখন তো দেখছি...' কথা শেষ করলেন না তিনি।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার তো বটেই,' বললেন স্টিলিংফ্লিট। 'নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী... তাও আবার স্বপ্নের মাধ্যমে! বন্ধু পোয়ারো, এ-কাহিনি যদি অন্য কারও মুখে শুনতাম, হেসে উড়িয়ে দিতাম একেবারে। কিন্তু মি. ফার্লি যখন নিজের মুখেই সেটা বলেছেন তোমাকে...'

কুমিল্লায় সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা।
হাসান ইমাম রেলওয়ে বুকস্টল, কুমিল্লা।
প্রো: মোঃ রুবেল ইমাম
মোবাইল: ০১৬৭১-৩৪৩৪১৭

'ঠিক,' বললেন পোয়ারো। এতক্ষণ আধবোজা ছিল চোখদুটো, এবার ঝট করে খুলে গেল। 'বেনেডিক্ট ফার্লি নিজে ওই স্বপ্নের কথা বলেছেন আমাকে। যদি না বলতেন...' থেমে সবার উপর নজর বোলালেন তিনি। 'একটা বিষয় নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছেন, সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন দেখা করতে এলাম, তখন অস্বাভাবিক বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। প্রথমত, চিঠিটা আমাকে সঙ্গে আনতে বলা হলো কেন?'

'আপনার পরিচয় নিশ্চিত হবার জন্য,' অনুমান করল হিউগো।

'উঁহুঁ, চিন্তাটাই হাস্যকর,' মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'পরিচয় নিশ্চিত হবার আরও হাজারটা সহজ উপায় আছে। চিঠি তো বরং ঝুঁকিপূর্ণ। ওটা চুরি করে যে-কেউ হাজির হতে পারে।'

'তা হলে?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর বার্নেট।

'এর পিছনে জোরালো কোনও উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়ই। কারণ মি. ফার্লি শুধু চিঠিটা আমার কাছে আছে কি না, সেটা দেখেই ক্ষান্ত দেননি; বরং জোর দিয়ে বলেছেন, ওটা রেখে যেতে হবে। অথচ চিঠি নিয়ে কী করলেন তিনি? নষ্ট করলেন না। এমনভাবে রেখে দিলেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর কামরা তল্লাশি করলেই বেরিয়ে পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?'

জোয়ানা কথা বলল এবার। 'ইচ্ছে করেই করেছেন নিশ্চয়ই। হয়তো চেয়েছেন, তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে যেন আপনার মাধ্যমে স্বপ্নটার কথা সবাই জানতে পারে।'

সায় জানাবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'একেবারে ঠিক পয়েন্টটাই ধরেছেন আপনি, মাদমোয়াজেল। চিঠিটা রেখে দেবার পিছনে ওটাই কারণ। মি. ফার্লি মারা যাবার পর বহিরাগত এবং নিরপেক্ষ কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে অদ্ভুত স্বপ্নের কাহিনি প্রচার করতে হবে। চিঠি না পাওয়া গেলে সেটা হবে কী করে? এজন্যেই বলছিলাম, স্বপ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'এবার দ্বিতীয় খটকায় আসা যাক,' বলে চললেন তিনি, 'সেদিন সমস্যাটা শোনার পরে আমি মি. ফার্লির ডেস্ক আর রিভলভারটা দেখতে চাই। তিনি প্রথমে রাজিও হন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বদলে ফেলেন সিদ্ধান্ত। কিছুতেই ওগুলো আমাকে দেখতে দিতে রাজি হননি। কেন হলেন না?'

এবার কেউ জবাব দিল না।

'বেশ, তা হলে প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করি,' বললেন পোয়ারো। 'পাশের কামরায় এমন কী ছিল, যা তিনি আমাকে দেখতে দিতে চাননি?'

সবাই নিরুত্তর।

'হ্যাঁ,' পোয়ারো মাথা দোলালেন। 'এ-প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা কঠিন। কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ওই কামরায় গোপন করবার মত কিছু না কিছু ছিল। সেটা আমাকে দেখতে দেয়া হয়নি।

'এখন তা হলে সে-সন্ধ্যার তৃতীয় খটকার ব্যাপারে বলি। আমি যখন উঠে চলে আসছিলাম, তখন মি. ফার্লি আমার কাছ থেকে তাঁর চিঠিটা চেয়ে নেন। তাড়াহুড়োয় আমি একটা ভুল করে বসি। সঠিক চিঠির বদলে আমার লন্ড্রিঅলার একটা চিঠি তুলে দিই তাঁর হাতে। তিনি সেটা নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দেন টেবিলে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলটা ধরতে পারি আমি। ক্ষমা চেয়ে সঠিক চিঠিটা দিই তাঁকে। এরপর বেরিয়ে আসি বাড়ি থেকে। আমি তখন অথৈ সাগরে। তিন-তিনটা অস্বাভাবিক ঘটনা... বিশেষ করে শেষেরটা... ওগুলোর কোনও আগামাথাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'আমার বিভ্রান্তির কারণটা বুঝতে পারছেন তো আপনারা?'

'কিছু মনে কোরো না, পোয়ারো,' বললেন ডা. স্টিলিংফ্লিট। 'কিন্তু তোমার লন্ড্রিঅলার সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'খুবই গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বন্ধু,' পোয়ারো বললেন। 'লোকটা আমার শার্টের রঙ জ্বালিয়ে জীবনে অন্তত এই একটিবার মহা-

উপকার করেছে। কী বলেছি, শোনোনি? ওর চিঠিটা নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন ফার্লি, অথচ বুঝতে পারেননি যে ওটা ভুল চিঠি! কেন? কারণ কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।'

'মানে?' বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল বার্নেট। 'চশমা ছিল না তাঁর চোখে?'

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। 'ছিল,' বললেন তিনি। 'চশমাটা জায়গামতই ছিল তাঁর। আর সে-কারণেই কেসটা এত ইন্টারেস্টিং।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি।

'এই রহস্যের সঙ্গে মি. ফার্লির দুঃস্বপ্নটার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। আত্মহত্যার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, ক'দিন পর বাস্তবেও তা-ই করলেন। মানে... সে-রকম একটা পরিবেশে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। কামরায় একা ছিলেন তিনি, পাশে পড়ে রয়েছে রিভলভার, এবং সে-সময় কামরাতে আর কারও পক্ষে ঢোকা বা বেরুনো সম্ভব ছিল না। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? আত্মহত্যাই তো, নাকি?'

'অবশ্যই,' বললেন ডাঁ. স্টিলিংফ্লিট।

'ভুল,' চাবুকের মত সপাং করে উঠল পোয়ারোর গলা। 'আত্মহত্যা নয়, এটা আসলে খুন। অভিনব পদ্ধতিতে করা একটি নিখুঁত হত্যাকাণ্ড!'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই। কিন্তু কিছু বলল না।

আবারও সামনে ঝুঁকলেন পোয়ারো। টেবিলের উপর তবলার মত টোকা দিলেন আঙুল দিয়ে। সবুজ চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

'সেদিন সন্ধ্যায় কেন আমাকে মি. ফার্লির কামরায় নেয়া হলো না? কী ছিল ওই কামরায়?' মুচকি হাসলেন তিনি। 'বন্ধুগণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মুহূর্তে স্বয়ং মি. বেনেডিক্ট ফার্লি উপস্থিত ছিলেন ওখানে... আসল বেনেডিক্ট ফার্লি! আর তাঁকেই গোপন করা হয়েছে আমার কাছে।'

বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে শ্রোতারা।

'ঠিকই শুনছেন আপনারা,' তাদের উদ্দেশে বললেন পোয়ারো। 'আমি যার সঙ্গে কথা বলেছি, সে ছিল নকল ফার্লি। ছদ্মবেশ নিয়েছিল। আর সে-কারণেই ভুল চিঠির ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। মি. ফার্লির একটা বাড়তি চশমা ধার করেছিল সে। ভারী পাওয়ারের ওই চশমা পরলে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির যে-কোনও মানুষ চোখে ঘোলা দেখবে। কী বলো, ডাক্তার?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন স্টিলিংফ্লিট। 'ঠিকই বলেছ।'

'শুরু থেকেই খটকা লাগছিল আমার,' বললেন পোয়ারো। 'কামরায় ঢুকতেই মনে হচ্ছিল কোনও সাজানো মঞ্চে ঢুকছি। ভিতরে নিভিয়ে রাখা হয়েছিল সব বাতি। জ্বলছিল শুধু একটা ডেস্ক-ল্যাম্প। সেটাও এমনভাবে রাখা, যাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়... ডেস্কের পিছনে বসা মানুষটার চেহারা ঠিকমত দেখা না যায়। তাকে চিনতে পারার উপায় একটাই—গায়ের রঙ-চঙা গাউনটা। সেটাও মানুষটার শরীরের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছিল না। তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল অভিনয় করছে। বেনেডিক্ট ফার্লির সহজাত ব্যক্তিত্ব ছিল না তাতে। এ-কারণে পুরো ব্যাপারটা সন্দেহজনক বলে প্রতীয়মান হলো আমার সামনে।

'স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সত্যি সত্যি যে ওটা দেখেছেন মি. ফার্লি, তার প্রমাণ কী? নকল ফার্লি আমাকে যেটুকু শুনিয়েছে, তা-ই। আর সেটাকে সমর্থন করেছেন মিসেস ফার্লি। ডেস্কে মি. ফার্লি যে লোডেড রিভলভার রাখতেন, সেটারই বা প্রমাণ কোথায়? এটাও আমাকে শুনিয়েছে নকল ফার্লি আর মিসেস ফার্লি। কোনও সন্দেহ নেই, এ-দু'জনই রয়েছে গোটা ষড়যন্ত্রটার পিছনে। লুইস ফার্লিকে তো চিনি; নকল ফার্লি কে সেজেছিল, তাও অনুমান করা কঠিন নয়। মি. হিউগো কর্নওয়ার্দি, আপনিই তো, নাকি?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল দুই অভিযুক্তের।

'কীভাবে কী করা হয়েছে, তা এখন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার,' বলে চললেন পোয়ারো। 'নিজ থেকেই আমাকে একটা চিঠি পাঠান কর্নওয়ার্দি, বাটলারের জন্য নির্দেশ জারি করেন, তারপর

সিনেমা দেখার কথা বলে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। কিন্তু যাননি আসলে, বাটলারের অজ্ঞাতে একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন। চাবি থাকায় চুপিসারে দরজা খুলতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। ভিতরে ঢুকে ছদ্মবেশ নেন, নিজের অফিস কামরায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন আমার জন্য। সত্যিকার মি. ফার্লি তখন পাশের কামরায় পড়াশোনা করছেন। আর সে-কারণেই আমাকে সেখানে নিতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। চিঠি ফেরত নিয়ে বিদায় করে দেন আমাকে।

'এবার আসা যাক আজকের ঘটনায়। জটিল ও দীর্ঘ পরিকল্পনাটার বাস্তবায়নের দিনে। কর্নওয়ার্দি যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তা আজ উদয় হলো দুপুরে দু'জন সাংবাদিকের আগমন ঘটায়। তিনটা আটাশে ফার্লির মৃত্যুক্ষণ ঠিক করে রাখা হয়েছিল, আর তখনই সেখানে হাজির ছিলেন তাঁরা। ল্যাণ্ডিঙে বসে নিজের অজান্তেই কাজ করলেন সাক্ষী হিসেবে, শপথ করে জানালেন—মি. ফার্লির মৃত্যুর সময় কেউই তাঁর কামরায় ঢোকেনি বা বেরোয়নি। এভাবে নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরালেন মি. কর্নওয়ার্দি। কিন্তু খুনটা কীভাবে করলেন? সেটা আরও চমৎকার কৌশলে।

'এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যার অনেক কায়দা আছে। কেউ মুখের ভিতরে নল ঢুকিয়ে গুলি করে, কেউ আবার ঠেকায় চোয়ালের নিচে। কিন্তু মি. ফার্লির বেলায় গুলিটা করা হয়েছে কপালের পাশে। কেন, এখুনি জানতে পারবেন। যেখানে গুলি খেয়েছেন তিনি, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে হত্যার কৌশল।

'সাড়ে তিনটার দিকে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন মি. কর্নওয়ার্দি, যাতে গুলির শব্দ চাপা পড়ে যায়। সে-রকম একটা সুযোগ সৃষ্টি হলে নিজের কামরার জানালা খোলেন তিনি, লেজি টং নামক একটা লম্বা চিমটা দিয়ে টোকা দেন পাশের কামরার জানালায়। চিমটার মাথায় এমন কিছু লাগানো ছিল, যা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন মি. ফার্লি; জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকি দেন বাইরে। আর তখুনি পাশের জানালা থেকে তাঁর কপালের পাশে গুলি করেন কর্নওয়ার্দি। দুই জানালার মাঝে দূরত্ব কম হওয়ায় লক্ষ্যভেদে অসুবিধে হয়নি তাঁর, উল্টোপাশের ফ্যাক্টরির দেয়ালে কোনও জানালা না থাকায় কেউ দেখতেও পায়নি তাঁর দুষ্কর্ম। গুলি খেয়ে ঘরের ভিতরে পড়ে যান মি. ফার্লি। এদিকে চিমটা গুটিয়ে, জানালা বন্ধ করে দেন কর্নওয়ার্দি। আধঘণ্টা পর কাজের বাহানায় মি. ফার্লির কামরায় যান তিনি। যাবার আগে দুই সাংবাদিকের সঙ্গে কথাও বলেন, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে—কর্নওয়ার্দি নিজের কামরা থেকেই বেরিয়েছিলেন, এবং তার আগে একবারও ফার্লির কামরায় যাননি।

'যা হোক, ফার্লির কামরায় ঢুকে দুটো কাজ করেন কর্নওয়ার্দি। প্রথমে ডেস্কের উপর লেজি টং-টা রেখে দেন, তারপর রিভলভারের হাতলে ফার্লির আঙুলের ছাপ বসিয়ে অস্ত্রটা রেখে দেন লাশের পাশে। এরপর অভিনয় শুরু করেন লাশ খুঁজে পাবার। খবর দেন ডাক্তার আর পুলিশে। চিঠিটা রেখে দেন কাগজপত্রের মাঝে, যাতে অল্প তল্লাশিতেই বেরিয়ে পড়ে। জানা কথা, ওটা দেখার পর আমাকে ডেকে আনা হবে; আর আমি তখন সাক্ষ্য দেব মি. ফার্লির অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারে। সবাই ভাববে, আগে থেকেই আত্মহত্যার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মাথায়। ফলে ঘটনাটা প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মহত্যা হিসেবে।'

'কিন্তু কেন?' হতভম্ব গলায় জিজ্ঞেস করল বার্নেট। 'কেন এই খুনোখুনি?'

লুইস আর হিউগোর দিকে পালা করে তাকালেন পোয়ারো। পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে তাদের চেহারায়।

'আড়াই লক্ষ পাউণ্ড এবং শুভ পরিণয়ের জন্য,' বললেন তিনি। 'মি. ফার্লি বেঁচে থাকলে বিয়ে করতে পারছিলেন না এঁরা। উইলে রেখে যাওয়া টাকাটাও পাচ্ছিলেন না। সেজন্যেই...'

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
রাফায়েল সাবাতিনি-র
মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং
রূপান্তর: শাহেদ জামান

এই গল্পের পটভূমি সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ড। ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন প্রটেস্ট্যান্ট পক্ষের নেতা, ডিউক অভ মনমাউথ। রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি, যুদ্ধ শুরু হবে যে-কোন সময়। মনমাউথেরই একনিষ্ঠ সহযোগী, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। সুদর্শন, সাহসী এক যুবক। একই সাথে সুন্দরী রুথ ওয়েস্টমাকটের ব্যর্থ প্রণয়ী। তবে হতাশ হওয়া তার স্বভাবে লেখা নেই। কিন্তু ভালবাসা কি জোর করে পাওয়া যায়? এই সময় বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। শুরু হলো দোটানা–কে জিতবে? ভালবাসা, না দায়িত্ববোধ? অ্যান্থনি কি শেষ পর্যন্ত রুথের ভালবাসা পাবে? প্রিয় পাঠক, চলুন ডুব দিই উত্তাল সময়ে রচিত এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনির মাঝে!

দাম ■ চুরাশি টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করল না ইন্সপেক্টর। উঠে দাঁড়াল রিভলভার ও হাতকড়া নিয়ে।

খানিক পর। ডা. স্টিলিংফ্লিটকে নিয়ে নর্থওয়ে হাউসের পাশের গলিতে হাঁটছেন পোয়ারো। মি. ফার্লির কামরার নিচে পৌঁছে থামলেন। উবু হয়ে তুলে নিলেন কালচে বস্তুটা। তুলতুলে একটা খেলনা-বেড়াল।

'এই তো,' বললেন তিনি। 'এটাই লেজি টং দিয়ে মি. ফার্লির জানালায় চেপে ধরেছিল কর্নওয়ার্দি। বেড়াল পছন্দ করতেন না ভদ্রলোক, তাই নিঃসন্দেহে ওটা দেখামাত্র ছুটে এসেছিলেন জানালার কাছে।'

'কিন্তু কাজ সারার পরে কর্নওয়ার্দি এটা সরিয়ে ফেলল না কেন?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন স্টিলিংফ্লিট।

'কীভাবে সরাবে? সরাতে গেলেই বরং সন্দেহ করবে লোকে। তারচেয়ে পড়ে থাকাই কি ভাল নয়? কেউ পেলেও ভাববে কোনও বাচ্চার হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্টিলিংফ্লিট। 'সাধারণ কেউ হলে অমনটাই ভাববে। কিন্তু কর্নওয়ার্দি তো আর বুঝতে পারেনি কার পাল্লায় পড়েছে! এরকুল পোয়ারোকে ধোঁকা দেয়া কি অতই সোজা?'

'প্ল্যানটা কিন্তু মন্দ ছিল না,' পোয়ারো বললেন। 'আরেকটু হলেই পার পেয়ে যেত। চিঠি চিনতে ভুল না করলে আমিও হয়তো বোকা বনে যেতাম।'

'ভুল করে বলেই না ধরা পড়ে অপরাধীরা, বুড়ো খোকা! কিন্তু আমি কী ভাবছি, জানো? যদি তুমি... এরকুল পোয়ারো... কখনও অপরাধ করতে চাও, তো কী ঘটবে? ওসব ছোটখাট ভুল তো করবে না নিশ্চয়ই? অপরাধটা হবে নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। কেমন হতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ অপরাধ, সেটাই দেখতে চাই আমি।'

'ওটা তোমার স্বপ্ন হয়েই রইবে,' মুচকি হেসে বললেন পোয়ারো। ■

খাওয়া না খাওয়া যখন অসুখ

ডা. এস. এম. নওশের

এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা বেশি হয় মূলত উঠতি বয়সী মেয়েদের যারা বলিউডের নায়িকাদের আদলে নিজেদের জিরো ফিগার করতে চায়।

খাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা ছিল প্রিন্সেস ডায়ানার

আমরা খিদে পেলে খাই। এটাই তো আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যখন এই খাওয়া নিয়েই বাধে গোল, তখনই ঘটে বিপত্তি।

মেডিকেলের ভাষায় খাওয়া নিয়ে দু'ধরনের অসুবিধা আমরা দেখি। একটা হলো কম খাওয়ার অসুখ, যাকে মেডিকেল টার্মে বলা হয় Anorexia Nervosa (এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা)। আরেকটা হলো Bullaemia Nervosa (বুলেমিয়া নার্ভোসা)। প্রথমে আসা যাক এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা প্রসঙ্গে।

আমি যখন মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম, তখন আমার পড়াশোনার কোন কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে এক সিনিয়র আপুর বাসায় যেতাম। ওনার ছোট বোনকে দেখতাম এটা-ওটা নাশতা নিজে শখ করে তৈরি করে আমাদেরকে খেতে দিচ্ছে, কিন্তু নিজে খাচ্ছে না কিছুই। আন্টি বলতেন ও এমনই। কিছু খেতে চায় না। ওর ভয় তাহলে ও মোটা হয়ে যাবে। এখন বুঝি ওর সমস্যাটা ছিল এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা। বহুদিন হলো সে স্বামীসহ মধ্যপ্রাচ্য-প্রবাসী। জানি না এখনও তার এই সমস্যাটা আছে কিনা।

এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা বেশি হয় মূলত উঠতি বয়সী মেয়েদের যারা বলিউডের নায়িকাদের আদলে নিজেদের জিরো ফিগার করতে চায়। এরা মুটিয়ে যাবার ভয়ে কম-কম খেতে-খেতে যখন অপুষ্টিতে ভোগা শুরু করে, তখনই সমস্যা হয়। এটা উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের টিন-এজার মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। গরিব ঘরের মেয়েদের এটা হয় না।

লক্ষণ

১। উচ্চতা ও বয়স অনুসারে যে ওজন থাকা উচিত তার ২৫% কমে গেলেই এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা ধরা হয়।
২। অ্যানিমিয়া (রক্তাল্পতা)।
৩। বুক ধড়ফড় করা।
৪। ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ কমে যাওয়া।
৫। চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া।

৬। মাসিক বন্ধ অথবা অনিয়মিত মাসিক।
৭। রোগিণীরা বেশির ভাগ সময়ই নিজেদের মোটাই ভাবতে থাকেন। নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে ঢিলেঢালা জামা পরেন। ওজন নেয়ার সময় বাড়তি ওজন দেখাতে ভারী জিনিস পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন।

রোগনির্ণয়

১। প্রথমেই রোগীর সাথে কথা বলে তার বিস্তারিত ইতিহাস নিতে হবে। প্রয়োজনে তার বাবা-মায়ের সাথেও কথা বলতে হবে।
২। রোগীর মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে।
৩। রক্তের কিছু পরীক্ষায়, যেমন–হিমোগ্লোবিন, পটাশিয়াম, এলবুমিন, ইমিউনো গ্লোবিন, লিউটিলাইজিং হরমোন (L. H.), ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (F. S. H.)–এসবের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম আসতে পারে।
৪। গ্রোথ হরমোন (G. H.)-এর মাত্রা বেশি আসতে পারে।
৫। হার্টরেট কমে যাওয়ায় ইসিজি করলে এখানে কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

চিকিৎসা

১। এটি শুধু ওষুধ দিয়ে সারানোর অসুখ নয়। সবচেয়ে ভাল কাজ দেয় সাইকোথেরাপী ও কাউন্সেলিং। এর মাধ্যমে রোগীকে ধীরে-ধীরে ওজন বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়।
২। অনেক সময় ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে ক্ষুধা বাড়ানো হয়।
৩। একদম খেতে না চাইলে রোগীকে নাকে নল দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর বা Forced Feeding-এর পরামর্শ দেয়া হয়, যা খুবই কষ্টকর।

এতক্ষণ আপনারা জানলেন কম খাওয়ার অসুখ সম্বন্ধে। এবার এর উল্টোটাও জেনে নিন। এনোরেক্সিয়া নার্ভোসার উল্টো অসুখটি হলো বুলেমিয়া নার্ভোসা বা বেশি খাওয়ার অসুখ। আপনারা অনেকে হয়তো বিখ্যাত লেখক সমারসেট মমের লাঞ্চেন (Luncheon) গল্পটা পড়েছেন। এতে লেখক এক পেটুক মহিলার কথা বলেছেন যিনি মুখে বলেন আমি তেমন কিছুই খাই না অথচ রেস্তোরাঁয় যা খেয়েছেন তার বিল দিতে গিয়ে লেখকের সর্বস্বান্ত হবার জোগাড়। এটাই আসলে বুলেমিয়া নার্ভোসা।

লক্ষণ

১। এ রোগটাও মেয়েদেরই হয় বেশি। তবে উঠতি বয়সী নয়, তরুণী বয়সেই (২০-২৫ বছর) এটা দেখা দেয়। ছেলেদের তেমন একটা দেখা যায় না।
২। রোগী হঠাৎ করেই বেশি খেতে আরম্ভ করেন, বিশেষ করে মিষ্টি ও দুধ জাতীয় খাবার, যেমন–চকোলেট, সন্দেশ, চমচম, রসগোল্লা, পেস্ট্রি, মাখন, পনির।
৩। আপনি জেনে অবাক হবেন এ ধরনের অসুখে আক্রান্ত রোগীরা প্রতিদিন ২০ কেজি পর্যন্ত খাবার খেতে পারেন।
৪। খেতে-খেতে অনেকে বলতে গেলে গলা পর্যন্ত খান। যখন হাঁসফাঁস করেন, তখন মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বমি করেন। একে বলে Induced Vomiting।
৫। অনেকের হজমের সমস্যা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য জোলাপ জাতীয় ওষুধ খান। মাঝে কিছু দিন খাবারে বিরতি থাকে, তারপর আবার ওই রকম খেতে থাকেন।
৬। ওজন অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।
৭। অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠেন।
৮। রক্তচাপ বেশি থাকে এবং অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দেখা দেয়।

রোগনির্ণয়

১। রোগী ও তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলে বিস্তারিত ইতিহাস নিতে হবে।
২। রক্তে গ্লুকোজ ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ এবং ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বেশি থাকতে পারে।
৩। রক্তে পটাশিয়াম লেভেল কমে যেতে পারে।
৪। ইসিজিতে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

চিকিৎসা

১। কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপীতে রোগীর ভাল কাজ হয়।
২। রোগীকে এই অসুখের জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন করে তাকে কম খাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৩। অনেক ক্ষেত্রে পাকস্থলী অপারেশন করে কেটে ছোট করে দেয়া হয়, যাতে সে চাইলেও বেশি খেতে না পারে। ■

দস্যু

দুর্গা দেবী মুন্নী

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'তুমি অনেক লোককে মেরেছ। পরের স্ত্রীকে হরণ করেছ। মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট করেছ।'

আলেকজাণ্ডার প্রায় সমগ্র জগৎটা জয় করে ফেলেছিলেন! ভারতবর্ষেও গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে এক দস্যুকে ধরে তাঁর সামনে আনা হয়েছিল। তিনি তখন রাজা।

দস্যু জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?'

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'কারণ, তুমি দস্যু।'

দস্যু বলল, 'আপনি আমার চেয়েও বড় দস্যু!'

তখন আলেকজাণ্ডার বললেন, 'তুমি অনেক লোককে মেরেছ। পরের স্ত্রীকে হরণ করেছ। মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট করেছ।'

জবাবে দস্যুটিও বলল, 'আপনিও তো একজনের রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আপনার চেয়ে বড় দস্যু আর কে!'

আলেকজাণ্ডার তা শুনে দস্যুটিকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

তারপর ভাবতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো! দস্যুতে আর আমাতে তফাত কোথায়?'

সেই থেকে আলেকজাণ্ডার তাঁর দেশ বিজয়ের অভিযান ছেড়ে দিয়েছিলেন। ■

সৌন্দর্যের লীলাভূমি

ইয়াসমিন আক্তার মুন্নী

প্রকৃতি আর মানুষের হাতের ছোঁয়ায় গড়া এ এলাকাটির সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে অনায়াসে।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ অর্থাৎ চায়ের দেশ শ্রীমঙ্গল। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আর হাওড়, অরণ্য, পাহাড় ও সবুজ চা-বাগান ঘেরা শ্রীমঙ্গলে আপনি বেড়াতে আসতে পারেন যে-কোনও সময়, তবে উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে জানুয়ারি মাস। শ্রীমঙ্গলে এলে আপনি দেখবেন চা-বাগানের পর চা-বাগান, চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক, মাগুরছড়া গ্যাসকূপ, চা-প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র, লাউয়াছড়া ইন্সপেকশন বাংলো, বাইক্কাবিল খাসিয়াপুঞ্জি, মণিপুরী পাড়া, হাইল হাওড়, ডিনস্টন সিমেট্রি, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থ নির্মাই শিববাড়ি, টি-রিসোর্ট, ভাড়াউড়া লেক, নীলকণ্ঠ (যেখানে পাঁচ কালারের চা পাওয়া যায়)।

চা-শিল্পের জন্য শ্রীমঙ্গলের সুনাম ও পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ২০ কি.মি. দক্ষিণে শ্রীমঙ্গলের অবস্থান, যার তিন পাশে চায়ের বাগান আর একপাশে বিস্তৃত হাইল হাওড়। বিপুল সম্ভাবনাময় এক মৎস্যক্ষেত্র। বাড়তি উপহার অতিথি পাখির আগমন। চা, রাবার, লেবু, পান, কাঁঠাল, আনারস ও মূল্যবান কাঠ ইত্যাদি নানা কারণেও শ্রীমঙ্গলের প্রসিদ্ধি রয়েছে সর্বত্র। স্বতন্ত্র সত্তার মনিপুরী ও খাসিয়া সম্প্রদায়ের কারণেও এ অঞ্চলের নাম অনেকের কাছে সুপরিচিত।

কী দেখার আছে শ্রীমঙ্গলে

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRT)

বাংলাদেশের একমাত্র চা গবেষণা কেন্দ্র শ্রীমঙ্গলে। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে বিচিত্র সব ফুলের সমারোহ। আছে সারিবদ্ধ পাম, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি বৃক্ষরাজির শোভা। লেকের জলে ফুটন্ত লাল জলপদ্ম। প্রকৃতি আর মানুষের হাতের ছোঁয়ায় গড়া এ এলাকাটির সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে অনায়াসে। এ ছাড়াও, এখানে রয়েছে একটি চা-প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে চা-

কারখানাসহ পুরো এলাকাটি আপনি দেখে নিতে পারেন। মনোমুগ্ধকর এ এলাকাটি শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে হলেও রিকশায় ১০-১৫ মিনিটের পথ। ভাড়া বেশি পড়বে না।

টি-রিসোর্ট

পৃথিবীর বিভিন্ন চা উৎপাদনকারী দেশে চা-বাগানের অভ্যন্তরে টি-রিসোর্ট রয়েছে। শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জ সড়কের পাশে ভাড়াউড়া চা-বাগান সংলগ্ন ২৫.৮৩ একর জমির উপর এই টি-রিসোর্ট অবস্থিত। এই টি-রিসোর্টটি পাহাড়ের ওপর, চারপাশে চা-বাগানের সারি। অত্যন্ত সুরক্ষিত এই টি-রিসোর্টে রয়েছে একটি অফিস ভবন, দুটি ভিআইপি লাউঞ্জ, চোদ্দটি বাংলো, নয়টি স্টাফ হাউস, দুটি পাম্পহাউস, একটি সুইমিং পুল, একটি টেনিস কোর্ট ও একটি জ্বালানি স্টোর। এই টি-রিসোর্টে বিদেশি রেস্টহাউসের সমতুল্য আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই টি-রিসোর্টে দুই বেডরুম বিশিষ্ট কটেজের ভাড়া (এক রাতের জন্য) এবং তিন রুম বিশিষ্ট কটেজের ভাড়া অতিরিক্ত নয়। ভিআইপি রুম পাবেন এবং আইপি রুম আছে। এ ছাড়াও প্রতিটি কটেজে উন্নতমানের ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, স্টোররুম, ফ্রিজরুম, বাথরুমসহ ঠাণ্ডা ও গরম পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। তাই দেরি না করে আজই বুকিং দিয়ে দিন।

লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক

শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল পার্ক লাউয়াছড়ার অবস্থান। শহর থেকে রিজার্ভ গাড়ি, বাস অথবা রিকশায় চড়ে সহজেই ওখানে যাওয়া যায়। রাস্তার দু'পাশে সারি-সারি চা গাছ, গাছ-গাছালি আর উঁচু-নিচু টিলা জুড়িয়ে দেবে আপনার দু'চোখ, প্রশান্তিতে ভরে উঠবে মন। এখানে 'শ্যামলী' নামে একটি পিকনিক স্পটও রয়েছে। পার্কের বনে ঢুকে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন গাছ-গাছালির গহীন অরণ্যে। পথে হয়তো দেখা যাবে বনমোরগ, খরগোশ, বানর, হনুমানসহ নানা প্রজাতির পশুপাখি। বন্ধুত্ব করে ফেলুন এদের সঙ্গে, তা হলে বনের সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ হয়ে ধরা দেবে আপনার চোখে। পাখির কল-কাকলিতে ভরে যাবে আপনার দু'কান, মন। মনে হবে শহর থেকে অরণ্যই ভাল। মনকে আরেকটু প্রশান্ত করতে আপনি থাকতে পারবেন টিলার উপর একটি সুন্দর ছিমছাম বাংলোতে, মনে হবে আপনার নিজেরই ঘর। তবে বাংলোতে থাকতে হলে আগে থেকেই নিতে হবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি।

মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জি

মাগুরছড়ায় রয়েছে খাসিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি পুঞ্জি। উঁচু পাহাড়ের উপর বিশেষভাবে নির্মিত তাদের আবাস ভূমি। তারা বাস করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। প্রতিটি পুঞ্জিতে একজন করে প্রধান থাকেন, যাঁর নাম মন্ত্রী। তাঁদের একজনের অনুমতি নিয়ে আপনি ঘুরে দেখতে পারেন পুঞ্জির অলি-গলি। তবে এসব পুঞ্জির প্রধান আকর্ষণ পান গাছের সারি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু পান গাছ আর পান গাছ। সারি-সারি উঁচু পাহাড়ি গাছ-গাছালি পানের লতাগুলোকে বুকে ধারণ করে আছে পরম মমতায়। এ সৌন্দর্য আপনি ভুলতে পারবেন না কখনওই। খাসিয়াপুঞ্জি ঘুরে আপনি সহজেই খাসিয়াদের স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র জীবনধারা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা

সিতেশরঞ্জন দেব একজন সত্যিকারের প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। মানুষের জন্য তাঁর যেমন বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত, তেমনি পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। পশুপাখিপ্রেমী এই অসম্ভব ভাল মানুষটি প্রথমে শ্রীমঙ্গল শহরের মিশন রোড এলাকায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন একটি মিনি চিড়িয়াখানা। তারপর স্থান সংকুলান না হওয়ায় এ চিড়িয়াখানাটিকে ফুলবাড়ি এলাকার আরও ভিতরে অত্যন্ত সুন্দর খোলামেলা জায়গায় স্থানান্তরিত করেছেন। চিড়িয়াখানার সামনে এবং

পিছনে রয়েছে দুটি পুকুর, যেখানে সৌন্দর্যের সঙ্গে-সঙ্গে মাছও চাষ করা হয়। এই মিনি অথচ সুন্দর চিড়িয়াখানায় এলে দেখতে পাবেন সাদাবাঘ, মেছোবাঘ, অজগর, খরগোশ, সজারু, সোনালি কচ্ছপ, সোনালি বাঘ, মায়াহরিণ, ভাল্লুক, বানর, লজ্জাবতী বানর, বনমোরগ, তিতির, ময়না, টিয়া, গোল্ডেন ক্যাটসহ আরও অনেক প্রজাতির অতিথি পাখি।

ভাড়াউড়া লেক

শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে জেমস ফিনলে কোম্পানির চা-বাগান ভাড়াউড়ায় রয়েছে একটি লেক। লেকে রয়েছে জলপদ্মের মেলা। চা-বাগানের বুকে এই লেকটির অবস্থান পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে প্রচণ্ডভাবে। এখানে শীতে দল বেঁধে আসে অতিথি পাখির ঝাঁক।

হাইল হাওড়

শ্রীমঙ্গল শহরের পশ্চিমপ্রান্তে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে এককালে বৃহত্তর সিলেটের মৎস্যভাণ্ডার নামে খ্যাত বিখ্যাত হাইল হাওড়। হিজল-করচ গাছের সবুজ বনায়নে পাল্টে গেছে হাওড়ের চেহারা। এসব গাছে বাসা বেঁধেছে দেশি পাখি। হাওড়ের বুকে সব সময় ফুটে থাকে হাজারো শাপলা ও পদ্মফুল। শীত মৌসুমে এই হাওড় মুখরিত হয় হাজার-হাজার অতিথি পাখির আগমনে। তারা দল বেঁধে হাওড়ের জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। এই হাওড়ে ডিঙি নৌকায় চড়ে জেলেদের মাছধরার দৃশ্য, অতিথি পাখিদের জলকেলি আর পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্ত দেখতে পারেন অনায়াসে। হিজল-করচের সবুজ সৌন্দর্য শুধু চোখই জুড়ায় না, মনও শীতল আনন্দে ভরে ওঠে বিশুদ্ধ বাতাস সেবনে।

নীলকণ্ঠ ও গ্রীনকণ্ঠ

আপনি শ্রীমঙ্গলে এলেন অথচ নীলকণ্ঠ অথবা গ্রীনকণ্ঠে গিয়ে পাঁচ ফ্লেভারের চা একই গ্লাসে না দেখে ও খেয়ে ফেরত গেলেন, তা হলে লোকে আপনার নিন্দে করতেই পারে। একই গ্লাসে একই সঙ্গে থাক-থাক কয়েক ফ্লেভার ও কয়েক রঙের চা খাওয়ার ও দেখার এই দুর্লভ সুযোগ আপনি পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। তবে হয়তো আপনি নিজেও শিখতে চাইবেন কীভাবে তৈরি হয় এ বিস্ময়কর চা। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনাকে বিফল হতে হবে। কেন না, ব্যবসার স্বার্থে এ চায়ের ফর্মুলা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন নীলকণ্ঠ চা কেবিনের স্বত্বাধিকারী ও এই চায়ের উদ্ভাবক রমেশ রায়। তবে আপনার পকেট যদি গড়ের মাঠ না হয়ে থাকে, তা হলে সব ফ্লেভারের চা আপনি চেখে দেখতে পারেন। পাঁচ কালারের চা ছাড়াও এখানে নরমাল চা, আদা চা, সাদা চা, কালো চা, লেমন চা-র স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। চারদিকে চা-বাগান ঘেরা এই নীলকণ্ঠে আপনি সপরিবারে চলে আসতে পারেন যে-কোনও সময়। চা পান করার পাশাপাশি উপভোগ করতে পারেন চারপাশের চা-বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য, আর ইচ্ছে করলে টুঁ মেরে আসতে পারেন পাশের মণিপুরী পাড়ায়। কিনতে পারেন নানা মণিপুরী পণ্য সামগ্রী।

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদভারে বছরের প্রতিটি দিন মুখরিত থাকে শ্রীমঙ্গল। বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন অথবা প্রিয়জনকে নিয়ে নির্জনে ঘুরে বেড়াতে চাইলে চোখ বন্ধ করে সোজা চলে আসুন শ্রীমঙ্গলে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীমঙ্গল আপনাকে স্বাগত জানাতে সদা প্রস্তুত! ■

নিউজ কর্নার

প্রোপ্রাইটর: মোঃ বাহালুল কবীর (বাহার)

দোকান নং ১২, বাড়ি নং ১, রোড নং ১০, আলতা প্লাজা

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সমস্ত নতুন বই পাওয়া যায়।

ফোন: ৮১২৮৩৫৬, মোবাইল: ০১৮১৯-১৫৪৮৪৮

বুমেরাং

শাহেদ জামান

'তুমি তো সারাদিনই দোকান নিয়ে পড়ে থাকো। তোমার বউ একা একা কী করে সে খবর রাখো?'

রহস্য গল্প লেখার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, কয়েকটা গল্প লেখার পরেই মাথা থেকে প্লট হারিয়ে যায়। কিবোর্ড কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার পরেও মনিটরে সাদা একটা পেজ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

আমি ইদানীং এই সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছি। সামনে ঈদ। তিনটে পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় লেখা দেয়ার জন্য রিকোয়েস্ট এসেছে। অথচ, আমি এখনও শূন্য হাতে বসে আছি। এক সপ্তাহের মাঝে তিনটে গল্প লিখব কীভাবে ভেবে পাচ্ছি না।

দুশ্চিন্তায় যখন আমার মাথার অবশিষ্ট চুলগুলোও সব ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম, তখনই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আরেকটু ভেবেচিন্তে প্ল্যানটাকে শানিয়ে নিলাম। তারপর নেমে পড়লাম কাজে। হাতে বেশি সময় নেই।

আশরাফুদ্দিন ওরফে আশু মিয়া আমার ছোট্ট বাসাটার নিচতলায় একটা দোকান চালায়। বউটা বেশ সুন্দরী। চটক আছে চেহারায়, চোখে ইশারা। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি এখনও। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় প্রায়ই চোখাচোখি হয়। আশরাফুদ্দিন সে তুলনায় একেবারেই ম্যাড়মেড়ে মানুষ। বউটা খুব সম্ভবত ওকে নিয়ে সুখী নয়।

মনে মনে আশু মিয়াকেই আমার গল্পের নায়ক হিসেবে ঠিক করে ফেললাম। বিকেলবেলা

সিগারেট কিনতে গেলাম ওর দোকানে। কয়েকটা খুচরো কথা খরচ করলাম, গল্প জমে উঠতে দেরি হলো না। কথায় কথায় আমাদের বাড়িওয়ালার বড় ছেলেকে নিয়ে ওর মনে হালকা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, 'তুমি তো সারাদিনই দোকান নিয়ে পড়ে থাকো। তোমার বউ একা একা কী করে সে খবর রাখো?'

বাড়িওয়ালার বড় ছেলেটা একেবারেই ঠাণ্ডা স্বভাবের। বাড়ি থেকে বের হয় না। সারাদিন ঘরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ শোনা যায়। পাগল টাইপের আর কী! ওকে নিয়ে সন্দেহ করাটা একেবারেই পাগলামির পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করাটা আমার অভ্যাস। লেখালেখি করতে গেলে এসবের দরকার আছে। জানি, ওই সামান্য সন্দেহই যথেষ্ট। আস্তে আস্তে আশরাফুদ্দিনের মনে ওই ছোট্ট সন্দেহের বীজটা মহীরুহ হয়ে উঠবে। সে তখন কী করে, সেটাই আমার দেখার ইচ্ছা। কারণ তার উপর ভিত্তি করেই আমার গল্পের প্লট সাজাব।

খুনটুন করে বসবে না তো আবার? না। আশরাফুদ্দিনের মত নরম স্বভাবের মানুষের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। বড়জোর মারধর করতে পারে। তবে খুন করলেই বা খারাপ কী? গল্পটা আরেকটু রগরগে হবে!

আপনারা হয়তো ভাবছেন, সামান্য গল্প লেখার জন্য এত ঝামেলার দরকার কী? দরকার আছে। আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি সত্যি কোনও ঘটনা ছাড়া কাহিনি সাজাতে পারি না। গত ঈদে যে গল্পটা লিখে সবার বাহবা কুড়িয়েছিলাম, সেটাও এইভাবেই লেখা। ওই যে, ভিখারীদের খুন করে বেড়ায় এক পাগল খুনি?

ঠিক ধরেছেন! ওই খুনগুলো আমিই করিয়েছিলাম। পুলিশ আমার বা আমার ভাড়াটে খুনির কিচ্ছু করতে পারেনি। মগবাজারের এক উঠতি মাস্তানকে ধরে চালান করে দিয়েছিল। শুনে হাসতে হাসতে আমার পেট ফেড়ে যাওয়ার জোগাড়! বাংলাদেশের পুলিশ, সাইকো কিলার ধরার যোগ্যতা অর্জন করতে আরও কয়েক যুগ লাগাবে।

যাকগে, আসল কথায় আসি। যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমনই কাজ হলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে কিবোর্ডটা কোলে টেনে নিয়ে ভাবছি কীভাবে শুরু করা যায়, এমন সময় নিচতলা থেকে ভেসে এল আশরাফুদ্দিনের বউয়ের কান্নার আওয়াজ। সেই সঙ্গে আশু মিয়ার চেঁচামেচি।

মুচকি হাসলাম। প্ল্যান মাফিকই কাজ হচ্ছে। আশরাফুদ্দিন তার বউকে ধরে পেটাচ্ছে। প্রথম লাইন ইতোমধ্যে মাথায় চলে এসেছে। দ্রুত টাইপ করতে শুরু করলাম।

বেশিদূর অবশ্য এগোতে পারলাম না। তার আগেই দরজায় দুমদাম করাঘাতের শব্দে চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

'স্যর, তাড়াতাড়ি দরজা খোলেন। আমার বউটা কেমন জানি করছে! আপনি একটু আসেন!'

চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে গায়ে চড়ালাম পাঞ্জাবি। দরজা খুলতেই আশরাফুদ্দিনের বিহ্বল চেহারাটা চোখে পড়ল। আমাকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল তার ঘরে।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে রক্ত। সারাঘরের দেয়ালে, মেঝেতে, ফার্নিচার, জানালার পর্দা—সব জায়গায় ছোপ ছোপ তাজা রক্তের দাগ। মনে হচ্ছে, কোনও বাচ্চা ছেলে রঙের বদলে পিচকারিতে রক্ত ভরে ইচ্ছেমত সারাঘরে ছিটিয়ে দিয়েছে।

মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেও চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিলাম না। আশরাফুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'হায় হায়! এ কী?'

হাত তুলে কপালের ঘাম মুছল আশু মিয়া। এতক্ষণে খেয়াল করলাম, ওর হাতটা রক্তে মাখামাখি।

'আপনি ঠিক বলেছিলেন, স্যর। আমি যখন থাকতাম না, তখন মাগি পরপুরুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করত। দিয়েছি ওর শখ জন্মের মত

ঘুচিয়ে!'

'কই তোমার বউ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আশরাফুদ্দিন খাটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একটা পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করল ওর বউয়ের লাশটা। রক্তে মাখামাখি মাংসপিণ্ডটা দেখে বোঝার উপায় নেই, ঘণ্টাখানেক আগেও এ ছিল সুন্দরী এক যুবতী।

'আর বলবেন না, স্যর, গলায় ছুরির একটা পোঁচ দিতেই আমার হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। সারাঘরে দাপাদাপি করে এই অবস্থা করেছে। কী বিচ্ছিরি কাণ্ড!' আফসোস ঝরছে আশরাফুদ্দিনের গলায়। 'রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল, তাই কুপিয়ে এই অবস্থা করেছি।' লাশটার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

'কিন্তু তুমি আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন?' জানতে চাইলাম।

রক্তমাখা মেঝেতে সাবধানে পা বাঁচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল আশু মিয়া, হাসছে। 'কী করব, স্যর? মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কী করব কিছু বুঝতে না পেরে আপনাকে ডেকে এনেছি।'

আমার মাথায় তখন ঘুরছে একটাই চিন্তা–পুলিশে খবর দিতে হবে। নইলে ঘটনা সামাল দেয়ার বাইরে চলে যাবে। বাইরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম আমি।

'কোথায় যাচ্ছেন, স্যর?' পেছন থেকে ডাক দিল আশু মিয়া। 'পুলিশে খবর দেবেন?'

থমকে গেলাম আমি। 'আমি...মানে...' তোতলাতে শুরু করলাম।

'পুলিশ তো আসবেই। তার আগে আমার আরও কিছু কাজ বাকি আছে। একটু দাঁড়ান!' আশরাফুদ্দিনের কথা শেষ হতে না হতেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। ভারী হাতুড়িটা কোথা থেকে বের করে এনেছে, কে জানে! চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল। আঁধার হয়ে এল পুরো দুনিয়া।

পুলিশের তীব্র হুইসলের শব্দে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরল আমার। ঘর অন্ধকার। মাথায় তীব্র ব্যথা। নরম, ভেজা কিছুর উপর পড়ল হাত। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মনে পড়ে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

পকেট থেকে সিগারেট লাইটারটা বের করে জ্বাললাম। আগুনের আবছা আলোয় দেখলাম, আশরাফুদ্দিনের বউয়ের লাশটা আমার পাশেই পড়ে আছে! আরেক পাশে পড়ে আছে একটা বারো ইঞ্চি ব্লেডের রক্তমাখা ছুরি। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে নিশ্চয়ই!

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। আশরাফুদ্দিন ওর বউকে খুন করে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে! লাইটারের আলোয় দেখলাম, পরনের পাঞ্জাবিটা রক্তে ভেজা। ছুরিটার দিকে তাকালাম। বাঁটে নিশ্চয়ই আমার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে!

কী করব ভাবতে শুরু করেছি। পালিয়ে যাব? সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুললাম। আর দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল একটা রিভলভারের লোলুপ নল। তাকিয়ে আছে আমার দু'চোখের মাঝে!

শালার বাংলাদেশের পুলিশ!

আসল খুনিকে জীবনেও ধরতে পারল না! ■

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দিনাজপুরে সেবা প্রকাশনীর যে-কোনও বইয়ের জন্য আসুন

বন্ধু পত্রিকা এজেন্সি

স্টেশন রোড, দিনাজপুর।

মোবাইল: ০১৯১৮-৫১০২৭৬

তথ্য তরঙ্গ

ভেনেজুয়েলাতে 'বোসিয়াম' বলে এক জাতের গাছ থেকে গরুর দুধের মত সাদা তরল ঝরে।

প্রিয় পাঠকদের জন্যে তুলে দেয়া হলো অদ্ভুত কিছু গাছ সংক্রান্ত তথ্য:

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মালয় এবং জাভা দ্বীপ এলাকায় এক ধরনের ভয়ানক গাছ জন্মায়। এই গাছের নাম হলো Eupus Tree। গাছগুলো এতই বিষাক্ত যে, ওগুলো যখন জন্মায়, তার আশপাশে দু'চার মাইলের মধ্যে কোনও বড় গাছ তো দূরের কথা, ঘাস পর্যন্ত জন্মাতে পারে না। এমন কী কোনও জন্তু তার আশপাশে গেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

২। 'বেলিডোনা' নামে এক গাছ আছে, যেটা থেকে অনবরত অসহ্য রকমের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এর গন্ধ নাকে এলে সঙ্গে-সঙ্গে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়, এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে মানুষ।

৩। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলাতে 'বোসিয়াম' বলে এক জাতের গাছ থেকে গরুর দুধের মত সাদা তরল ঝরে। ঠিক খেজুর গাছের মতই এদের গা কেটে নল বসিয়ে দিলে চুইয়ে-চুইয়ে পড়ে দুধের মত রস। ১৮৪৯ সালে রিচার্ড স্পোস নামে এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী গাছটি আবিষ্কার করেন।

৪। আফ্রিকার 'ডেলভিশিয়া' নামে এক জাতের গাছ প্রায় এক শ' বছর বাঁচে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই এক শ' বছরে এরা লম্বায় হয় মাত্র একফুট। অস্ট্রিয়ার ডেলভিশিয়া নামে জনৈক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী গাছটি আবিষ্কার করেন।

৫। ব্রাজিলে বিচিত্র ধরনের এক গাছ আছে। নাম 'ডিজেল ট্রি'। গাছের রস অবিকল ডিজেলের মত। বৈজ্ঞানিক নাম 'কোপাই ফেরাল্যান্স্ ডরফি'। গাছের গায়ে গর্ত করলে রস গড়িয়ে নামে, যেটা কি না খাঁটি ডিজেল তেল।

৬। লোকে বলে 'চিনি গাছ'। ডগলাস ফার (Doglas Fur) গাছ থেকেও চিনি পাওয়া যায়। এই গাছের আঠা হলো চিনি। এই গাছ পাওয়া যায় কানাডাতে। কেটে দিলে কাটা ফুটো দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ে। তা জমা হলে রূপান্তরিত হয়

চিনিতে।

৭। কলা গাছ আসলে কোনও গাছ নয়। এরা ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদ। কলা গাছের কোনও কাণ্ড নেই। কাণ্ড যেটা হয়, ওটা পাতার বোঁটার দীর্ঘ অংশবিশেষ। পাতার ডগা জড়াজড়ি করেই কাণ্ডের মত লম্বা হয়। কলা গাছে একবারই ফুল ফোটে। এটাই মোচা।

৮। বিছুটি গাছটির আরেক নাম চোতরা পাতা। এই গাছের পাতা গায়ে লাগলে গা জ্বালাপোড়া করে। এই চোতরা পাতার গায়ে ছোট শুঁয়ো থাকে। এদের মাথা তীক্ষ্ণ এবং গোলাকার বলের মত। এই বলের মধ্যে থাকে এক রকম বিষাক্ত রস। বিছুটি পাতা যখন গায়ে লাগে, ওই শুঁয়োগুলো ত্বকে প্রবেশ করে এবং ভেঙে যায়। সেই সময় কিছুটা বিষাক্ত রসও আমাদের রক্তে মিশে যায়। আর তার ফলেই গা জ্বলতে থাকে।

৯। আমরা যে কিসমিস খাই, ওগুলো আসলে শুকনো আঙুর। ওই ফল শুকিয়েই কিসমিস তৈরি হয়।

১০। দারুচিনি হচ্ছে এক জাতীয় গাছের ছাল। ওটাকে শুকিয়ে দারুচিনি তৈরি করা হয়। ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং চীনে দারুচিনি পাওয়া যায়।

১১। ব্যাঙের ছাতা এক রকম উদ্ভিদ। এর শেকড়-পাতা নেই। ব্যাঙেরা যেরকম জায়গায় থাকে, সেসব জায়গায় জন্মায় বলে এদের নাম রাখা হয়েছে ব্যাঙের ছাতা। পৃথিবীতে প্রায় ৫০ রকমের ব্যাঙের ছাতা রয়েছে। ■

সংগ্রহে: **বিপুল সিনহা**

প্রতিহনন

এফ. এইচ. পল্লব

'ময়েন হাজীও আল্লাহ চান তো ওর ন্যায্য পাওনা পেয়ে যাবে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। থমথমে একটা অবস্থা চলছে কাটাখালি বাজারে। একে-একে ঘরে ফিরে যাচ্ছে লোকজন। অথচ অন্যদিন রাত বারোটা পর্যন্ত গমগম করে কাটাখালি বাজারটা। শামসু মিয়া পাঁচ দিন আগে নিজের ডেরায় অজ্ঞাত খুনির হাতে খুন হয়েছে। পুলিস ও সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা ঘোরাফেরা করছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চারজনকে।

শামসু মিয়াকে যে কেউ খুন করতে পারে, এটাই অবিশ্বাস্য লাগছে কাটাখালি অঞ্চলের মানুষের কাছে। কেউ-কেউ সন্দেহ করছে সর্বহারা পার্টিকে, কেউ বা ধারণা করছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই নিহত হয়েছে শামসু মিয়া। চেহারায় এক ধরনের শোক-শোক ভাব বজায় রেখে আলোচনা করছে সন্ত্রস্ত লোকজন: এরপর কার পালা?

ভয়াবহ অশুভ, অপরাজেয় শক্তির মত কাটাখালি বাজারে ছিল শামসু মিয়া। হেন অপরাধ নেই যা করত না। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি সবই সে করত। যে বিরোধিতা করেছে, সে-ই খুন হয়েছে শামসুর নিষ্ঠুর আক্রমণে। বয়স ছিল তার পঞ্চান্ন। লোহাপেটা শরীরের লোকটা নাগাড়ে বিশ বছর ধরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রেখেছিল কাটাখালি বাজারে।

আজ কুলখানি হলো শামসু মিয়ার। মিলাদ হলো। শোক মিছিল হলো। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, তিন দিন ধরে দোকানপাট সব বন্ধ রেখে শোক পালন করতে বাধ্য হলো কাটাখালি বাজারের

ব্যবসায়ীরা। এসব হলো শামসু মিয়ার ফুপাতো বড়ভাই ময়েন হাজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ময়েন হাজীই শামসুকে বরাবর আইন-আদালত-থানা-পুলিস থেকে আগলে রেখেছে। বিনিময়ে শামসুর সাহস আর নিষ্ঠুরতাকে কাজে লাগিয়ে বনে গেছে অগাধ ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তির মালিক। কাটাখালি বাজারে আছে রাজশাহী শহরের সবচে' বড় ফেন্সিডিলের আড়ত। ফেন্সিডিলের এই গোটা ব্যবসাটা শামসু মিয়াকে দিয়ে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে ময়েন হাজী।

ময়েন হাজীর নানান ব্যবসা। পাঁচখানা ট্রাক, কাটাখালি বাজার জুড়ে তিন বিঘা জমির উপর চারতলা বিশাল ময়েন সুপার মার্কেট। এলাহি কারবার হাজী সাহেবের। মসজিদ-মাদ্রাসায় ঢাকঢোল পিটিয়ে দানখয়রাত করে প্রচুর। তার ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাড়ে-হাড়ে জানে, শামসু মিয়ার চেয়ে অনেকগুণ বেশি নারীলোলুপ এবং ধূর্ত চরিত্রের মানুষ ময়েন হাজী।

ঘ্যাঁচ করে থামল পুলিসের জিপ। রাস্তার ওপাশে খানিক পশ্চিমে ময়েন হাজীর সুপার মার্কেটের বারান্দায় জটলা করছিল কিছু লোক। আস্তে-আস্তে সরে পড়ল তারা। জিপের শব্দে চিন্তার স্রোত বাধা পড়ল বাহাত্তুরে বুড়ো করিম মিয়ার। এতক্ষণ সে শামসু আর ময়েন হাজীকে নিয়ে হাবিজাবি ভাবছিল।

একটা দশ বাই বারো ফুট ঘরের সামনের বারান্দায় গোল্ডলিফ কোম্পানির সুন্দর বাক্স পেতে পান-সিগারেট বিক্রি করে করিম মিয়া। এই ঘরটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি। ভাড়া দিতে হয় না কাউকে। এ ঘরেই একলা মানুষের সংসার। একটা মাঝারি সাইজের তক্তপোষ; তার নিচে পুরনো টিনের বাক্স আর সাংসারিক নানান জিনিসপত্র। বউ মারা গেছে পনেরো বছর। কাটাখালি বাজারের দক্ষিণে বাখরাবাজ গ্রাম। ওই গ্রামে তার দুই ছেলের আলাদা-আলাদা সংসার। ছেলেদের সঙ্গে করিম মিয়ার তেমন বনিবনাও নেই। কেবল নাতি-পুতি কেউ এলে সামান্য আদর করে বিস্কুটের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে দাদার দায়িত্ব শেষ করে। সারাদিন তার একমাত্র কাজ, পান-সিগারেট বিক্রির ফাঁকে রাজ্যের চিন্তা-ভাবনা করা আর শ্রোতা পেলে গুছিয়ে গল্প করা।

আঁধার ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এসে করিম মিয়ার দোকানের সামনে দাঁড়াল কান পরিষ্কারঅলা শুকুর আলি। 'চা খাবেন নাকি, চাচা? মগটা দেন, চা নিয়ে আসি,' বলল সে।

এই লোকটা প্রায় মাসখানেক হলো উদয় হয়েছে কাটাখালি বাজারে। করিম মিয়ার সঙ্গে কেন যেন গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চায়। বিনা পয়সায় পরিষ্কার করে দিতে চায় করিম মিয়ার কানদুটো।

করিম মিয়া কখনওই শুকুর আলির কথায় কান পাতেনি। শুকুর আলি ক'দিন যাবৎ হাজী সাহেবের কানের যত্ন নিচ্ছে। আজব লোকটার চালচলন রহস্যজনক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল, লম্বা দাড়ি-গোঁফ, হাতে মোটা তামার বালা, পরনে সাদা, ময়লা লুঙ্গি, সবুজ ফতুয়া, পায়ে রাবারের চপ্পল। সারাদিন এখানে-সেখানে মানুষের কানে কাঠি বুলিয়ে সন্ধ্যার পর প্রতিদিন হাজির হয় করিম মিয়ার দোকানে। ছোট কাঠের টুলটায় বসে। নিজের পয়সায় চা-স্টল থেকে মগে করে চা এনে খাওয়ায় করিম মিয়াকে, নিজেও খায়।

করিম মিয়া খদ্দের বিদায় করতে-করতে শুকুর আলির সঙ্গে টুকটাক গল্পটল্প করে। রাত গভীর হলে বাজারের ভেতরের জামে মসজিদের বারান্দায় ঘুমাতে চলে যায় শুকুর।

কেন যেন তাকে খুব একটা সুবিধের লোক বলে মনে হয় না করিম মিয়ার। কেমন একটা অস্বস্তি কাজ করে মনে। করিম মিয়ার মনে হয়, আগে কোথায় যেন শুকুর আলিকে দেখেছে। কিন্তু কোথায়, তা আর মনে পড়তে চায় না। কাছে থাকলে করিম মিয়া মনে-মনে শুকুর আলির আসল পরিচয়টা সন্ধান করতে থাকে। প্রথম যেদিন শুকুর আলি কান পরিষ্কারের থলি গলায় ঝুলিয়ে ওর দোকানে এল, করিম মিয়া কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি?'

শুকুর আলি হেসে বলেছিল, 'আগে কীভাবে

দেখবেন, চাচা, এই কান পরিষ্কারআলা তো কোনও দিন কাটাখালি বাজারে আসেইনি।'

চা নিয়ে ফিরে এল শুকুর আলি। দু'জনে ভাগাভাগি করে চা খেতে লাগল। খদ্দের নেই, তাই শামসু হত্যাকাণ্ড ও ময়েন হাজীর অপকর্ম নিয়ে গল্প ফাঁদল করিম মিয়া।

শামসু মিয়া আর ময়েন হাজীর বিরুদ্ধে কাটাখালির স্থায়ী বাসিন্দার কাছে কিছু বলার সাহস করিম মিয়ার নেই। কাটাখালি বাজারের কোনও মানুষেরই নেই।

তাই বাইরের লোক শুকুর আলিকে শপথ করিয়ে নিয়ে, ধীরে-ধীরে, নিচু স্বরে শামসু-ময়েন জুটির রোমহর্ষক সব পাপকর্মের কাহিনি বলতে লাগল করিম মিয়া।

কীভাবে ময়েন হরিয়ান সুগার মিলের সামান্য লেবার সর্দার থেকে কোটিপতি হয়ে গেল। মামাতো ভাই দুর্ধর্ষ শামসু মিয়াকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিল খুনে বাহিনী। ভয়ঙ্কর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে। সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল কাটাখালি বাজারের।

সবই বলে গেল শামসু মিয়া।

বিশেষ করে গত দু'বছর আগে তার দোকানে ঘটে যাওয়া ঘটনার বয়ান দিতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল করিম মিয়া।

সেবার বর্ষার সময় যমুনা নদীর ভাঙনে সিরাজগঞ্জের সর্বস্বান্ত এক পরিবার এসে উঠেছিল করিম মিয়ার এই দোকানের বারান্দায়। মজিবর-খায়রুন ছিল স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে তিন বছরের এক বাচ্চা মেয়ে। নাম শেফালী। দুটো চটের বস্তায় সামান্য সাংসারিক জিনিসপত্র আর শুভ বিবাহ লেখা ফুলপাতা আঁকা টিনের বাক্স ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের কাছে। খিদেয় কাঁদছিল বাচ্চা মেয়েটা। করিম মিয়া পাউরুটি কিনে দিয়ে ওদেরকে বারান্দায় বসতে দিয়েছিল। রাতটা ওরা করিম মিয়ার দোকানেই ছিল। সকাল হতেই কাজের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিল মজিবর।

বেলা বারোটার দিকে বিফল হয়ে ফিরল, করিম মিয়ার দোকানের বারান্দা খালি দেখে ছ্যাঁত করে উঠল ওর বুক। করিম মিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, আমার পরিবার গেল কোথায়?'

করিম মিয়া বলল, 'ঘরে আছে। তোমার মেয়ের তো জ্বর, খুব বমি হচ্ছে।'

মজিবর ভেতরে ঢুকে দেখল, অচেতন শেফালীকে কোলে নিয়ে কাঁদছে খায়রুন। করিম মিয়া বাজারের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধপত্র কিনে দিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না। শেফালী মারা যাবার খবর স্বাভাবিকভাবেই গেল ময়েন হাজীর কানে। শামসু মিয়া মারফত দাফন, কাফনের টাকা পাঠিয়ে দিল সে। বাজারের ক'জন দোকানদারকে নিয়ে করিম মিয়াই শেফালীকে কবর দিল। শোকগ্রস্ত পরিবারটা থাকল করিম মিয়ার ঘরেই।

করিম মিয়া হোটেলে কথা বলে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

সপ্তাহ খানেক ওরা ছিল। একদিন শামসু মিয়া এসে মজিবরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ময়েন হাজীর ট্রাকে হেলপারের চাকরিতে লাগিয়ে দিল। প্রমাদ গুনল করিম মিয়া। কারণ, বউটি ছিল অসম্ভব সুন্দরী। শামসুর চোখ খায়রুনের সারাশরীর লেহন করে ফিরে গেছে।

সে রাতে ট্রাক থেকে পড়ে আহত হলো মজিবর, শামসু নিজে এসে করিম মিয়া আর আহত মজিবরের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে গেল খায়রুনকে।

পরদিন সকালে ময়েন হাজীর ট্রাকের পার্টস্ চুরির দায়ে পুলিস এসে মজিবরকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। এরপর পাঠাল জেলহাজতে। আইন-কানুন অনুযায়ী দুই বছরের জেল হয়ে গেল মজিবরের।

একমাস পরে কাটাখালি বাজারের দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মার চরে পাওয়া গেল খায়রুনের ছিন্নভিন্ন লাশ।

থানার পুলিস এল, সাংবাদিকেরা এল। সংবাদপত্রে ছবিসহ খবর বের হলো।

এক দফা থানায় নিয়ে গিয়ে করিম মিয়াকেও জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিস। থানা থেকে ফিরে ভীত, কম্পিত করিম মিয়া গভীর রাতে

মজিবর-খায়রুনদের জিনিসপত্র সব রিকশায় করে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিল পদ্মা নদীতে। অজানা এক মায়ার টানে ওদের ফুলপাতা আঁকা টিনের বাক্সটা এবং ভেতরের জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল তক্তপোষের তলায়।

এরপর ধীরে-ধীরে স্তিমিত হলো সবার উত্তেজনা।

আজও এসব বলতে গিয়ে নিঃশব্দে কাঁদল করিম মিয়া। বলল, 'এই পাপের সাজা হবে না, কোনও সাজা নাই!'

'ও, চাচা, কান্দেন ক্যান? ধরেন, শামসু ওর ওই পাপের সাজা পেয়েছে। আর ময়েন হাজীও আল্লাহ চান তো ওর ন্যায্য পাওনা পেয়ে যাবে।' কথাটা বলে বরাবরের মতই বিদায় না নিয়ে মসজিদের বারান্দায় ঘুমাতে গেল শুকুর আলি।

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা।

করিম মিয়ার ঘুম ভাঙল আজ অনেক দেরিতে। গতরাতে শুকুর আলির সঙ্গে গল্প শেষ করে শুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। শুকুর আলির শেষ দফায় আনা চা-টা খাবার পর দু'চোখের পাতা যেন আপনা-আপনি বুজে আসছিল ঘুমে।

চৌকি থেকে নেমে ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজার খিল ভাঙা। কবাট ভেজিয়ে রাখা। তার মত গরিবের ঘরে চোর ঢুকেছিল ভেবে আশ্চর্য হলো করিম মিয়া। বেকুব হয়ে গেল চৌকির তলায় উঁকি দিয়ে। সেখানে পড়ে আছে শুকুর আলির কান পরিষ্কারের থলেটা। জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে। শুধু খায়রুন-মজিবরের স্মৃতিচিহ্ন টিনের বাক্সটা গায়েব।

খুঁজতে-খুঁজতে চৌকির তলায় ঢুকে পড়ল করিম মিয়া।

না, নেই বাক্সটা।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল করিম মিয়া। বেলা প্রায় এগারোটা, অথচ বাজারের দোকানপাট এখনও খোলেনি। পাশের ওষুধের দোকানটা ঠিক সকাল সাতটায় খোলে, ওটা এখনও বন্ধ!

প্রতিদিন সূর্য উঠতে না উঠতেই পাশের গ্রামের দশ-বারোজন লোক বাঁশের ঝাঁকা নিয়ে টাটকা শাকসব্জি বিক্রি করতে বসে যায়। তারা কেউ এখনও আসেনি।

আশ্চর্য, কী আজব এক সকাল!

করিম মিয়া খুবই বিস্মিত।

গোটা বাজারটা যেন হঠাৎ হরতালের কবলে পড়ে বন্ধ হয়েছে। গা ছমছম করে উঠল তার। এসময় বাজারের মসজিদের মাইকে বেজে উঠল: 'একটি শোক সংবাদ! কাটাখালি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আলহাজ্ব ময়েন উদ্দীন সাহেব গতরাতে আততায়ীর হাতে শহীদ হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহে...'

করিম মিয়া দৌড়ে গেল ময়েন সুপার মার্কেটের সামনে।

দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের জিপ। চারতলায় হাজী সাহেবের পার্সোনাল চেম্বার কাম নারীভোগের বালাখানাতেই খুন হয়েছে ময়েন হাজী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল জবাই করে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করেছে। ঠিক শামসুকে যেভাবে জবাই করা হয়েছিল!

কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ফিরল করিম মিয়া। চৌকির তলা থেকে শুকুর আলির কান পরিষ্কারের ঝোলাটা বের করে আনল। ওটা একটা ছেঁড়া চাদরে মুড়ে সিগারেটের বাতিল কার্টনের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আজ রাতেই ঝোলাটা কোথাও ফেলে দিতে হবে। শুকুর আলিকে আগে কবে কোথায় দেখেছে, তা এবার পরিষ্কার মনে পড়ল করিম মিয়ার।

এ সেই মজিবর! ■

ময়মনসিংহে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের বই বিক্রেতা

মতি লাইব্রেরি

৯০ সি কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ

মোবাইল: ০১৭১১-২৪৩৩০০, ০৯১৬৭৭৪৫

প্রতিযোগিতা

মূল ▮ আলবের্তো মোরাভিয়া
রূপান্তর ▮ আনোয়ার সাদাত শিমুল

দাদা বলতেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ছোবল থেকে কারও ছাড় নেই।'

এক

তাঁরা বলতেন, প্রতিযোগিতাই ব্যবসার প্রাণ। খুব অল্প বয়সে আমি বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলাম আমার দাদাকে দেখে। আমার গরিব দাদা এ প্রতিযোগিতার কারণেই ব্যবসা করতে গিয়ে পরপর দুইবার ব্যর্থ হয়েছিলেন।

হাঁড়িপাতিল আর কাঁচের জিনিসপাতির ছোট্ট একটি দোকান ছিল তাঁর। দাদা বলতেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ছোবল থেকে কারও ছাড় নেই।'

'ব্যাপারটা কেমন?'

'ধরো, আমি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপাতির একটা দোকান খুললাম রাস্তার মোড়ে। আর আমার দোকান থেকে সামান্য দূরে অন্য কেউ অল্প দামে একই পসরা সাজিয়ে আরেকটা দোকান খুলল। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। এ কারণে, কাস্টমার আমার দোকান বাদ দিয়ে তার দোকান থেকেই কিনবে। এভাবে দিনে-দিনে আমি ফতুর হয়ে ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হব। এটাই হচ্ছে প্রতিযোগিতা।'

'কিন্তু, দাদা, এভাবে ফতুর হয়ে গেলে তো আমরা না খেয়ে মারা যাব,' আমি জানতে চাইতাম।

দাদা উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ, তুমি মারা যাবে। কিন্তু এটাও ভাবো: কম দামে জিনিস কিনে

কাস্টমাররা তো খুশি!'

'কাস্টমারের উপকারে আমার কী লাভ?'

আমার পাল্টা প্রশ্ন শুনে দাদা বলতেন, 'মোটা দাগে, হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতাই কিন্তু ভাল। কারণ, এতে করে না চাইলেও সব সময় কাস্টমারের ভালর কথা ভাবতে বাধ্য হবে তুমি।'

'কিন্তু কেউ যদি আমাকে পথে বসানোর জন্য এসব করে, আমিও তাকে ছেড়ে কথা বলব না।'

'কারণ, তুমি ঝগড়াটে এবং ক্ষ্যাপাটে,' দাদা বলতেন, 'মনে রেখো, অন্যদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি করে ব্যবসা করা যায় না। বেশি গণ্ডগোল করলে তারা তোমাকে জেলে পাঠাবে। ফলে, তুমিই ফতুর হয়ে যাবে। ব্যবসা ওখানেই শেষ। তাই বলছি, শোনো—ব্যবসা করতে হলে প্রতিযোগিতা করেই টিকে থাকতে হবে।'

দুই

আজ অনেক বছর পর আমি স্মৃতিকাতর হই। দাদার সঙ্গে এসব আলাপের কথা ভাবি।

সময়ের স্রোতে ভেসে আমাকেও নামতে হয়েছিল ব্যবসায়। পরিসরটা দাদার ব্যবসার চেয়ে ছোট ছিল। কারণ, এ সময়ে আমাদের পরিবারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। আমার বাবা মারা গেছেন, দাদাও আধা-পঙ্গু হয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতেন। ব্যবসা করা কিংবা ফতুর হওয়ার সুযোগ ছিল না তাঁর।

সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে গিয়ে ঠেলাভ্যানে জিনিস বেচার লাইসেন্স নিলাম। মিষ্টি জলপাই, কমলা, শুকনো ডুমুর আর বিভিন্ন বাদামে ভ্যান সাজালাম। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের এলাকা থেকে একটু দূরে নদীর ওপর যে ব্রিজ চলে গেছে, ঠিক ওই ব্রিজের মুখেই ঠেলাভ্যান নিয়ে দাঁড়াব। কারণ, ওখানে সব সময় ভিড় লেগে থাকত। শহরের বিভিন্ন দিকের সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল ওটা। জায়গা বাছাইয়ের সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না, অল্প কয়েক দিনেই টের পেলাম, বেচাবিক্রি ভালই হচ্ছে।

তখন বসন্তকাল। উষ্ণ দিনগুলোয় খুব ভোরে ঠেলাভ্যানে মাল ভর্তি করে ব্রিজের ওখানে দাঁড়াতাম। সন্ধ্যায় যখন ফিরতাম, তখন ভ্যানে কিছু ঠোঙা এবং প্ল্যাস্টিকের ছাউনি ছাড়া আর কিছুই থাকত না। বিশেষ করে রোববারে, ছুটির দিনে, প্রচুর লোক ব্রিজের দিকে ঘুরতে আসত, আর কেনাকাটার এমন ধুম পড়ত যে, আমি দুটো ভ্যান ভর্তি মাল নিয়ে গেলেও যথেষ্ট ছিল না। ব্যবসা, এক কথায়, হু-হু করে বাড়ছিল।

ঘরে ফিরে দাদাকে এ সুখবর জানাতেই দেখি তিনি তাঁর আগের ধারণায় অনড়। প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দাদা বললেন, 'এখনও তুমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবে না। কারণ তোমার ব্যবসায় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তাই যত ইচ্ছা বিক্রি করতে পারছ। কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখো, কী হয়...'

তিন

দাদার কথাই সত্য প্রমাণিত হলো।

এক সকালে দেখি ঠিক আমারই মত ঠেলাভ্যান ভর্তি জিনিস নিয়ে ব্রিজের মাঝখানে দুই মহিলা এসে হাজির। তারা সম্পর্কে মা-মেয়ে। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে চাই, কারণ আমার পতনের পেছনে তারাই দায়ী। আমি তাদের আজীবন মনে রাখব।

মায়ের পোশাক-আশাক দেখেই বুঝতে পারছিলাম, তিনি খেত খামারে কাজ করেন। লম্বা, কালো স্কার্ট আর শাল পরেছিলেন তিনি। তাঁর ধূসর চুল ঘোমটায় ঢাকা ছিল। অদ্ভুত এক উদ্বেগ-আকুলতায় ভ্রু কুঁচকে রাখতেন। তাকালেই মনে হত, কারও দিকে বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিচ্ছে সে চাহনি।

কাস্টমারের জন্য জলপাই ঠোঙায় ভরে দেয়ার সময় কিংবা কমলা ওজন করার সময় ভ্রু ওপরে তুলে, নাকে-মুখে সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলে, তিনি এমন ভাবভঙ্গি করতেন, যে-কেউ দেখেই মনে-মনে ভাবত—আহা! কত না যত্নের সঙ্গে ভদ্রমহিলা এ কাজ করছে!

কাস্টমারের হাতে জিনিস তুলে দেয়ার সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দেখুন, আপনাকে

বেছে-বেছে ভাল কমলাগুলোই দিয়েছি।' কিংবা 'পরিমাণে একটু বেশিই দিয়েছি, শুধু আপনার জন্যই, বুঝবেন!'

আর মেয়েটির কথা কী বলব!

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করত না সে। যেন নিছক নিষ্প্রাণ অলঙ্কার! তবে এ কথা অস্বীকার করব না, যেহেতু বয়সে তরুণ ছিলাম, সুন্দরী নারীদের আমি পছন্দ করতাম। মেয়েটি যেহেতু আকর্ষণীয় ছিল, শুরুতেই আমার চোখ পড়েছিল তার ওপর।

তার বয়স হয়তো আঠারোর মত, অথচ দেখলে মনে হত তিরিশ বছর বয়স। আকর্ষণীয় এবং মোহনীয় শারীরিক গঠন ছিল। তার মুখ ছিল দুধের মত সাদা, কিন্তু সব সময় একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছায়া ছিল সেখানে। ফ্যাকাসে ঠোঁট আর চোখগুলো ছিল ধূসর এবং বিরক্ত। কেন জানি না, সে প্রায়ই ঘৃণার অভিব্যক্তি হিসেবে নাক কুঁচকাত। অধিকাংশ সময়ই তাকে গর্ভবতী নারীর মত মনে হত, যেন ক্লান্তি এবং অবসন্নতায় যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে।

তার মায়ের পায়ে থাকত পুরুষদের বড় সাইজের জুতো। চঞ্চল চড়ুই পাখির মত তিনি সারাক্ষণ ঠেলাভ্যানের পাশে ব্যস্ত থাকতেন। মেয়েটির পরনে ছিল আঁটোসাঁটো সোয়েটার, মিনি স্কার্ট। পাশের এক চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত আর সুঁই-সুতো দিয়ে কী যেন সেলাই করত।

চার

মেয়েটির নাম ছিল ইয়োনিস।

ফর্সা রূপের জন্য তাকে দেখলেই আমার মৌরি মসলার কথা মনে পড়ত।

অন্যদিকে আমি ছিলাম লম্বা এবং ভারী শরীরের মানুষ। নিয়মিত শেভ করি না, মাথার চুলও অগোছালো থাকে। গায়ের জোড়াতালি দেয়া জামা দেখে আমাকে ভবঘুরে ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এ ছাড়াও, নিজেকে সংবরণের যতই চেষ্টা করতাম না কেন, আমার আচরণ ছিল খুব রূঢ়। সহজেই রেগে যেতাম। আমার কর্কশ কণ্ঠ শুনেই ভয় পেত মানুষ।

বুঝতে দেরি হলো না, প্রতিযোগিতার বাজারে কেবল বেশভূষার জন্যই হেরে যাচ্ছি। কিছুদিনের মধ্যে মা-মেয়ে তাদের ঠেলাভ্যান বলতে গেলে প্রায় আমার ঠেলাভ্যানের পাশাপাশি নিয়ে এসেছে। পাখির কিচিরমিচির শব্দের মত করে ইয়োনিসের মা আওয়াজ তুলতেন, 'দেখে যান, কেমন কমলা! দারুণ কমলা! আমার থেকে কমলা কিনুন!'

অন্যদিকে আমার ওভারকোটের বোতাম গলার নিচ পর্যন্ত লাগানো থাকত, চোখদুটো ঢাকা থাকত মাথার ক্যাপে। এর ভেতর থেকে কর্কশ কণ্ঠে বলতাম, 'কমলা, মিষ্টি কমলা, কমলা।'

দু'পক্ষের ডাকাডাকিতে কাস্টমাররা প্রথমে দ্বিধায় ভুগত। প্রথমে তারা আমার দিকে তাকাত, তারপর মায়ের দিকে এবং সব শেষে মেয়ের দিকে। অতঃপর তারা, বিশেষ করে পুরুষেরা, দুই মহিলার দিকেই এগিয়ে যেত।

স্বজাবজাত ঢং এবং ভ্রু ওপরে তোলা ভঙ্গিতে ফল ওজন করার সময়ও ইয়োনিসের মা 'কিনুন, কিনুন' হাঁক দিয়ে যেতেন। তাঁর শঙ্কা ছিল, তিনি যখন ফল ওজন করছেন, ওই অবসরে না জানি কোন্ কাস্টমার আমার ভ্যানের দিকে চলে আসে! এমনই লোভী ছিলেন তিনি।

সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র

১ম গেট, ঢাকা নিউ মার্কেট।

রহস্যপত্রিকা সহ সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের

নতুন ও রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৮১৯-২০১৫৭১

এমন তৎপরতায় বাড়তি কাস্টমার দেখে প্রায়ই তিনি ইয়োনিসকে তাড়া দিতেন, 'এই, মেয়ে, ওঠো, কাজে হাত লাগাও।'

হাতের জিনিসগুলো রেখে ইয়োনিস দু'ধাপে উঠে দাঁড়াত, অনেকটা রাজকীয় ঢঙে, প্রথমে বুক তুলত, এরপর কটিদেশ। অবনত চোখে, কাস্টমারের দিকে না তাকিয়ে, কাজ করে যেত। তারপর কোনও কথা ছাড়া, হাসি ছাড়া, আবার বসত চেয়ারে।

খুব অল্প সময়ে, তীব্র প্রতিযোগিতায়, আমার প্রায় সব কাস্টমারকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল এই দুই নারী। তাই এদের আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

ইয়োনিসের মায়ের প্রতি আমার ঘৃণার তীব্রতা ছিল বেশি, কারণ কোনও দ্বিধাগ্রস্ত কাস্টমারকে নিজের দিকে ভাগিয়ে নিতে পারলেই তিনি আমার দিকে কিস্তিমাতের বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে দিতেন। এমন অবস্থায় মন-মেজাজ তিক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমারও তত দিনে-দিনে আরও রুক্ষ, কঠোর এবং ক্ষ্যাপাটে হয়ে উঠছিলাম।

লম্ব দাড়ি, জোড়াতালি জামায় নানান অঙ্গভঙ্গি আর খসখসে কণ্ঠে বেসুরো চিৎকার করতাম: 'ও-ই মিষ্টি ক-ম-লা!' এমন দাঙ্গাবাজ আওয়াজ শুনে লোকজন আমার দিকে তাকাত, ভয় পেত, এবং আস্তে করে ইয়োনিসদের ভ্যানের দিকে এগিয়ে যেত।

পাঁচ

একদিন আমার আগ্রাসী আচরণে বিশ্রী এক কাণ্ড ঘটল।

বয়সে তরুণ, ছোটখাটো শরীরের এক কাস্টমার এসেছিল ফুলবাবু সেজে। সঙ্গে ছিল তার দ্বিগুণ আকৃতির এক মহিলা।

তারা আমার ভ্যানের ফলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল, কিন্তু কিনবে কি কিনবে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। ওদিকে আমি চরম বিরক্তি নিয়ে অনুরোধ করে যাচ্ছিলাম, 'আমার কমলাগুলো খুবই ভাল, দেখুন...'

এরপরেও সে কমলাগুলো হাতে নিয়ে নানানভাবে পরখ করছিল আর মাথা নাড়ছিল। পাশের স্থূলকায়া মহিলাটি সম্ভবত তার মা ছিল, যিনি মোটামুটি চুপচাপই ছিলেন।

হঠাৎ ফুলবাবুটির চোখ গেল সুন্দরী ইয়োনিসের দিকে। অসভ্য শুয়োর ফুলবাবুটি আমার ভ্যান ছেড়ে যখন ইয়োনিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি ধৈর্যের সীমা হারালাম।

ফুলবাবুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'আমার কমলাগুলো কিনবি না? পছন্দ হয় না আমারগুলো? বুঝি, সবই বুঝি, কেন ওই হাতির মত মহিলার ফলগুলোর দিকে তোর চোখ গেছে! বুঝি, ওর মেয়েটাকে দেখলে জিভ লিকলিক করে, তাই না?'

লোকটিও ছাড়ার পাত্র নয়, হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'হাত ছাড়, নইলে এক ঘুষিতে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেব!'

'হা! চেষ্টা করেই দেখ না, বুঝতে পারবি তারপর,' এক হাতে কাঁচের বোতল নিয়ে ধমকে উঠলাম। এর মধ্যে লোকজন জড় হয়ে গেছে। শেষতক পুলিস এসে আমাদের আলাদা করল।

এ ঘটনায় দুটি বিশেষ ব্যাপার আমার নজরে আসে। প্রথমত: এই প্রথম আমি ক্ষোভে বিস্ফোরিত হয়েছিলাম ঈর্ষা থেকে, প্রতিযোগিতার ক্রোধ থেকে নয়। দ্বিতীয়ত: এ হাতাহাতির ঘটনায় যখন পুলিস এসে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল, ইয়োনিস তখন প্রচ্ছন্নভাবে আমার পক্ষ নিয়ে বলে: কিছু দেখেনি বা শোনেনি সে।

ফলশ্রুতিতে, ইয়োনিসের প্রতি আমার ভাললাগা আরও তীব্র হয়। তার মা তখন ছিল না সেখানে। ওই একাকী সময়ের সুযোগ নিয়ে ইয়োনিসকে আমার সঙ্গোপন অনুভূতির কথা জানাই। বলি, আমি তাকে ভালবাসি।

ছয়

ইয়োনিসকে আমার ভালবাসার কথা জানানোর ভঙ্গিতে কোনও ভণিতা ছিল না। বরং কণ্ঠে ছিল

আমার স্বভাবজাত কাঠিন্য

ইয়োনিস আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়নি। মুখ তুলে বলেছিল, 'তোমাকেও আমি পছন্দ করি।' এ চারটি শব্দ শুনে আমার মনের ভেতর কী তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল, তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না

ঠেলাভ্যানের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে সেদিন আমি নদীর তীর ঘেঁষে হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে ঘরে ফিরছিলাম পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজন আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন পাগল হয়ে গেছি আমি।

পাগল হইনি, সীমাহীন সুখী হয়েছিলাম। জীবনে এই প্রথমবার কোনও নারী আমাকে ভাল লাগার কথা বলেছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, ইয়োনিসকে নিজের মত করে পেয়ে গেছি।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে বসে, এটা-ওটা আলাপ শেষে, আমি যখন ইয়োনিসের কোমরে হাত রাখতে চাইলাম, চুমু খেতে চাইলাম, তখন বুঝলাম তাকে আমি এখনও পুরোপুরি জয় করতে পারিনি। অনেক পথ বাকি এখনও!

জড়িয়ে ধরতে চাইলে ইয়োনিসের শরীর মৃত মানুষের মত হয়ে যেত; হাতদুটো ঝুলে যেত, শরীর শিথিল আর পা-দুটো বাঁকা হয়ে থাকত। চুমু খেতে চাইলে আমার ঠোঁট কখনওই তার ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অসহযোগিতার কারণে ইয়োনিসের গলা কিংবা বড়জোর থুতনি পর্যন্ত গিয়ে থামতে হত আমাকে।

এরপর আমরা সময়-সুযোগ পেলেই দেখা করতাম। কিন্তু শারীরিক ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল।

একদিন অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আমরা এরকম দেখা-সাক্ষাৎ করছি কেন তা হলে?'

সে বলে, ...তুমি বড্ড বেশি একরোখা, মহিলাদের সঙ্গে আচরণে তোমাকে আরও নম্র হতে হবে। তুমি কমলা বেচার মত জোরাজুরি করে সব কিছু পেতে চাও।'

আমি জবাবে বলি, 'তোমার এত কথা বুঝি না, আমি তোমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত... বিয়ের পর আমরা অন্যসব ব্যাপার নিয়ে আলাপ করব।'

ইয়োনিস না-সূচক মাথা নেড়ে বলে, 'বিয়ে করতে হলে পারস্পরিক ভালবাসা থাকতে হয়। আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি না আমার ভালবাসা পেতে হলে তোমাকে ভদ্র হতে হবে। ...কেবল নম্র হলেই আমার ভালবাসা পাবে

তার এ কথায় আমি এমনই পেলাম যে, আর কখনও তার কোমরে হাত রাখার চেষ্টা করিনি।

ভাল হওয়ার চেষ্টায়, ভদ্র ও শোভন দূরত্ব রক্ষায়, আমরা প্রায় ভাই-বোনের সম্পর্কে চলে গেলাম। কালেভদ্রে আমি তার হাত ধরতাম।

এ ব্যাপারগুলো আমার কাছে মোটেও স্বাভাবিক কিছু বলে মনে হত না। কিন্তু ইয়োনিস আমাকে ভদ্র আচরণ করতে এত চাপাচাপি করত যে, মনে হত আমার অনেক চিন্তাভাবনাই ভুল। মনে হত, আমি প্রেম-ভালবাসার কিছুই বুঝি না।

সাত

একদিন বিকেলে, ইয়োনিসের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল না সেদিন, আমি তাদের বাড়ির ওদিকটার রাস্তায় আনমনে হাঁটছিলাম।

আচমকা দেখলাম, আমার সামনে দিয়ে দ্রুত পায়ে ইয়োনিস হেঁটে যাচ্ছে। আমাকে লক্ষ করেনি সে। আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যে আমি খানিক তফাত থেকে তাকে অনুসরণ করলাম।

দেখলাম, সে নদীর ধারের একটি জায়গায় গেল। সেখানে এক লোক আগে থেকে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তার পরের দৃশ্যগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল। ইয়োনিস লোকটির কাঁধে হাত রাখল, মুখে হাত বুলাল। লোকটিও ইয়োনিসের কোমরে হাত রাখল। তারপর তারা পরস্পরের ঠোঁটে গাঢ় চুমু দিল। এই লোকটি মাত্র এক মিনিটের মধ্যে এমন সবকিছু করে ফেলল, যা আমি গত এক মাসে ভদ্র-নম্র আচরণ করেও পাইনি!

তারপর লোকটি অন্য দিকে মুখ ঘোরালে রাস্তার লণ্ঠনের আলোয় আমি তাকে চিনতে পারি। খাটো, মোটা, বয়সে তরুণ লোকটিকে কয়েক দিন ধরে আমাদের ঠেলাভ্যানের আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। পেশায় কসাই সে, ব্রিজের কাছাকাছিই দোকান। দৈহিক গঠন বিবেচনা করলে, আমার তুলনায় সে নিতান্তই তুচ্ছ।

কেবল একটাই পার্থক্য–তার নিজের দোকান ছিল, আমার ছিল না। আমার পকেটে থাকা চাকুটি বের করলাম, আবার রেখে দিলাম। নিজেকে সংবরণ করে ওখান থেকে সরে গেলাম।

আট

পরদিন ঠেলাভ্যান বাড়িতে রেখে রাস্তায় বের হলাম।

ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত লাগিয়ে, মাথার ক্যাপে চোখ ঢেকে ব্রিজ এলাকায় গেলাম কাস্টমার সেজে। না চেনার ভান করে তীব্র কর্কশ এবং কঠোর কণ্ঠে ইয়োনিসের মাকে বললাম, 'এক হেক্টোগ্রাম জলপাই দাও, বেছে-বেছে ভাল থেকে দাও। বুঝতে পারছ?'

ইয়োনিস বরাবরের মতই চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে কাজ করছিল। আমার দিকে তাকানোর সৌজন্যও দেখাল না। নিশ্চয়ই সে অনুমান করছিল, বাজে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

তার মা যখন কোনও ঢং ছাড়া, অনেকটা দেমাগ নিয়ে জলপাই ওজন করছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমাকে দয়া করে জলপাই দিচ্ছে, ঠিক তখনই আগের দিনের কসাইটি সেখানে এল। সোজা ইয়োনিসের কাছে গেল সে।

আমি উচ্চস্বরে বললাম, 'প্রতিদিন যেরকম চুরি-চামারি করে ওজনে কম দাও, সেরকম করবে না, বুঝলে!'

এ কথা শুনে ইয়োনিসের মা ডাইনী বুড়ির মত করে বলল, 'এহ্! আমি ওজনে কম দিই না! তুমি দাঁও! আর এজন্যই তো লোকজন তোমার থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করেছে!'

তখন কসাইটি ইয়োনিসের মাথায় হাত বুলাচ্ছিল, কাছাকাছি ঘেঁষে কানে-কানে কী যেন বলছিল।

জলপাইয়ের প্যাকেটটি হাতে নিলাম। একটা জলপাই মুখে দিয়ে তীব্র বিস্বাদে থুহ্ করে ইয়োনিসের মায়ের মুখে ছুঁড়ে দিলাম, 'ইস্! এক্কেবারে পচা জলপাই দিয়েছে!'

মহিলা রাগান্বিত স্বরে উত্তর দিল, 'তুই পচা, কুৎসিত ভবঘুরে কোথাকার!'

বললাম, 'আমার টাকা ফেরত দাও! তাড়াতাড়ি! কোনও বাড়াবাড়ি করবে না!'

'কী বললে, টাকা ফেরত? ভাগো এখান থেকে!' জবাব দিল মহিলা।

ঠিক তখনি কসাইটি পাছা দুলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এদিকে এসো, বলো, কী চাও?'

'টাকা ফেরত চাই, এ জলপাইগুলো পচা,' বলতে-বলতে একটা আধ খাওয়া জলপাই তার মুখে থুতুর মত করে ছুঁড়ে দিলাম।

মুহূর্তেই আমার দিকে তেড়ে এল সে। আমার বুক বরাবর খামচি দিয়ে জামা টেনে ধরে বলল, 'শোনো, ভালয়-ভালয় এখান থেকে সরে পড়ো।'

কসাইটি আচরণে ক্ষুব্ধ ছিল, হিংস্র ছিল। আমি ঠিক এ মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলাম। কোনও কথা না বলে চোখের পলকেই এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

পাল্টা আক্রমণ হিসাবে একহাতেই লোকটির গলা ধরে ঠেলতে-ঠেলতে ভ্যান গাড়ির সঙ্গে চেপে ধরলাম। অন্য হাতে পকেটে থাকা চাকুটি বের করার চেষ্টা করলাম। লোকটির সৌভাগ্য, ধাক্কায় ঘুরে গেল ঠেলাভ্যানের চাকা। আমার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল সে। তার চারদিকে গড়াগড়ি খাচ্ছিল ভ্যানের সব ফল।

আশপাশ থেকে লোকজন যখন আমাদের দিকে দৌড়ে আসছিল, ইয়োনিসের মা তখন উন্মাদিনীর মত চিৎকার করছিল। খেয়াল করলাম, অতি উত্তেজনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমিও মাটিতে পা ফসকে পড়ে গেছি। যখন উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, তখন দেখলাম আমার সামনে দু'জন পুলিস। আমার হাতের মুঠোয় চাকু, যদিও খোলার সময় পাইনি। তবুও, ওটুকুই

যথেষ্ট ছিল। তারা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল থানায়।

নয়

কয়েক মাস জেল খেটে যখন মুক্ত বাতাসে ফিরে এলাম, তখন দেখতে আমি আরও কুৎসিত হয়েছি। ঠেলাভ্যানে ফল বেচার লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে। হাতে টাকা নেই। নৈরাশ্যে ডুবে আছি।

এমন দুরবস্থা দেখে দাদা বললেন, 'শোনো, তুমি প্রতিযোগিতার শিকার। ...ব্যবসা-বাণিজ্যে চাকু দেখিয়ে কাজ হয় না। চাকু বেচার ব্যবসা করতে পারো, কিন্তু চাকু ঠেকিয়ে ব্যবসা কোরো না কখনও।' দাদার কথার কোনও জবাব দিইনি সেদিন।

রোদেলা দুপুরে ব্রিজের দিকটায় হাঁটতে গেলাম। দেখলাম, কসাইয়ের দোকানটি খোলা। কিছু কাটা মাংস ঝুলছে দোকানের সামনে। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল জামার হাতা গুটিয়ে উজ্জ্বল রক্তিম চেহারার কসাইটি। ছোরা হাতে মাংসের টুকরো সাইজ করছিল।

কাউন্টারের সামনের দিকে নিচে একটি চেয়ারে বসে সুঁই-সুতো আর কাপড় হাতে ইয়োনিস। আমার মাথায় ভাবনা ঘুরপাক খেল, তারা হয়তো এখন বিবাহিত। ইয়োনিস হয়তো সত্যি-সত্যি গর্ভবতী, কারণ সে সুঁই-সুতোয় গোলাপি রঙের যে জামাটি বানাচ্ছিল, তার আকার ছিল অনেক ছোট। সম্ভবত অনাগত নবজাতকের জন্যই তৈরি করছিল ওটা।

সামনে এগিয়ে রাস্তার চারপাশের দোকান দেখছিলাম। আশা করছিলাম, হয়তো অন্য কোনও মাংসের দোকান পাব আশপাশে; যারা কি না ইয়োনিসের স্বামীর ব্যবসার প্রতিযোগী হবে, প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ইয়োনিসদের পথে বসিয়ে দেবে। কামার-কুমার-টিন মিস্ত্রী, রঙ মিস্ত্রীসহ কতরকম ব্যবসার দোকান দেখলাম আশপাশে, অথচ একটাও মাংসের দোকান চোখে পড়ল না। ব্রিজের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলাম, আর আশা রেখে লাভ নেই।

দ্রুত হেঁটে ব্রিজটা পার হয়ে এলাম। ■

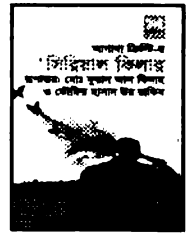

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
আগাথা ক্রিস্টি-র
সিরিয়াল কিলার
রূপান্তর
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
তৌফির হাসান উর রাকিব

পুলিসের নাকের ডগায় একের পর এক খুন করে চলেছে এক দুর্ধর্ষ খুনি! রহস্যময় এই ঘাতক, শিকার বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে মেনে চলছে অদ্ভুত এক সিরিয়াল–ইংরেজি বর্ণমালা! খুনের স্থান-কাল অগ্রিম জানিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হলো দুঁদে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে, 'পারলে ঠেকাও আমাকে...' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সাথে নিয়ে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামল পোয়ারো; কিন্তু মহা ধুরন্ধর আর বেপরোয়া খুনিটার সঙ্গে এঁটে ওঠা যে বড্ড কঠিন! ধীর লয়ে 'এ' থেকে 'জেড'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে লোকটা। কে সে? কী চায়? কিছুই জানা নেই! তবে এটা ঠিকই জানা আছে যে, খুব তাড়াতাড়ি লোকটাকে থামাতে না পারলে, প্রলয় নেমে আসবে গোটা ইংল্যাণ্ডের ওপর! প্রিয় পাঠক, চলুন এই মহাবিপদে পোয়ারোর পাশে থাকি। সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি, ভয়ঙ্কর খুনিটাকে পাকড়াও করা যায় কিনা!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মা, আমি আর জিন

আনিকা চৌধুরী

ওঝা ঘরে ঢুকেই আম্মার দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ! তুই আমাকে এখন কেন ডেকেছিস!'

যখন থেকে সব মনে থাকার বয়স শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বলি। আব্বু, আম্মু, আর আমরা দুই বোন– এ-ই নিয়ে আমাদের সুখের সংসার।

আব্বু চাকরিজীবী, সরকারি চাকরির কারণে প্রায়ই বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন পড়ি তৃতীয় শ্রেণীতে। আব্বুর চাকরি ছিল ময়মনসিংহের নান্দাইল থানায়।

থানার ভিতরে ব্যবস্থা হলো আমাদের থাকার। যে ঘরটাতে উঠলাম, ওটা নাকি এক সময় ছিল ঘোড়ার ঘর। লোকজন বাস করেছে বলে পরে উপযুক্ত হয়েছে বসবাসের।

টিনের বাড়ি। দুটো রুম। টয়লেট বাইরে।

নতুন জায়গা, পরিবেশটা মন্দ নয়।

থানার তিন পাশেই নদী। একপাশে পাকা রাস্তা।

নতুন স্কুল। মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় গেলেও পেয়ে গেলাম বেশ ক'জন সঙ্গী-সাথী। এরপর ভালই কাটছিল সময়।

বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকেন না আব্বু, তাই বাজারের কাজটা আমিই করতাম।

এটা ভাবলে আজও অবাক লাগে, মাত্র দশ টাকা নিয়ে বাজারে যেতাম। এক টাকার পান এক টাকার সুপারী। এক কেজি দুধ মাত্র এক টাকা পঁচিশ পয়সা, আর বাকি টাকা থেকে তিন-চার টাকার মাছ আর দুই-তিন টাকার তরকারি। তারপরও টাকা বেঁচে যেত। নদীতে মাত্র দশ পয়সা দিয়ে খেয়া পার হতাম। আর এখন দশ টাকায় ভাল একটা চকলেটও পাওয়া যায় না।

আমাদের বাসার সঙ্গে ছিল বিরাট এক তালগাছ। একদিন শীতের সকালে আমরা সবাই রোদ পোহাচ্ছি, হঠাৎ কোথা থেকে অনেকগুলো শকুন এসে বসে পড়ল তালগাছে। পাশের বাসার এক বয়স্ক ভদ্রলোক আব্বুকে ডেকে বললেন, 'হাবিব সাহেব, একটু সাবধানে থাকবেন, আপনার কোনও বিপদ আসতে পারে।'

তখন আমরা কেউ তাঁর কথা পাত্তা দিইনি। নিছক কুসংস্কার মনে করে উড়িয়ে দিয়েছি।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা কোনওটাই আর নাড়াতে পারলেন না আম্মু। ডাক্তার ডাকা হলে, তিনিও তেমন কিছু বুঝতে না পেরে আম্মুকে ময়মনসিং এসকে হাসপাতালে নিতে বললেন।

আব্বু আমাদের সঙ্গে করে আম্মুকে

ময়মনসিং সদরে নিয়ে গেলেন। ওখানে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিছুই ধরা পড়ল না। তবুও কিছু ওষুধ লিখে দিলেন ডাক্তার।

সেই [illegible] আম্মুকে খাওয়ানো হলো। কিন্তু ভাল হ[illegible] কোনও লক্ষণ নেই [illegible] দীর্ঘ তিন মাস আম্মু বিছা[illegible] আমি, [illegible] আর বোনটা কেম[illegible] দি[illegible] উপরওয়ালাই [illegible]। কিছুতেই য[illegible] আম্মুর শরীর ভাল হচ্ছে না [illegible] এক পরিচিত বললেন আব্বুকে এক ওঝার কথা।

অবস্থা এত শোচনীয়। তাই আব্বু ওঝাকে নিয়ে এলেন বাসায়।

ওঝা ঘরে ঢুকেই আম্মার দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ! তুই আমাকে এখন কেন ডেকেছিস! ওকে তো শেষ করে দিয়েছে।'

ওঝার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন আব্বু। বললেন, 'বাবা, আমার বাচ্চা দুটো এতিম হয়ে যাবে। আপনি যা হোক কিছু করেন।'

ওঝা ঘর থেকে বাইরে গিয়ে আমাদের সারাঘরের চারপাশে চক্কর দিলেন, পরে আম্মুর মাথার পাশে বসে ফুঁ দিতে লাগলেন।

আম্মু পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলেন। একসময় জ্ঞান হারালেন।

মন্ত্রপড়া বন্ধ করলেন কবিরাজ। এরপর কিছু ভেষজ তেল দিয়ে বললেন, 'প্রতিদিন সারাগায়ে মালিশ করতে হবে। বাকিটা আল্লার ইচ্ছা।'

আব্বু জানতে চাইলেন, কী হয়েছে আম্মুর।

ওঝা বললেন, 'তোর বউকে জিনে ধরেছে। অনেক আগে থেকেই পিছনে লেগে ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর ওর সুবিধা হয়েছে। কারণ এ জায়গাটা ভাল না। যত তাড়াতাড়ি পারিস বাসা বদলে ফেলিস। আর কোনও সমস্যা হলে আমাকে খবর দিবি।'

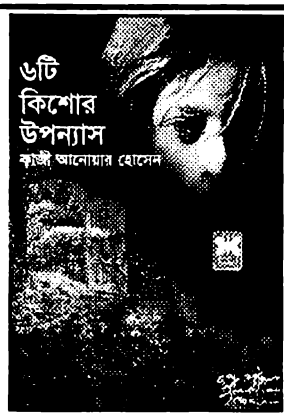

এর কিছু দিন পর সুস্থ হলেন আম্মু। এরপর দীর্ঘ দিন যাবৎ ভালই আছেন। ■

প্রকাশিত হয়েছে
বিদেশি কাহিনির ছায়া নিয়ে
৬টি কিশোর উপন্যাস
কাজী আনোয়ার হোসেন

ইসকুল বাড়ি
ছোটকুমার
ঘরের শত্রু
ফুলবাগান
ক্লাস এইট ও
ইতিকথা

এ-ছয়টি কিশোর উপন্যাসকে এই প্রথম একসঙ্গে এক মলাটে প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি যাঁরাই কিশোরকাহিনি পছন্দ করেন, বইটি তাঁদের ভাল লাগবে।

দাম ■ একশ' ছিয়াত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

উড়ো চিঠি

মূল ▮ লরেন্স ব্লোক
রূপান্তর ▮ আফরানুল ইসলাম সিয়াম

সে খুনি নয়, রক্ত দেখলেই ভয় পায়! ভাবাই যায় না যে খুন করবে।

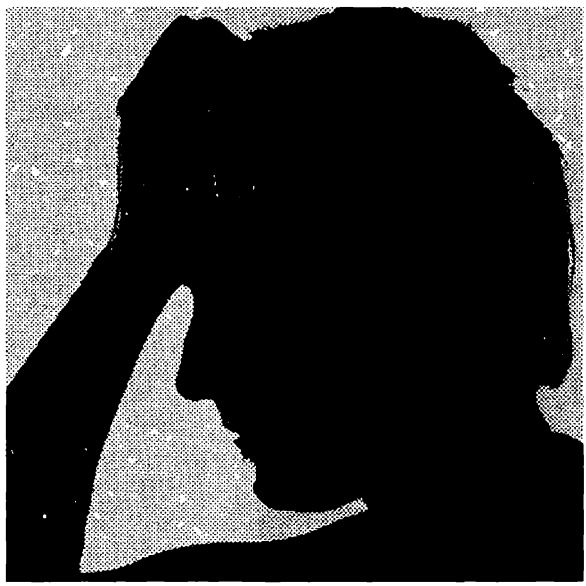

এডগার ক্রাফট ঘোড়দৌড় দেখতে এসেছে সারটাগোর মাঠে। নিয়মিত আসে এখানে, নিয়মিত বাজিও ধরে। খেলাটা তার কাছে অনেকটা নেশার মত, হার-জিত-রোমাঞ্চ ভাল লাগে তার।

আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, হৃষ্টপুষ্ট এক ঘোড়ার উপর সে আট শ' ডলার বাজি ধরেছে। সাতাশ নাম্বার ঘোড়ার নাম: 'ঘূর্ণিঝড়'; দেখতে বেশ তাগড়া। আগের সপ্তাহে খোঁজ নিয়েছিল সে, তখনই মনে-মনে ঠিক করেছে, আজ এটার উপর বাজি ধরবে। শুরুটা হলো চমৎকার, 'ঘূর্ণিঝড়' অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য ঘোড়াকে পিছনে ফেলে দিল। তুমুল করতালি, মানুষের চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে গ্যালারি থেকে। ক্রাফট বেজায় খুশি, আজ সে জিতবেই। তার ধারণা ভুল হয়নি, এখন পর্যন্ত 'ঘূর্ণিঝড়' প্রথম স্থান দখল করে আছে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু এক চক্কর শেষ করে দ্বিতীয় চক্করে হঠাৎ করেই ঘোড়াটি পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, ওকে আবার নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হলো ঘোড়সওয়ারের। এটি ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু ক্ষতি যেটুকু হওয়ার হয়ে গেছে। প্রথম হলো নয় নম্বর ঘোড়াটা, সাতাশ নম্বর ঘোড়া পঞ্চম। ক্রাফট তার টিকেট রাগে ছিঁড়ে ফেলল, একটুর জন্যে হেরেছে সে।

জুয়া খেলার অভ্যাস ওর অনেক দিনের। রেসের কিছুদিন আগে থেকেই খোঁজ-খবর নেয় ঘোড়া

আর রেস সম্পর্কে, তখনই ঠিক করে ফেলে জুয়া খেলবে কোন্ ঘোড়ার উপর। এইবারও তাই করেছিল, কিন্তু একটুর জন্য হারল। সাধারণত আরও কম টাকার বাজি ধরে, কিন্তু আজই প্রথম এত খরচ করল। কিন্তু জিততে-জিততেও হেরে গেল শেষে। বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে লাগল, এতগুলো টাকা সে কীভাবে হেরে গেল! পারবে তো এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে? মেজাজ খিটখিটে হয়ে আছে তার, এই ক্ষতি পূরণ করতে কয়েকমাস লেগে যাবে।

পরদিন ভোর। ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওঅকে বেরোল ক্রাফট। আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করে ফিরল, এখনও মাথা থেকে যাচ্ছে না গতকালের ঘটনা। খুলে দেখল, ডাকবাক্সে এসেছে মোট ছয়টা চিঠি। পাঁচটাই বকেয়া বিলের, কিন্তু একটা আলাদা। প্রেরকের নাম নেই, শুধু প্রাপকের জায়গায় লেখা তার নাম। একপাশে স্থানীয় ডাকটিকিট সাঁটা। যে পাঠিয়েছে, সে এই এলাকাতেই থাকে। খামের ভেতরে শুধু একটা পাতা, সেখানে টাইপ করে লেখা একটা নাম:

মি. জোসেফ এইচ. নেইম্যান

নিচে লেখা: 'এই ব্যক্তি মারা গেলে, আপনি পাবেন ২০০০ ডলার।'

গতকাল রেসে টাকা হেরে মেজাজ এমনিতেই খারাপ, তার উপর এই রসিকতা। এই নামে কাউকে চেনেই না সে! বা কোথাও শোনেনি এই নাম। আবার লিখেছে, এই লোক মরলে তাকে টাকা দেবে!

ফালতু রসিকতা! টাকা কি এত সস্তা!

মনে-মনে চিঠির প্রেরকের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করল সে, তারপর কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। পরের পুরোটা সপ্তাহ সে নিজের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকল। চিঠির বিষয়ে ভাবার সুযোগই পেল না। তবে দুই-একবার চিঠির কথাটা মাথায় একেবারে আসেনি, তা-ও নয়।

কে করল তার সঙ্গে এই রসিকতা?

মনে পড়লেই ওই গর্দভের উদ্দেশে গালিগালাজ করে। তার কাছে বিষয়টি এতটাই গুরুত্বহীন, বউকে এ ঘটনা বলার প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা: কীভাবে অফিসের টাকার খরচের হিসাব বসকে দেবে। খুব ছোট চাকরি করে সে, অফিস সেকশনের হিসাবরক্ষক। এই চাকরি থেকে যে অল্প কিছু টাকা আসে, তা দিয়ে সংসারই চলে না, তার ওপর আছে জুয়াখেলার অভ্যাস। প্রতি সপ্তাহেই ঘোড়ার উপর বাজি ধরা চাই-ই চাই। কোনও সপ্তাহে দেড়-দু'শো ডলার জেতে, পরের সপ্তাহে আবার হেরে বসে এক শ' ডলার। টাকা-পয়সার টানাটানি সারা মাস ধরেই চলে।

নানান ঝামেলায় যখন ওই চিঠির কথা প্রায় ভুলতে বসেছে, তখনই পেল দ্বিতীয় চিঠি। খামের ভিতরে একটামাত্র কাগজ, আর এক তোড়া নোট। গুনে দেখল, পুরো দু'হাজার ডলারই আছে।

কাগজে মাত্র একটি শব্দ লেখা: 'ধন্যবাদ।'

ক্রাফট বুঝে পেল না, হুট করে এভাবে এত টাকা বিনা কারণে কেন পাঠাবে কেউ? আর সে এমন কী করেছে, যে কারণে কেউ তাকে ধন্যবাদ দেবে? তা-ও আবার চিঠি লিখে!

খামটা উল্টে দেখল, প্রেরকের কোনও ঠিকানা নেই, শুধু স্থানীয় ডাকটিকিট সাঁটা। হঠাৎ করেই ওর মনে পড়ল সপ্তাহ কয়েক আগের কথা।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মি. জোসেফ এইচ. নেইম্যান নামটি। মনে-মনে কিছু দিন খুঁজেওছে পরিচিত মহলে। কিন্তু ওই নামের কেউ নেই বলে পরে ভুলে গেছে।

ক্রাফট যা ভাবছে, তা-ই হলো নাকি ওই লোকের?

মারা গেছে?

জানার উপায় একটাই। ঘাঁটতে হবে পত্রিকা।

জলদি কাছের পত্রিকার দোকানে গেল সে।

আজকের পত্রিকা উল্টে মৃত্যু-সংবাদের পাতায় যেতেই দেখল:

'জোসেফ হেনরি নেইম্যান (৬৭)

রোড নং ৬, ৪১৩ পার্ক প্লেস।

গতকাল রাত নয়টায় মারা গেছেন। অনেকদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন হৃদ্‌রোগে। গত ছয়মাস হাসপাতালে ছিলেন চিকিৎসার জন্য। বর্তমান আছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে আজ দুপুর দুটোয়। নিজেদের পারিবারিক কবরস্থানে কবরস্থ করা হবে তাঁকে।'

ক্রাফট বারো শ' ডলার তার ব্যাংকে জমা করল, বাকি আট শ' পকেটে। বাসা ভাড়া,

দোকানের বিল, গাড়ির কিস্তি সব মিটিয়ে দিল সে। যাদের কাছ থেকে অল্প টাকা ধার করেছিল, তাদের ধার শোধ করে দেয়ার পরেও তার পকেটে থেকে গেল অনেক টাকা। এখনও আছে তার অনেক দেনা, কিন্তু জোসেফের মৃত্যুর আগে যা ছিল, তার থেকে কম। কেউ তাকে টাকা দিতে চাইলে, না নেয়ার মত মানুষ সে নয়। সেই রাতে বউকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়দৌড় দেখতে গেল, বাজি ধরাল বউকে দিয়ে। এক শ' ষাট ডলার হারার পরও হাসিমুখে বউকে নিয়ে দামি রেস্তোরাঁয় ডিনার সারল। ডিনার শেষে ওয়েটারকে দিল ভাল বকশিশ, তারপর ফিরল বাড়িতে।

কয়েক দিন পর আবার যখন আরেকটা চিঠি পেল, ঘাবড়ে গেল ক্রাফট। রুমে গিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে খাম খুলল। ভিতরে শুধু একটা কাগজ।

ক্রাফট ভাবল, ওই লোক যদি টাকার বদলে কিছু দাবি করে বসে? টাকা তো সব খরচ করে ফেলেছে সে, ফেরত দেবে কীভাবে?

ভয়ে-ভয়ে কাগজ খুলল। না, কোনও দাবি নেই; আছে মাত্র একটা নাম:

মি. রেমণ্ড অ্যাণ্ডারসন

'এই ব্যক্তি মারা গেলে, আপনি পাবেন ৩০০০ ডলার।'

কিছু দিন যাবৎ মি. রেমণ্ড অ্যাণ্ডারসনের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে ক্রাফট। যা-ই হোক, সে তো আর কারও ক্ষতি চাইতে পারে না।

মি. রেমণ্ড অ্যাণ্ডারসন নামে কাউকে চেনে না সে।

ক'দিন হলো নিয়মিত পত্রিকা রাখতে শুরু করেছে।

প্রতিদিন পড়ে পত্রিকার একটা পাতাই।

মৃত্যু-সংবাদের পাতা।

নিজের অজান্তেই বারবার খোঁজে নির্দিষ্ট এক নাম।

সে তো আর কারও ক্ষতি করছে না, কারও অনিষ্ট কামনা করছে না; কিন্তু তিন হাজার ডলার বেশ বড় অঙ্কের টাকা। সে তো আর অ্যাণ্ডারসনকে খুন করছে না, তার মৃত্যুতে যদি ওর কিছু লাভ হয়, তো ক্ষতি কী!

এমনও নয় যে, মনে-মনে অ্যাণ্ডারসনের মৃত্যু কামনা করছে।

কিন্তু পরে যদি... যদি কিছু হয়...

অবশেষে পাঁচ দিন পর অনাকাঙ্ক্ষিত খবরটি এল পত্রিকায়:

'মি. রেমণ্ড অ্যাণ্ডারসন (৮৬)

তিনি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতেন, বহুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। গতকাল সকালে নিজ বিছানায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।'

খবরটা পড়ে উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ক্রাফটের, অপরাধবোধও হচ্ছে কিছুটা। নিজের মধ্যে খুশি ও অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি আগে কখনওই এভাবে অনুভব করেনি।

কিন্তু কেন অপরাধবোধ হবে তার?

সে তো কোনও অপরাধ করেনি!

একজন বুড়োমানুষ মারা গেছেন, বেঁচে থাকলেই বরং আরও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেন, মরে গিয়ে ভাল হয়েছে তাঁর।

কিন্তু এর জন্য ক্রাফট টাকা পাবে কেন?

তার তো এখানে কোনও ভূমিকা নেই!

বিশ্বাস না হলেও টাকা পেয়েছে, কোনও কারণ ছাড়াই।

এটি কীভাবে সম্ভব সেটাই বুঝতে পারছে না সে।

পুরো ব্যাপারটাই এখনও ঘোলাটে।

পরদিন সকালে সেই চিঠিটি এল, যেটার জন্য অপেক্ষা করছিল ক্রাফট।

গতকাল সারারাত দোটানায় ছিল, চিঠি কি আসবে নাকি আসবে না?

অবশেষে এল আজ। ভিতরে পুরো তিন হাজার ডলার আর একটা কাগজ।

কাগজে শুধুমাত্র একটি শব্দ লেখা: 'ধন্যবাদ।'

কিন্তু ধন্যবাদ কীসের জন্য? ভাবল ক্রাফট।

সে তো কিছু করেনি!

শুধু-শুধু তাকে এত টাকা কে বা কেন পাঠাচ্ছে, ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। মনে-মনে যে চিঠি পাঠিয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানাল সে। টাকাগুলোর প্রয়োজন ছিল খুব।

দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, এখনও এল না নতুন কোনও চিঠি।

প্রতিদিন অপেক্ষা করে সে সেই সৌভাগ্যের

জন্য।

হ্যাঁ, সৌভাগ্য!

সৌভাগ্য না হলে কি আর তার কাছে এত টাকা এভাবে আসে?

আগের দুটো চিঠিই ছিল সৌভাগ্যের প্রতীক।

ইদানীং অফিসের কাজগুলো ঠিকমত করা হচ্ছে না তার।

সবসময় মাথার মধ্যে ঘোরে চিঠির কথা। এই চাকরি থেকে সে বেতন পায় বছরে মাত্র দুই হাজার ডলার, কাজ করে সপ্তাহে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঘণ্টা। গতবারের তিন হাজার ডলার খুব উপকারে এসেছে, কিন্তু এখনও সে ঋণে জর্জরিত। হুট করেই ওর স্ত্রী বায়না ধরেছে, কিনে দিতে হবে কার্পেট। সেজন্য খরচ হয়েছে অনেক। বাসা ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালা তিনবার নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছে, রাতের ঘুম হারাম হওয়ার জোগাড় ওর।

তবে অবশেষে এল তৃতীয় চিঠি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ডাকবাক্স দেখা এখন ক্রাফটের প্রতিদিনের রুটিন।

তিনটে চিঠি পেল সে

কী এক নতুন কোম্পানির প্রচারপত্র, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ফাণ্ডের আবেদন এবং সেই কাঙ্ক্ষিত চিঠি।

ওটা বাদে বাকি দুই চিঠি ফেলে দিল। ঘরে এসে খুলল চিঠিটা।

বরাবরের মতই, একটা নাম এবং একটা লাইন:

মি. ক্লড পিয়ার্স।

'এই ব্যক্তি মারা গেলে, আপনি পাবেন ৪০০০ ডলার।'

চার হাজার!

দিন-দিন দেখি টাকার অঙ্ক বাড়ছে! হতভম্ব হয়ে গেল ক্রাফট।

কাঁপা-কাঁপা হাতে চিঠি নামিয়ে রাখল টেবিলে। মি. ক্লড পিয়ার্স; এই নামের কাউকে চেনে সে? মনে পড়ছে না তো!

এই প্রথম শুনল নামটা।

আচ্ছা ক্লড কি অসুস্থ? নাকি অসহায় কোনও বৃদ্ধ, যে মৃত্যুর প্রহর গুনছে?

হয়তো!

সেরকমই আশা করছে ক্রাফট। যত জলদি এই লোক মরবে, ততই ভাল।

এইটা সে কী চেয়ে বসল? একজন মানুষের মৃত্যু কামনা করছে মনে-মনে!

নিজের প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত ক্রাফটের, কিন্তু টাকার পরিমাণটাও নেহায়েত কম নয়!

এইবার আগে থেকেই খোঁজ-খবর নিতে লাগল সে। ফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে-ঘেঁটে এক ক্লড পিয়ার্সকে খুঁজে পেল।

হ্যানিডেল ড্রাইভে বাড়ি তার।

পুরো বিষয়টি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল ক্রাফট, কিন্তু পারল না। ঘুরেফিরে ক্লডের নামটাই মাথায় আসছে বারবার।

কৌতূহলের কাছে হার মানল অবশেষে। আবার ডিরেক্টরি খুলে, ফোন নাম্বার টুকে নিল কাগজে।

চিঠির প্রেরক কীভাবে বুঝতে পারে যে এরা মারা যাবে? এটা কি ঠেকাবার কোনও উপায় নেই? নাকি এরমধ্যে অন্য কোনও ঘটনা আছে? অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করছে তার মাথায়। কিন্তু একটারও জবাব নেই।

এখন পর্যন্ত যেসব নাম পেয়েছে, তারা সবাই কিছু দিনের মধ্যেই মারা গেছে। এইবারও ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়ই, গতবারের মত পেয়ে যাবে সে টাকা।

ক্লডের ব্যাপারে আরও খোঁজ নিতে হবে। ডিরেক্টরির নাম্বারে ডায়াল করল সে। ওই পাশ থেকে ফোন ধরল এক মহিলা।

'মি. ক্লড পিয়ার্স আছেন?'

'না। তিনি তো হাসপাতালে ভর্তি।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি তার বন্ধু। রাখি, পরে কথা হবে।'

এই একটা ব্যাপারে সবার মিল আছে, চিঠিতে উল্লিখিত সবাই মৃত্যুপথযাত্রী।

কেউ বা একদল লোক এমন সব মানুষকে খুঁজে বের করছে, যাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তারপর চিঠি পাঠাচ্ছে ক্রাফটের ঠিকানায়।

কিন্তু এদের কী লাভ টাকা দিয়ে?

ওকে টাকা দিলেও মরবে ওসব মানুষ। তা হলে খামোকা টাকা দিচ্ছে কেন?

এই কেন-র উত্তর পাওয়াই মুশকিল।

সারাজীবন কত কেন-র উত্তর মিলল না,

তাই এই উত্তরটাও না হয় অমীমাংসিতই থাক।

নিজেকে কোনও গেম-শোর জ্যাকপট বিজয়ী মনে হচ্ছে তার।

কেউ একজন সেধে টাকা দিতে চাইলে, সে না করবে কেন?

ক্লড কোন্ ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে, তা আগেই জেনে নিয়েছে ক্রাফট। সন্ধ্যা হতেই ফোন দিল ওখানে। নার্সের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, দুই দিন আগে একটা অপারেশনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ক্লড, তবে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

এমন তো হওয়ার কথা নয়, হয়তো আবার ক্লড কোনও না কোনও অসুখে পড়বেন এবং মারা যাবেন।

চিঠিতে সেটাই লেখা হয়েছে।

তাকে অবশ্যই মরতে হবে। ক্ষণিকের জন্য ক্রাফট ওই লোকের জন্য দুঃখ অনুভব করল। হয়তো পৃথিবীতে আছে আর অল্প কিছু দিন।

ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন এসেছে পত্রিকায়। নতুন একটি ঘোড়া এসেছে, নাম 'তুফান'। দেখে এসেছে ক্রাফট ঘোড়াটা। আগামী রেসে ওটার উপরেই বাজি ধরবে।

রেস হলো, কিন্তু এবারও হারল সে।

সকালে পত্রিকায় মৃত্যুসংবাদ পড়তে লাগল।

নামটা তো নেই এখানে!

ক্লিনিকে ফোন দিয়ে জানল, ক্লড সুস্থ; অল্প কিছু দিনের মধ্যে রিলিজও পেয়ে যাবেন।

কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব?

হিসাব ঠিকমত মিলছে না।

পরের তিন সপ্তাহ প্রতিদিন মিস্টার ক্লডের খোঁজ-খবর নিতে লাগল ক্রাফট। তার আত্মীয়-স্বজনও হয়তো এতবার খোঁজ নেয়নি, যতবার ক্রাফট করেছে।

একবার রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটল, কোমায় চলে গেলেন তিনি। নার্সের মুখে এ কথা শুনে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

অদৃষ্টের লিখন কী খণ্ডন করা যায়!

শীঘ্রিই অনেক টাকা পেতে যাচ্ছে ক্রাফট।

এর মাঝেই হঠাৎ একদিন সুস্থ হয়ে উঠলেন ক্লড পিয়ার্স। হাসপাতাল থেকে রিলিজও হয়ে গেলেন অল্প কয়েক দিনের মধ্যে।

এটা কীভাবে হলো, কিছুই বুঝতে পারছে না ক্রাফট। সবকিছু তো ঠিকই চলছিল! কিন্তু মরতে-মরতে বেঁচে গেছেন লোকটা।

উনি তো বেঁচে গেলেন, কিন্তু নিজে তো এখন ঋণের বোঝায় মরতে বসেছে ক্রাফট। দু'মাসের বাড়িভাড়া দেয়া হয়নি, গাড়ির মাসিক কিস্তির টাকা বকেয়া; দু'জন সহকর্মী পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। এর মাঝেই ক্রাফট অপেক্ষা করছে চিঠির জন্য, যদি নতুন কোনও নাম আসে।

সব মিলিয়ে এখন বিপর্যস্ত প্রায় সে।

চিঠিতে লেখা ছিল: 'এই ব্যক্তি মারা গেলে...'

ক্লড তো আর অমর নন, একদিন না একদিন মরতেই হবে। আর মরলেই ক্রাফট পাবে চার হাজার ডলার।

কিন্তু এখন নিজেরই মনে সংশয় জন্মেছে: এতদিন পারবে নিজে বাঁচতে?

কাজেই কিছু করতে হবে!

এর সমাধান একটাই!

মরতেই হবে ক্লডকে!

খুব কঠিন কাজ তো নয়, চুপিচুপি কোনও একরাতে যাবে ক্রাফট। আর কাজ শেষ করে চলে আসবে। সে যে ক্লডের ব্যাপারে আগ্রহী, এটা কেউ জানে না। সুতরাং সন্দেহ করবে না কেউই।

মোটিভ কী?

বাস্তবে কাউকে খুন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে খুনি নয়, রক্ত দেখলেই ভয় পায়! ভাবাই যায় না যে খুন করবে। এ কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই চার হাজার ডলারের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

ভেবেছিল টাকা পেলে কী-কী কাজ করবে। কিন্তু হলো না কিছুই!

ওই টাকা পাওয়ার আর কোনও আশা নেই।

পরদিন সকালের পত্রিকার খবর দেখে চমকে উঠল সে।

খুন হয়েছে ক্লড পিয়ার্স!

গতকাল রাতে কে বা কারা ক্লডের বাসায় ঢুকে তাকে ছুরিকাঘাতে খুন করে। কেউ দেখেনি খুনিকে। খুনের সম্ভাব্য কোনও সূত্র এখনও খুঁজে পায়নি পুলিশ।

খবরটি পড়ে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল

এডগার ক্রাফটের।

ভুগছে তীব্র অপরাধবোধে। গতকালই ভেবেছিল এভাবে খুন করলে সবচেয়ে ভাল হয়, আর আজ ঠিক সেই উপায়েই খুন!

হাতে একটা ছুরি, চুপিচুপি ঘরে ঢোকা, তারপর খুন করে পালিয়ে আসা– এসবই ছিল তার প্ল্যানে।

নিজেও জানে, তাকে দিয়ে কিছুই হবে না, তারপরও নিজেকে খুব দোষী মনে হচ্ছে এখন। খুন করেনি বটে, কিন্তু খুনের প্ল্যান তো করেছিল? নিজেকে ঠাণ্ডামাথার খুনি মনে হচ্ছে তার।

ঠিক সময়ে পৌঁছে গেল পুরো চার হাজার ডলার। সেই সঙ্গে সেই পুরনো শব্দ: 'ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদ? সত্যিই কি সে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য?

টাকাগুলো দিয়ে সব ঋণ শোধ করে দিল সে।

কিছু দিনের মধ্যেই পেল নতুন চিঠি।

সেই আগের মতই দুটি লাইন লেখা:

মি. লিয়ন ডেনিসন

'এই ব্যক্তি মারা গেলে, আপনি ৬০০০ ডলার পাবেন।'

চিঠি পড়ার সময় বুক ধুকপুক করতে লাগল তার। নিতে লাগল ঘন-ঘন শ্বাস। দু'বার চিঠিটা পড়ার পর ঠিক করল কী করবে।

চিঠিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলল সে।

এত দিন সব যত্ন করে রেখে দিয়েছিল ড্রয়ারে।

তীব্র মাথাব্যথায় এখন মনে হচ্ছে মাথায় হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে কেউ। ব্যথানাশক কড়া ওষুধ খেয়ে অফিসে চলে গেল ক্রাফট। কোনও কাজে মন বসল না। লাঞ্চে সামান্য খেয়ে আবার বসে থাকল ডেস্কে। বিকালে বুঝল, এখন কী করা উচিত।

অফিস টাইম শেষ হওয়া পর্যন্ত ছটফট করল, এমন কী রেসের কোন্ ঘোড়ার উপর বাজি ধরবে, তা-ও ঠিক করতে পারল না।

আজ অফিস ছুটির আগেই বেরিয়ে এল। নিশ্চিতভাবে জানে, ওকে এখন কী করতে হবে।

মি. লিয়ন ডেনিসন ক্যাডবেরি অ্যাভিনিউতে থাকে। কয়েকবার ফোন দেয়ার পরও কেউ ফোন ধরেনি। পেশায় উকিল, ডিরেক্টরিতে দেয়া আছে অফিসের ফোন নাম্বার। অফিসে ফোন দিতেই সেক্রেটারি ধরল, জানাল তার বস এখন জরুরি মিটিং-এ আছেন। চাইলে ম্যাসেজ রাখতে পারেন মিস্টার ক্রাফট।

'এই ব্যক্তি মারা গেলে...' ভাবতে পারছে না ক্রাফট। কিন্তু ডেনিসন তো সুস্থ-সবল মানুষ! অফিস করছে, মিটিং করছে। এমন তো নয় যে অসুস্থ, হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তা হলে, এই লোকের মৃত্যু হবে কীভাবে?

চিঠির প্রেরকের অবশ্যই তা না জানার কথা নয়।

ছয় হাজার ডলার!

লোভনীয় প্রস্তাব।

কাজটি কীভাবে করা যায়?

পিস্তল দিয়ে?

কিন্তু সে পিস্তল পাবে কোথায়? কোথা থেকে কীভাবে কিনতে হয় কিছুই তো জানে না সে!

ছুরি?

ছুরি খুব সহজেই পাওয়া যায়, সন্দেহ করবে না কেউ।

ক্লডের মৃত্যুও হয়েছিল ছুরিকাঘাতে।

কিন্তু ছুরি দিয়ে খুন ব্যাপারটা কেমন যেন। ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

এ ছাড়া আর কী আছে?

গাড়ি চাপা দেবে?

সে ডেনিসনের অফিসের বাইরে অপেক্ষা করবে, তারপর সে বেরোলেই গাড়ি চাপিয়ে দেবে তার উপর?

আলহাজ্ব মোঃ ইসহাক

চট্টগ্রাম

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

মোবাইল: ০১৮২৩-২২৭২৫৬, ০১৭১৯-২২৮৮১০

ফোন: ২৫৫৪৭৭

খুব কঠিন কোনও কাজ নয়!

কিন্তু পুলিশ খুব সহজেই খুঁজে বের করবে তাকে।

এরকম কেসে পুলিশ অপরাধীকে সহজেই ধরে ফেলে।

এসব প্ল্যানে হবে না, আরও ভাল প্ল্যান দরকার।

দু'দিন ধরে ভেবেচিন্তে কীভাবে খুনটা করা যায় ঠিক করল ক্রাফট।

কিন্তু তাতে হবে না; সে তো আর খুনি নয়!

ভাল কোনও প্ল্যানও খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু ডেনিসনের মৃত্যুই পারে তাকে ছয় হাজার ডলারের মালিক করতে...

ছয় হাজার ডলার!

অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল কিছু দিন ডেনিসনের ওপর নজর রাখবে। প্রতিদিন সকালে ক্যাডবেরি অ্যাভিনিউতে গেল ক্রাফট এবং নজর রাখল উকিলের ওপর।

লোকটা পায়ে হেঁটে পার হয় রাস্তা।

ক্রাফট সহজেই তাকে গাড়ি চাপা দিতে পারবে।

কিন্তু ধরা পড়া চলবে না। সেক্ষেত্রে একাই ফাঁসবে সে

চিঠির প্রেরক অবশ্যই কোনও সাহায্য করবে না। কাজেই তার দরকার ফুলপ্রুফ একটা প্ল্যান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্রাফট তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, ঘোড়দৌড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ স্বভাবসুলভ চেঁচামেচি করে তার স্ত্রী চলে গেল রান্না করতে। বেচারিকে নিয়ে আজ ছায়াছবি দেখার কথা ছিল।

ক্রাফট গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এল ক্যাডবেরি অ্যাভিনিউতে, একটু দূরে গাড়ি পার্ক করে গিয়ে দাঁড়াল ডেনিসনের বাড়ির কাছে। দারোয়ান সিগারেট কিনতে দোকানে যেতেই, তার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে আগে থেকেই জানে কোন ফ্ল্যাটে যেতে হবে। সঠিক দরজায় পৌঁছে মাস্টার কী দিয়ে তালা খুলল। গতকাল এক চাবিওয়ালাকে দিয়ে বেশ কিছু টাকা খরচ করে এই মাস্টার কী বানিয়ে নিয়েছে। তালা খুলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে গেছে। কপাল ভাল, তালা খুলতে কেউ দেখেনি তাকে। ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকতেই যেন দূর হয়ে গেল তার সব ভয় ও দুশ্চিন্তা; তার বদলে মনে এল দৃঢ় সংকল্প।

টাকাটা তার দরকার।

ছয় হাজার ডলার।

সবকিছুই প্ল্যান মোতাবেক চলছে, একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। প্রথমে জোসেফ, তারপর অ্যাপ্তারসন, ক্লড– সবাইকে মরতে হয়েছে এবং ডেনিসনকেও মরতে হবে; অবশ্যই মরতে হবে।

এডগার ক্রাফট বুঝে গেছে অনেক কিছুই; সে জটিল জালের ছোট একটা অংশমাত্র। বিশাল বড় এক পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সহযোগী। সে তার কাজ ঠিকমতই করে যাচ্ছে।

তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর এল ডেনিসন। হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি মৃত্যুদূত ঘাপটি মেরে আছে তার ঘরেই।

ঘরের দরজার চাবি খোলার আওয়াজ পেয়ে, দরজার কাছাকাছি আলমারির পিছনে আড়াল নিল ক্রাফট। হাতে ফায়ারপ্লেসের কয়লা খোঁচানোর শিক। দরজা খুলে ঘরে পা দিতেই পিছন থেকে ডেনিসনের মাথায় শিক দিয়ে জোরে আঘাত করল ক্রাফট। আঘাত করতেই কাটা কলাগাছের মত ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও দু'বার মাথায় আঘাত হানল ক্রাফট। একবারও ডেনিসন কোনও আওয়াজ করেনি, একটু নড়েনি পর্যন্ত।

ক্রাফট যখন বুঝল লোকটা মারা গেছে, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের হাতের ছাপ থাকবে, সেসব জায়গা মুছে ফেলল।

পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে, কেউ তাকে দেখেনি।

সারারাত ঘুমোতে পারল না সে, বিবেকের তাড়নায় ছটফট করল।

সে একজন খুনি!

খুন করেছে সে!

খুন!

প্রথমে অ্যাপ্তারসনের মৃত্যুকামনা করেছে, পিয়ার্সকে খুন করার প্ল্যান করেছে; আর আজ সত্যি-সত্যি খুন করেছে!

সে এই তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

দু'দিন পর কাঙ্ক্ষিত চিঠি এল। বেশ মোটাসোটা একটা খাম, ভিতরে ছয় হাজার ডলার আর একটা কাগজ।

কাগজে এবার নতুন এক লাইন যোগ করা হয়েছে:

'ধন্যবাদ।

নতুন চাকরিটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?' ■

মিষ্টি জীবন

জালাল উদ্দিন

এখন বাবু স্যর স্বর্গে থেকে ম্যানেজার স্টলের মিষ্টি মিস করছেন কি না, কে জানে!

মনে আছে আমার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল যেদিন প্রকাশ হয়, সেদিন সকালবেলা গিয়েছিলাম স্কুলে। বেলা তিনটার দিকে স্কুলের স্যরদের কাছ থেকে ফলাফল পেলাম। ফার্স্ট ডিভিশন। দুইটি বিষয়ে লেটার মার্কস। আমাদের সময়ে ইসলাম শিক্ষাতে বেশি লেটার মার্ক থাকত। এখনকার মত গ্রেডিং সিস্টেম কয়েক বছর আগেও ছিল না। আমার ক্লাসমেট, যাদের ফলাফল ভাল হয়েছে, তারা সহ আমি স্যরদের পা ছুঁয়ে সালাম করলাম।

স্যররা হেসে বললেন, 'মিষ্টি কই?'

শেফুল, জসিম, শাহজাহান, শামীম, শাহানারা, আম্বিয়া, ইয়াসমিন, শেলী সহ যারা পাশ করেছি, সবাই ঠিক করলাম, আজ নয়, আগামীকাল সবাই মিলে স্যরদেরকে মিষ্টি খাওয়াব।

ফলাফলের আনন্দের দিনে সবাই যার-যার বাড়িতে মিষ্টি নেব। সবাই সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে যে কয়েকজন ক্লাসমেট পাশ করতে পারেনি, তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলাম। স্কুল থেকে রওনা হলাম আমাদের শহরের প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে।

আমাদের বাবু স্যর প্রতিদিন বিকেলে এই মিষ্টির দোকানে গিয়ে স্পঞ্জের একটি মিষ্টি ও একটি নিমকি খেতেন। তিনি বলতেন, স্বর্গে গেলেও নাকি ম্যানেজার স্টলের মিষ্টি মিস করবেন না। এখন বাবু স্যর স্বর্গে থেকে ম্যানেজার স্টলের মিষ্টি মিস করছেন কি না, কে জানে!

ম্যানেজার স্টলে গিয়ে দেখলাম মিষ্টি কিনতে এসেছেন অনেকে। সেজন্য দোকানের ভিতরে ও বাইরে লোকজনের লাইন লেগে আছে। মিষ্টি কিনতে হলে সিরিয়াল অনুযায়ী নাম ও পরিমাণ লেখাতে হবে। মিষ্টি মেপে সিরিয়াল অনুযায়ী দেবে।

বাংলাদেশে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিন যত মিষ্টি বিক্রি হয়, পরবর্তী পনেরো দিনেও এত মিষ্টি বিক্রি হয় কি না সন্দেহ!

সেজন্য মিষ্টি দোকানদাররা এই দিন আগে থেকেই প্রচুর মিষ্টি তৈরি করে রাখেন। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিন যে বাবা-মা খুব খুশি হন, তা মিষ্টির দোকানে অন্যান্য বাবা-মাকে দেখেই বুঝেছি। সন্তানের রেজাল্টে গর্বিত। যে মেয়েটি থার্ড ডিভিশন পেয়েছে, সে মেয়েটির বাবাও মিষ্টি কিনতে এসে বললেন, 'পরীক্ষার সময় মেয়েটির খুব অসুখ ছিল। পাশ করবে ভাবিনি। পাশ যে করেছে, এতেই আমি খুশি।'

এক ভদ্রমহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, ভাল মিষ্টি আছে?'

ব্যস্ত দোকানদার ক্যাশবাক্সের টাকা গুনতে-গুনতে বললেন, 'ভাল মিষ্টি হবে কি না জানি না, তবে মিষ্টি আছে। আর মিষ্টি নিতে হলে নাম ও পরিমাণ লিখিয়ে পেইড করে অপেক্ষা করতে হবে।'

ভদ্রমহিলা নাম লেখাতে গেলেন। দোকানদারের এ কথা বলা সঠিক আছে। আমাদের মৌলভীবাজারের সবাই জানেন, ম্যানেজার স্টলের মিষ্টি কখনও খারাপ হয় না। মিষ্টি বিক্রি করে তাঁরা দোকান থেকে পাওয়া টাকা ভারতে পাঠিয়ে দেন বলে শুনেছি। ওখানে নাকি তাঁরা প্রচুর জায়গা-জমি কিনেছেন।

আমি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিন 'স্পঞ্জ মিষ্টি' কিনেছিলাম প্রতি পিস পাঁচ টাকা করে, বর্তমানে যার দাম দশ টাকা। মিষ্টি কিনে বাড়িতে এলাম। বাবা-মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম।

বিকেল বেলা বাবা আরও মিষ্টি কিনে আনার জন্য বের হয়ে গেলেন। আমাদের এলাকার যেসব ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেসব ঘরসহ নানাবাড়িতেও মিষ্টি পাঠাতে হবে। এটাই নিয়ম। এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করলে মিষ্টি পাঠাতে হয়, পাশ না করলে না পাঠালেও চলে।

এসএসসি ফলাফলের দিন আমাদের বাড়িতে যাঁরা এলেন, তাঁদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হলো। রাতে বাবার কাছ থেকে জানলাম, আজ মৌলভীবাজারে মিষ্টির খুব চাহিদা ছিল। অন্যদিনের চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি তৈরি করেও দোকানদাররা কাস্টমারদের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। অনেকে নাকি মিষ্টি পাননি। শেষ পর্যন্ত কেউ-কেউ শ্রীমঙ্গল গিয়েছেন মিষ্টি কেনার জন্য।

পরদিন স্কুলে গিয়ে আমরা স্যরদের মিষ্টি খাওয়ালাম এবং আয়া, পিয়ন ও মালিকে মিষ্টির সঙ্গে খুশি হয়ে টাকাও দিলাম। এত বছর একসঙ্গে থেকেছি!

আমার এক কাজিন আছে, লিপি। তার ভাই-বোন লণ্ডনে থাকে। এক বোনের দেশে বিয়ে হয়েছে। তাঁদের বাড়িতে মেহমান এলে মিষ্টি নিয়ে আসেন। তখন লিপি আমাকে ল্যাণ্ডফোনে কল দিয়ে বলত, 'আপনে মিষ্টি খাইবার লাগি আইবা।'

ওদের বাড়িতে চাচা-চাচী কেউ মিষ্টি খান না। আর লিপির ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে এ ভয়ে সে মিষ্টি খায় না। আমি বাড়িতে থাকলে ল্যাণ্ডফোনে ওর কথা শুনে দু'তিন মিনিটের মধ্যে ওদের বাড়ি চলে যেতাম। আর বাড়িতে না থাকলে আম্মাকে বলত। আমি আসার পর আম্মার কাছ থেকে শুনে লিপিদের বাড়ি চলে যেতাম। প্লেট ভর্তি করে মিষ্টি এনে সে আমার সামনে রাখত। খেতাম। মাঝে মধ্যে লিপির সঙ্গে মান-অভিমান পর্ব শুরু হলে বা থাকলে সে আম্মার কাছে ফোন দিয়ে আমাকে পাঠানোর জন্য বলত। আমি যেতাম না। পরদিন চাচা আমাকে পেলে বলতেন, লিপি নাকি আমার জন্য মিষ্টি ফ্রিজে রেখেছে। আমাকে যাবার জন্য বলেছে।

লিপি ডাকার পর তারপর যেতাম। গিয়ে মিষ্টির মধ্যে পেঁয়াজের গন্ধ পেলে সে মিষ্টি খেতাম না। তাই ফ্রিজে পেঁয়াজ রাখলে প্লাস্টিক কন্টেইনারে মুখ বন্ধ রাখত ও, মিষ্টির বক্স ভাল করে প্যাক করত।

একদিন লিপিকে দেখতে বরপক্ষ এলেন। পাত্র আমেরিকা থাকেন। তাঁরা কয়েক রকমের মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। লিপিকে সাজিয়ে পাত্রপক্ষের রুমে পাঠানো হলো। বিকেলে অনেক মিষ্টি খেলাম। কারণ, পাত্রপক্ষ বলে দিয়েছেন–কনে তাঁদের পছন্দ হয়েছে। এত মিষ্টি খেলাম ওই দিন, সে রাতে আর ভাত খেতে ইচ্ছে করেনি।

আমি লিপিদের বাড়ি থেকে আসার আগে লিপি আমাকে ডেকে তার রুমে নিল। বলল, ঘরে কী করে মিষ্টি বানানো হয়, তা সে শিখে ফেলেছে। যোগ করল, 'এমন একটা ব্যবস্থা করইন, যাতে আপনার ঘরে আমি মিষ্টি বানাইয়া আপনারে খাওয়াইতে পারি।'

সে ব্যবস্থা করতে পারিনি। লিপিদের ঘরে মিষ্টি খেতে আমার ভাল লাগত, কিন্তু লিপিকে ভালবাসার মত ভাল লাগত না কখনও। এমন একটি মেয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি, যার গালে টোল পড়ে। মিষ্টি মেয়ে, যে নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দেবে মিষ্টি। এ দৃশ্যটা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। ■

জোক্‌স্ ও কিছু কথা

আসিফুজ্জামান তমাল

'এই যে আপনি একজন বেগানা সুন্দরী মেয়েকে কোলে নিলেন,' শিষ্যটির সরল জিজ্ঞাসা।

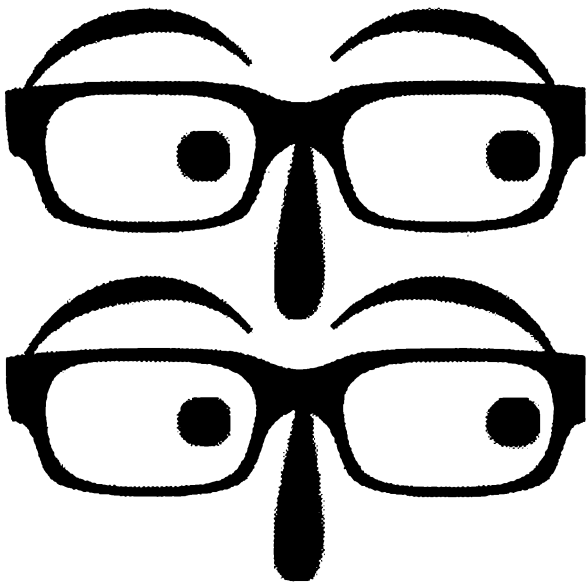

জাহাজ ডুবির পর এক লোক অনেক কষ্টে একটি দ্বীপে আশ্রয় নিল। সম্পূর্ণ নারী বিবর্জিত এই দ্বীপে প্রায় তিন মাস ধরে কাঠ সংগ্রহ করে নৌকা বানানোর কাজে লেগে গেল লোকটি। ঠিক সেদিনই হঠাৎ করে একজন সুন্দরী রমণী এসে হাজির তার সামনে। অবশেষে লোকটি নৌকা বানানো বাদ দিয়ে খাট বানানো শুরু করল।

ভাব কথা: নারীই পারে পুরুষের সংকল্প-লক্ষ্য পরিবর্তন করতে।

এক লোক নতুন শহরে এসেছে। ঘুরতে-ঘুরতে একটি রাস্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটি। এমন সময় বহু দূর থেকে আসা একটি মিছিলের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। এত বড় মিছিল সে আগে কখনও দেখেনি। এক লোককে মিছিলটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, সে তাকে একদম সামনে গিয়ে কথা বলতে বলল। বেশ অনেকক্ষণ যাবৎ হেঁটে গিয়ে লোকটা দেখতে পেল, এক লোক একটি কুকুর নিয়ে হাঁটছে আর তার সামনে কিছু লোক একটি লাশ বহন করছে।

অবশেষে লোকটি জানতে পারল লাশটি কুকুরের মালিকের বউয়ের এবং বউটি মারা গেছে এই কুকুরের কামড়েই।

গ্রাম্য লোকটির ত্বরিত প্রশ্ন, 'ভাই, কুকুর কামড়ানোর কত দিনের ভেতর আপনার স্ত্রী মারা

গেল?'

জানতে পারল, একদিন পর। এবারে সে বলল, 'ভাই, আমাকে একদিনের জন্য আপনার কুকুরটা ধার দেবেন?'

'ধার নেবেন? ঠিক আছে, লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়ান,' লোকটির সরল উত্তর।

এক অত্যাচারী রাজা চিন্তা করছেন, আমার ভয়ে সারা দেশের মানুষ ভীত, শুধু আমার বউ ছাড়া। ওকে শায়েস্তা করা দরকার। অবশেষে তিনি একটা গোপন সভার আয়োজন করলেন। মন্ত্রীসহ আরও কিছু রাজার নিজস্ব লোক সভায় উপস্থিত হলেন। জানা গেল, শুধু রাজা নয়, প্রত্যেকেই তাঁদের বউকে ভয় পান এবং তাদের শায়েস্তাও করতে চান। সভা কিছুক্ষণ গড়ানোর পর হঠাৎ একজন পেয়াদা এসে খবর দিল, তাঁদের বউরা কোনওভাবে এই গোপন সভার কথা জেনে গেছেন এবং তাঁরা ঝাঁটা হাতে এই দিকেই আসছেন!

আর যায় কোথায়! মুহূর্তেই সভা খালি!

যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন, শুধু রাজা ছাড়া।

পেয়াদা রাজাকে ডাকতে লাগল আর বলতে লাগল, 'হুজুর, তাড়াতাড়ি পালান। রানিমা এই দিকেই আসছেন।'

কিন্তু রাজার নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। অবশেষে পেয়াদাটি বুঝতে পারল ভয়েই রাজার অকাল মৃত্যু হয়েছে।

এবার আর এক রাজার গল্প। এই রাজারও একই সমস্যা। বউকে ছাড়া কাউকেই তিনি ভয় পান না। রাজার হঠাৎ ইচ্ছা হলো তাঁর দেশের কতজন তাঁদের বউকে ভয় পান না দেখবার।

সেই অনুযায়ী প্রতিটি বাড়ির পুরুষদের খালি ময়দানে হাজির করা হলো। ঘোষণা দেয়া হলো, যারা তাদের বউকে ভয় পায়, তারা যেন পূর্ব দিকে সরে যায়। মুহূর্তে প্রচুর শোরগোল শোনা গেল। দেখা গেল বউকে ভয় পায় না শুধু একজন। হালকা-পাতলা গড়নের একজন শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা খুশি হলেন এবং তাকে কাছে ডাকলেন।

রাজার কাছে এসে লোকটি বলল, 'অতশত বুঝিনে, হুজুর। বউ আমাকে ভিড়ের মাঝে যেতে বারণ করেছে, তাই আমি আর ওদিকে যাইনি।'

বিয়ের দশম বার্ষিকীতে স্ত্রী প্রচণ্ড রেগে গেছে বেচারা স্বামীর উপর। একটু পরপরই বলছে, এই দশ বছর ধরে তুমি আমাকে কী দিয়েছ বল? মাস গেলে মাইনে নিই না, কাজের লোকের মত খেটে যাচ্ছি দশটা বছর। কী দিয়েছ তুমি আমায়? বলতেই হবে আজ তোমায়।

বেচারা স্বামী চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। কিন্তু বউয়ের মেজাজ কিছুতেই কমছে না। অবশেষে স্বামীটিরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এবার তিনি একটু চটে গিয়ে বললেন: 'শুনতে চাও এই দশ বছর তোমার জন্যে আমি কী করেছি? তবে বলছি শোনো: এই দশ বছর ধরে তোমাকে আমি সহ্য করছি না? তুমি আর কী চাও আমার কাছে? এভারেস্ট জয় করাও তোমাকে সহ্য করার চেয়ে অনেক সহজ।'

এতক্ষণ যাঁরা ধৈর্য সহকারে জোক্‌গুলো পড়লেন, তাঁরা কতটুকু হেসেছেন জানি না, তবে নারীরা যে প্রচণ্ড রেগে গেছেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই: এগুলো নিছক আনন্দ দেবার জন্যই উপস্থাপন করা। কৌতুক রাজ্যে স্বামী-স্ত্রী, মোটা-চিকন, বর-বিয়ে, মাতাল, নারী বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সুতরাং এগুলোকে সিরিয়াসলি নেবেন না। প্রকৃত অর্থে নারীরা আজ চরম হুমকির মুখে। ইভটিজিং, তালাক আর যৌতুকের করাল গ্রাস থেকে নারীরা আজও মুক্ত হতে পারেননি।

পাঠক, এবার আসুন পুরুষদের নিয়ে গল্প বলি:

একজন ক্ষুধার্ত লোক একটি ট্রেনে উঠল খাবার চাইবার জন্য। খাবার চাইতে-চাইতে নিরাশ হয়ে একটি বগির মেঝেতে বসে পড়ল। মরণাপন্ন অবস্থা তার। অবশেষে একজন মহিলা দয়া করে লোকটিকে কিছু খাবার খেতে দিল।

খাবারটুকু খেয়ে লোকটি একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল। মহিলাটিও ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটু পরেই মহিলাটি টের পেল, কেউ যেন তার আঁচল ধরে টানছে। ভালভাবে খেয়াল করতেই দেখল, আগের ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিই করছে এ কর্মটি। চোখে তার অন্যরকম তৃষ্ণা।

ভাব কথা: যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

একজন ধর্মভীরু সন্ন্যাসী তার শিষ্য সহ যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে। এমন সময় একটা মেয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁরা জানতে পারল, মেয়েটি সামনের খালটি পার হতে চায়, কিন্তু নৌকা না থাকার কারণে পার হতে পারছে না। এ ব্যাপারে মেয়েটি তাঁদের সাহায্য কামনা করল।

সন্ন্যাসীটি সব কিছু বিবেচনা করে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে খালটি পার করে দিল। কিন্তু শিষ্যটি এ ব্যাপারটি মোটেও স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না। অবশেষে সে প্রশ্ন করেই ফেলল, 'হুজুর, কাজটা কি ঠিক হলো? আপনি কি ঠিক কাজ করলেন?'

সন্ন্যাসীটি শিষ্যের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যে আপনি একজন বেগানা সুন্দরী মেয়েকে কোলে নিলেন,' শিষ্যটির সরল জিজ্ঞাসা।

এবার উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী: 'দেখো, ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছি আমি। অথচ তুমি কিন্তু এখনও মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।'

ভাব কথা: অপবিত্র মনই সকল পাপের উৎস।

এক দৈত্য মানুষের গোলাম হতে চাইল এক শর্তে। তাকে সব সময় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। কিন্তু দেখা গেল সব আদেশই দৈত্যটি কয়েক মিনিটের মধ্যে পালন করে ফেলছে। ফলে তাকে কোনও কাজ দিয়ে আটকে রাখা যাচ্ছে না। অবশেষে দৈত্যটি তার মালিককে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে মালিকটি শেষ চেষ্টা হিসাবে একটি লম্বা বাঁশে তেল লাগিয়ে দৈত্যটিকে বাঁশটি বেয়ে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিল।

দেখা গেল দৈত্যটি পিছলা বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠতে পারছে না, বার-বার নিচে পড়ে যাচ্ছে।

তাতে লোকটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

তিনটি গল্পকে আমরা যদি এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করি, দেখা যাবে প্রথম গল্পে পেটের চিন্তা না থাকলে মানুষ বিপথগামী হয়। সমাজে যারা বাপের হোটেলে খায় আর ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তারাই ইভটিজিংসহ অন্যান্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় গল্পটি শেখায় মনটাকে পবিত্র করতে শেখো। পবিত্র মন কখনও খারাপ চিন্তা করে না। আর এ মনকে পবিত্র রাখতে চাইলে সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো। বই পড়ো, খেলাধুলা করো, ছবি আঁকো কিংবা অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো। দেখবে খারাপ কাজ করার সময়ই পাবে না। তখন আমাদের এই সমাজ হয়ে উঠবে আরও সুন্দর।

[বি. দ্র.: গল্পে ব্যবহৃত কিছু জোক্ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা সমগ্র থেকে নেয়া। অন্যগুলো বিভিন্ন উৎস হতে শোনা কিংবা পড়া। সঠিক উৎস না জানার কারণে উল্লেখ করা গেল না।] ■

মেসার্স আমীর অ্যাণ্ড সন্স

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

৫৯/৩/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল: ০১৭১১-১৩৭৮৫১, ০১৬১১-১৩৭৮৫১

ফোন: ৯৫৫৬৪৮৪, ৭১১১৩৭২

শব্দ-ফাঁদ ১২৮

রবীন্দ্র

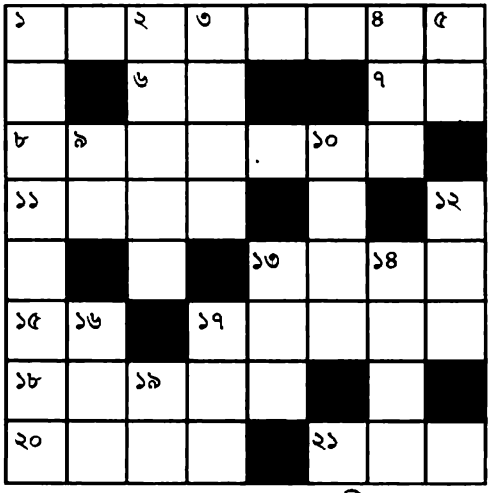

সমাধানের সূত্রাবলী

পাশাপাশি

১. মনোমুগ্ধকারী।
৬. চক্র, গোলাকার, খণ্ড।
৭. বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি।
৮. বিশেষভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার।
১১. চন্দ্রমণ্ডলের $\frac{১}{১৬}$ অংশ।
১৩. বাদুড় জাতীয় প্রাণী।
১৫. আঙুলের আগায় উপাস্থি।
১৭. স্থলপদ্ম।
১৮. কেউটে সাপ (স্ত্রী)।
২০. রীতি অনুসারে।
২১. আনন্দ, সুন্দর।

উপর-নিচ

১. মনশ্চাঞ্চল্য বা মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টিকারী।
২. বিচারক, ন্যায়াধীশ।
৩. সামনাসামনি বোঝাপড়া, নিষ্পত্তি।
৪. ইচ্ছা, অভিলাষ।
৫. নিয়ম, প্রথা।
৯. চন্দ্র সম্পর্কিত।
১০. ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ।
১২. জব্দ, হয়রান।
১৩. বৃহদাকার ছিদ্রবহুল ছাঁকনি বিশেষ।
১৪. চিমটি কাটা।
১৬. টাক, টেকো।
১৭. মুলতবি, ক্ষান্ত।
১৯. অভিধা, খ্যাতি, সংজ্ঞা।

সমাধান পাঠাবার ঠিকানা: **শব্দ-ফাঁদ ১২৮, রহস্যপত্রিকা, ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০**। যাঁদের সমাধান নির্ভুল বিবেচিত হবে, তাঁদের ভিতর থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে নির্বাচন করে পুরস্কার হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে পরবর্তী তিন সংখ্যা রহস্যপত্রিকা। সমাধান আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছুবার সর্বশেষ তারিখ: **১৬ মে, ২০১৭**।

সমাধান

শব্দ-ফাঁদ ১২৭

স	মা	না	ধি	কা	র	বা	দ
দা	ত	ব্য	■	ক	■	হা	র
চা	■	■	স	ফ	র	না	মা
র	ব	■	মা	ল	সি	■	হা
ব	র	ক	নে	■	ক	ক্ষ	■
হি	জ	রি	স	ন	■	তি	ন
র্ভূ	■	ম	মা	ল	য়	■	ফ
ত	রু	■	নে	ক	ন	জ	র

শব্দ-ফাঁদ ১২৭-এ যাঁরা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন:

১। **এ. আর. দুলাল**
চারতালার মোড়
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

২। **রহমত উল্লাহ**
ফকিরাপুল, ঢাকা।

৩। **উম্মে সালমা**
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

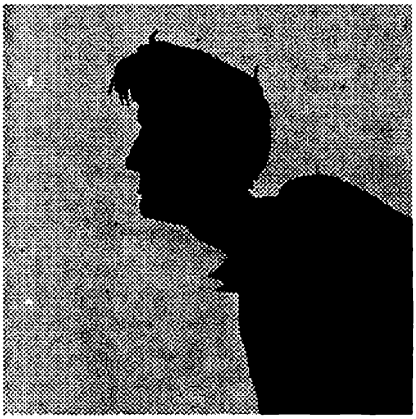

ভয়

সাজ্জাদ সরকার সাজু

জুতোর ফিতা বাঁধার জন্য নিচু হতেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। দরজার পাশেই অনেকগুলো পায়ের ছাপ।

ঘটনাটা ২০০৪/২০০৫ সালের। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় খেলা ছিল পাকিস্তান আর শ্রীলংকার। সনথ জয়সুরিয়ার মার-মার কাট-কাট ব্যাটিং, মুরালিধরনের ডেলিভারির সময় চোখের সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, ওয়াসিম আকরামের শান্ত রান আপে বিষাক্ত বোলিং, শোয়েব আখতারের আগ্রাসন, ইনজামামের অলস ব্যাটিং কিংবা আফ্রিদির ঝড়-জমজমাট একটা ম্যাচ যেন অপেক্ষা করছিল। রংপুরে এসেছিলাম বাড়িতে। চৈত্রের শেষ সময় ছিল সেটা। বিল শুকিয়ে যাওয়ায় অনেক দেশি মাছ পেয়েছিলাম আমরা। ফলে বাবা-মায়ের চাপে দু'দিনের জন্য বাড়িতে এসেছিলাম।

গাড়ি যখন বিনোদপুরে পৌছল, তখন প্রায় সাতটা বাজে। আমি থাকতাম সাধুর মোড়ে। পৌছনোর অপেক্ষা না করে নেমে পড়লাম বিনোদপুরে, হনহন করে ছুটলাম মতিহার হলের দিকে। কিন্তু ভাগ্যে সেদিন খেলা দেখা ছিল না। আকাশ মেঘলা ছিল, খেয়াল করা হয়নি। বৃষ্টি আসতে সেটি টের পেলাম। ফলে মতিহারে না গিয়ে শেরে-এ-বাংলা হলেই ঢুকলাম। টিভি রুমেই পেয়ে গেলাম বাবুর দেখা। আমরা একই ইয়ারে পড়ি। সে পড়ত লোকপ্রশাসনে। তবু আমাদের খুব ভাব ছিল।

মাত্র দু'ওভার খেলা দেখতেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসে পটাপট বন্ধ হয়ে গেল টিভি রুমের জানালাগুলো। মোবাইলের মৃদু আলোয় বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলাম ওর রুমে। দোতলার পূর্ব দালানের শেষ মাথার দ্বিতীয় রুম ছিল সেটি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হলটি বরাবরই ছাত্রদলের দখলে ছিল, বাবু নেতা ছিল, একাই থাকত সেই রুমে। ক্যারিয়ারে করে খাবার দিয়ে যেত ওকে। সেদিন সে খেল না। আমি খেয়ে-দেয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। কতটা ক্লান্ত ছিলাম তখন বুঝলাম।

ঘুম ভাঙল বাবুর ডাকে। ঘড়িতে দেখলাম রাত বারোটা বিশ বাজে। বিদ্যুৎ এসেছে। বাবু আমাকে বলল খুব ঘুমিয়েছি বলে সে আমাকে

ডাকেনি। এত রাতে মেসে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে আলো-আঁধারির এই ক্যাম্পাস পার হয়ে যেতে আমার সাহসে কুলাল না। বাবু বলল, 'তুমি দরজা লাগিয়ে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, আমি একটু বাইরে যাব।' এত রাতে বাইরে তার কী কাজ সেটা আল্লাহ মালুম। তার উপর রাতে নাকি সে ফিরবে না। আমি কোন প্রশ্ন না করেই হুকুম তামিল করলাম। বলা বাহুল্য আবারও অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম।

আবারও ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। শুরুতে বুঝতে পারলাম না। ঘুম থেকে উঠেই সময় দেখার অভ্যাসটা অনেক পুরানো আমার। কিন্তু মোবাইলটা খুঁজে পেলাম না। ঘুম ভাঙা আর মোবাইল খোঁজার মাঝের সময়টা আমি ঘুমের ঘোরেই ছিলাম। তবু আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি কিছু শব্দ শুনেছিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল বলে কিছুই দেখতে পাইনি। তবে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে কেউ মেঝেতে আঘাত করছে। মাত্রই কিছুটা সময়, ফলে শব্দটাও শুনেছি দু'-একবার। সুতরাং আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। যখন মোবাইলটা খুঁজছিলাম অন্ধকারে, তখন আর কোন শব্দ ছিল না।

কিছুক্ষণ আগে শোনা শব্দটা নিয়ে আমি কিছু সময় ধরে ভাবলাম। শুরুতেই মনে হলো দুঃস্বপ্নের কথা। কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখে এমন করে আগে কখনও ঘুম ভেঙে যায়নি আমার। স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ভাবতাম এটা স্বপ্ন নাকি বাস্তব।

আবার ভাবলাম, শত-শত ছাত্র থাকে এই হলে। কত ধরনের শব্দই তো আসতে পারে। সময় যেহেতু জানি না, হয়তো অনেকেই এখনও জেগে আছে। কেউ হয়তো চেয়ার সরাতে গিয়ে অসাবধানতায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাহলে সেই একই শব্দ আমি একাধিকবার শুনলাম কেন? মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছিল। শরীরটাও আরও ঘুম চাইছিল। ফলে শব্দটি আমার দুঃস্বপ্নে শোনা বলেই মেনে নিলাম এবং আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় খটখট শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় বুঝলাম ঝকঝকে একটা সকাল বাইরে অপেক্ষা করছে। দরজা খুলেই দেখলাম হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বাবু। কেমন ঘুম হলো জানতে চাইল সে। তার কথার সঙ্গে আমার নাকে এল কটু একটা গন্ধ, যেটা আমাকে বুঝিয়ে দিল সে সারারাত কোথায় ছিল। নেশার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিল সে।

চটপট ফ্রেশ হয়ে এসে রেডি হলাম। দারুণ ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হয়েছে, মাথাটাও ঝরঝরে হয়ে গেছে। রাতের সেই ঘটনার কথা মনেই ছিল না।

ব্যাগটা কাঁধে ঝোলালাম। মোজা পরে দরজার পাশে রাখা জুতোর দিকে এগোলাম। পা গলিয়ে জুতোর ফিতা বাঁধার জন্য নিচু হতেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। দরজার পাশেই অনেকগুলো পায়ের ছাপ, যেন প্রকাণ্ড কোন মুরগি দরজার পাশে এসে লাফ দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করেছে। বাইরের কাদাজল মাখা সেই পায়ের ছাপগুলো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আমি ভীষণ চমকে গেলাম। বাবুকে কিছু না বলে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পরবর্তী সময়ে এই রহস্যপত্রিকায় শ্রদ্ধেয় খসরু চৌধুরীর কয়েকটি লেখায় জানতে পারি, শেরে-এ-বাংলা হলে তিনিও ভৌতিক অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিলেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি আর কখনও সেই হলে যাইনি। ■

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
Y-9 নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১২-০০১২৫২
এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।
শাখা-১: বাড়ি নং ১১, মোহাম্মদিয়া হাউজিং, প্রধান সড়ক, মোহাম্মদপুর।
শাখা-২: ১৪/১৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর।

অন্ধকার

মিঠুন রায়

এ লোকের কাছে মেয়েরা কতটা নিরাপদ, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বৃষ্টি থামলে হাসান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখনও আকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়নি। যে-কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টির কারণেই হাসান আজ টিউশনিগুলোতে যায়নি। ওর টনসিলের সমস্যা আছে। একটু ঠাণ্ডাও সহ্য করার ক্ষমতা নেই। ঘরে চাল বাড়ন্ত। দুপুরে মুড়ি খেতে হয়েছে। ভাতের খিদে মুড়িতে মেটে না। তাই বৃষ্টি থামতেই ও চাল আনতে ছুটল। সঙ্গে একটা ডিমও কিনতে হবে। ভাতের সঙ্গে ডিম ভাজা আর আলু ভর্তা। খেতে একেবারে অমৃত। ঘরে অবশ্য সামান্য কিছু আলুও আছে।

এক কাপ চা খেল হাসান আবুল মিয়ার দোকান থেকে। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। বিকেলের নাস্তা। এরপর সদাই কিনে মেসে ফিরল। গত পাঁচ দিন ধরে ও মেসে সম্পূর্ণ একা। ওর মেসের বাকি দুই সদস্য দুই সহোদর। ওরা গ্রামের বাড়ি গেছে। মেসে ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই বৃষ্টি ওর নাগাল পেয়ে যেত। এখনও সন্ধ্যা হতে কিছু সময় বাকি আছে। হাসান ঘরে বসে পড়াশোনা করতে লাগল। দু'দিন পর ওর একটা চাকরির ইণ্টারভিউ আছে। কিছু লেখাপড়া করা দরকার। দু'বছর ধরে ও বেকার বসে আছে। একটা চাকরির

ওর বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তখনই দরজায় ঠক-ঠক শব্দ শোনা গেল। এই অসময়ে বৃষ্টির মধ্যে আবার কে এল? কিছু জিজ্ঞেস না করেই দরজা খুলল হাসান। আর ওটাই ছিল ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

হাসানকে ধাক্কা দিয়ে চারজন লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন হাসানের মুখ জাপটে ধরল যাতে কোন শব্দ করতে না পারে। এরপর দড়ি দিয়ে ওকে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধল। ওদের হাতে হকিস্টিক। হাসান বিস্ফারিত চোখে দেখল শুধু হকিস্টিকই নয়, ছুরি, পিস্তলও আছে।

'চেঁচামেচি বন্ধ। চিল্লাবি তো গলা কাইট্টা ফালামু। যা জিগামু, উত্তর দিবি। কোন তেড়িবেড়ি করবি না।'

'আপনারা কারা? আমাকে এভাবে বেঁধেছেন কেন? আমি কী করেছি?'

'সোনার চান। অহনতরি তুমি নাই আমরা কারা। আমরা কিলার পার্টি। কন্ট্রাকে কাম করি।

চোত, উত্তর দিবি ঠিকমত।' বলে বিশাল একটা থাবড়া দিল সেই লোকটি। থাপ্পড়ের চোটে হাসানের ঠোঁট কেটে গেল। মুখে লবণাক্ত স্রোত টের পেতেই ও তা বুঝল। হাসানের বুঝতে ততক্ষণে বাকি নেই ও মহাবিপদে পড়েছে। এসব লোকের পক্ষে খুন-খারাবি মামুলি ব্যাপার। পিস্তলের গুলিও হয়তো খরচ করবে না। গলা বরাবর ছুরি চালিয়ে দেবে। কিন্তু ও কার কী ক্ষতি করেছে, বুঝতে পারছে না।

'তর দোস্ত, রাশেদ কই?'

হাসান বুঝতে পারছে না, ওরা রাশেদের কথা কেন জিজ্ঞেস করছে।

'জানি না, দুই দিন ধরে ওর মোবাইল অফ।'

'দুই দিন আগেই (ছাপার অযোগ্য) পোলা কামডা করছে। ওর মরণের টাইম হইয়া গেছে। তুইও কি মরবার চাস?'

'ভাই, দেখেন, আমি আসলে কিছু বুঝতেছি না। আপনারা দয়া করে আসল ঘটনাটা বলবেন?'

' চোত, ভাব দেখাস। অ্যাক্টিং করস!' বলে আরেকটা থাবড়া দিল লোকটি। থাবড়ার চোটে হাসানের মাথাটা ঘুরে উঠল।

'ভাই, আমি সত্যিই কিছু জানি না।' ও চিঁচি করে উঠল।

'কিছু জানস না, না? তর দোস্ত, দুই দিন আগে আমার ছোট বইন রুনারে ফুসলাইয়া লইয়া পলাইছে। আমার ক্লাস এইটে পড়া বইনডারে ভুজং-ভাজং দিয়া এই কাম করছে। দুই দিন ধইরা আমি গরুখোঁজা করতাছি। পরে জানলাম, ওই ... চোতটা তোর নাকি দোস্ত। তাড়াতাড়ি ক, রাশেইদ্যা কই। না হইলে তর কল্লা কাইট্টা ফালামু। অহনতরি সাতটা মার্ডার করছি। থানায় আমার নামে একডজন মামলা আছে। খুব বেশি খারাপ মানুষ আমি। নলি কিন্তু ভাইঙ্গা ফালামু। ভালভাবে কবি...'

সব শুনে হাসানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রুনাকে ও দু'বছর ধরে পড়ায়। সপ্তাহে চার দিন। গতকাল শিডিউল ছিল না। আজ বৃষ্টির কারণে যায়নি পড়াতে। এর মধ্যে এসব ঘটে গেছে! কোন্ দুঃখে যে সেদিন রাশেদকে রুনার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেদিন রাস্তায় রুনার সঙ্গে হাসানের দেখা হয়। তখন সঙ্গে রাশেদ ছিল। রুনা ওকে সালাম দিয়েছিল। হাসান রাশেদকে বলেছিল, ওর স্টুডেন্ট। এরপর যে এত কিছু ঘটে গেছে তা ও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। রাশেদের নারীপ্রীতি খুব বেশি, কিন্তু ক্লাস এইটে পড়ুয়া একটা মেয়েকেও যে ও ছাড়বে না, হাসান তা কল্পনাও করতে পারেনি। আর রাশেদের সঙ্গে হাসানের পরিচয় মাত্র সাত মাসের। সেলুনে চুল কাটাতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। কয়েকবার রাশেদ ওর মেসেও এসেছে। হাসানদের রুমে একটা টিভি-ডিভিডি প্লেয়ার আছে।

একদিন রাশেদ একটা ব্লুফিল্মের ডিভিডি এনেছিল। সেদিনও হাসান একাই ছিল মেসে। কয়েক ঘন্টার ডিভিডি। হাসানের দেখতে কেন যেন রুচিতে বাধল। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে এসব দেখতে বিরক্তি লাগে। টিউশনি সেরে ও মেসে ফিরে দেখল, রাশেদ তখনও ওই জিনিস মুগ্ধ চোখে দেখে যাচ্ছে। এ লোকের কাছে মেয়েরা কতটা নিরাপদ, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ

আছে। রুনা দেখতে সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। রাশেদ যেমন লোক, ওকে বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। বিয়ে করলে হয়তো বেঁচে গেল, তা না হলে...আর কিছু ভাবার সময় পেল না ও।

'হারামজাদাটারে সিলিং ফ্যানে উল্টা কইরা ঝুলা। এত সহজে ও কথা কইব না।'

বাঁধন খুলতেই হাসান লোকটির পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'ভাই, আমার মা-বাবার কসম। আমি সত্যি কিছু জানি না। আমারে মাইরা ফালাইলেও কিছু বলতে পারুম না।'

'কে কইছে তরে মাইরা ফালামু? তরে মারুম না। খালি উল্টা কইরা ঝুলাইয়া পিডামু। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যি কথা না কবি। আমারে চিনস নাই। আমি কানা জামাল। পুরা ঢাকা শহর আমার নামে কাঁপে।'

কানা জামালের নাম শুনে আঁতকে উঠল হাসান। এ সেই দুর্ধর্ষ কানা জামাল! এ তো ভয়ানক লোক। হাসানকে জবাই করে ফেলতে পারে এ লোক। হাসান কিছুতেই পা ছাড়ল না।

'ওস্তাদ, মনে হয় আসলেই ও কিছু জানে না। এ তো আপনের নাম শুইনাই পেশাব কইরা দিছে।'

'তরে কিছু কমু না। খালি ঠিকমত ক, রাশেইদ্যা কই।'

'আমি জানি না, তবে ওই মডার্ন সেলুনে চুল কাটতে যায়। ওখানে নাপিতের সাথে ওর খুব খাতির। সে মনে হয় আপনেরে কিছু বলতে পারব। যতদূর জানি, ও রাশেদের দূরের আত্মীয়।'

'বুঝলাম, তা রাশেদের লগে রুনার দেখা করাইছিলি তুই প্রথমবার।'

'মাফ করে দেন, ভাই। এইডা ভাগ্য। আমার কোন হাত ছিল না। আমি জানতাম না ও এত খারাপ। গত দুই মাস ধরে ওর সাথে দেখা হয় না। ও মাঝে-মাঝে ফোন করে। দুই দিন ধরে মোবাইল অফ।'

'ওস্তাদ, মনে হইতাছে হাছাই কইতাছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুই পরোক্ষভাবে এসবের জন্য দায়ী। তর লিগাই ওই বদমায়েশের লগে আমার বোনের দেখা হইছে। এর শাস্তি তরে পাইতে হইব।'

'ভাই, আমারে মাফ করে দেন। আপনার সঙ্গে আমার তো কোন শত্রুতা নাই...'

হাসানের মুখ আবার কাপড় দিয়ে বাঁধল একজন। আরও দু'জন হাত-পা বাঁধল। এরপর কানা জামাল হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে হাসানের ডান হাতটা ভেঙে দিল। এরপর সবাই সেখান থেকে চলে গেল।

সেভাবেই দু'দিন পড়ে ছিল ও। দু'দিন পর মেসের সদস্যরা ফিরে এসে ওকে উদ্ধার করে। কিন্তু হাতটা বাঁচানো যায়নি। সারাজীবনের জন্যই যেন বেকার হয়ে গেল হাসান। হাতবিহীন ওকে কে-ই বা চাকরি দেবে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে!

বন্ধুদের কাছ থেকে ব্যবসা করার জন্য টাকা ধার নিল, কিন্তু সে ব্যবসাটাও ফেল করল। একদিন দশতলা বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিল হাসান। এরপর সবকিছু অন্ধকার।

রাশেদকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। রুনাকে বহু বছর পর একটি পতিতালয় থেকে উদ্ধার করেছিল মানবাধিকার কর্মীরা। কানা জামাল ততদিনে আর পৃথিবীতে নেই। র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে সে মারা গেছে। ■

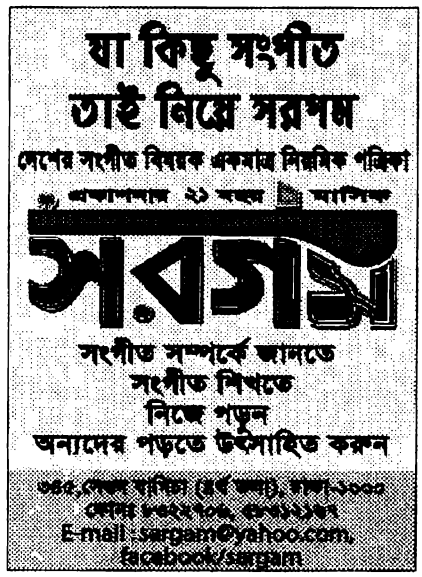

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্নঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাল্পনিক চরিত্র দেবী চৌধুরানীর আসল নাম কী?
উত্তরঃ শ্রী দুর্গা রায় চৌধুরী।
প্রশ্নঃ চিতল মাছের মুইঠ্যা রান্না করতে গেলে এতে কীসের মিশ্রণ লাগে?
উত্তরঃ আলু।
প্রশ্নঃ ভারতবর্ষের ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে কী নামে পরিচিত?
উত্তরঃ যমুনা।
প্রশ্নঃ শাড়ির বাজারে জামদানি একটি প্রসিদ্ধ নাম, এটি একটি ফার্সি শব্দ। জাম মানে কী?
উত্তরঃ ফুল। দানি মানে, পাত্র।
প্রশ্নঃ বর্গী বলা হত মারাঠি দস্যুদের, বর্গী মানে কী?
উত্তরঃ অশ্বারোহী।
প্রশ্নঃ বর্ষাকালে বৃষ্টি থামলে কোন্ দিকে রঙধনু দেখা যাবে?
উত্তরঃ পশ্চিম দিকে।
প্রশ্নঃ লবস্টার কোন্ চিংড়িকে বলে?
উত্তরঃ গলদা চিংড়ি।
প্রশ্নঃ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কী?
উত্তরঃ সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রশ্নঃ ধানসিড়ি নদী কোন্ বাংলায়?
উত্তরঃ বাংলাদেশে।
প্রশ্নঃ প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তরঃ বৃহত্তর ফরিদপুরে।
প্রশ্নঃ ১৯২৫ সালে প্রথম ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা হয়েছিল। কে জিতেছিল?
উত্তরঃ ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল এক গোলে।
প্রশ্নঃ পুলিস শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ থেকে, পুলিস অর্থ কী?
উত্তরঃ শহর।

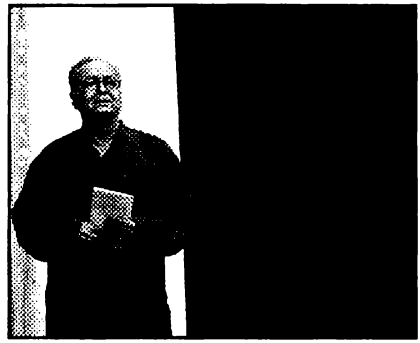

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্নঃ কেঁচে গণ্ডূষ কথাটার মানে কী?
উত্তরঃ নতুন করে শুরু করা।
প্রশ্নঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কোন্ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তরঃ নদীয়া।
প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় সবচেয়ে বেশি কমলা উৎপন্ন হয়?
উত্তরঃ দার্জিলিং।
প্রশ্নঃ বৌদ্ধমঠে লামারা থাকেন, লামা শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ ধর্মশিক্ষক।
প্রশ্নঃ কবিগুরু তাঁর কোন্ কাব্যগ্রন্থটি শ্রী জগদীশ বসুর নামে উৎসর্গ করেছিলেন?
উত্তরঃ কথা ও কাহিনি।
প্রশ্নঃ লক্ষ্ণৌ শহরটি কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তরঃ গোমতী।
প্রশ্নঃ 'চিনকারা' হরিণ কোথায় পাওয়া যায়?
উত্তরঃ থর মরুভূমিতে।
প্রশ্নঃ কোন্ দেশের নামে শার্টের কলার হয়?
উত্তরঃ চীন দেশের, চাইনিজ কলার।
প্রশ্নঃ সর্দি-কাশি সারাতে কোন্ গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়?
উত্তরঃ ইউক্যালিপটাস। ■

সংগ্রহে: **ফরিদা ইয়াসমিন**

কল

সূর্যদেব

এইমাত্র ডাক্তার সাহেবের একটা জরুরি কল এসেছে।

ডা. ইমতিয়াজ আহমেদ। নামকরা ডাক্তার। ভারী-ভারী দু'-একটা ডিগ্রি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দেশি আর বিদেশি। তাঁর চিকিৎসার হাতও যথেষ্ট ভাল। সকালে প্রাইভেট একটা মেডিকেলে যান। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন। রোগীও হয় প্রচুর।

যদিও মাঝে-মাঝে তাঁকে 'কল'-এ যেতে হয়। বাড়িতে রোগী দেখতে যেতে হয়। বিশেষ করে, যারা তাঁর নিয়মিত রোগী। প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য। তাদের ডাকে যেতেই হয়। মাঝে-মধ্যে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমার জীবনে প্রাইভেসি বলে কিছুই নেই! মাঝরাতে কেউ কল-এ ডাকলেই ছুটতে হয় রোগী দেখতে। খাবার ফেলেও দৌড়তে হয় অন্যের জান বাঁচাতে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা তো আর বোঝে না, আমারও জান আছে! বোঝে না বলে ওরা খালি পেরেশান করে!'

এইমাত্র ডাক্তার সাহেবের একটা জরুরি কল এসেছে। মাঝরাত্রিতে।

মাত্রই খেয়ে-দেয়ে শুয়েছিলেন। এখনই তাঁকে রওনা দিতে হবে।

অবশ্যই যেতে হবে। অবশ্যই।

যে কলটাকে তিনি ফেরাতে পারবেন না, কিছুতেই না। কারণ, ঈশ্বর তাঁকে এইমাত্র কল-এ ডেকেছেন। যা তাঁর জীবনের শেষ কল।

যে কল শেষ করে তিনি আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন না! ■

কাজী সারওয়ার হোসেন

মেষ

২১ মার্চ–২০ এপ্রিল

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটতে পারে। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মস্থলে আগের জমে থাকা কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কারও-কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। দূরের যাত্রায় অচেনা সহযাত্রীর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৫, ১৭, ২৩, ৩০।

বৃষ

২১ এপ্রিল–২১ মে

যে-কোনও ধাতব পদার্থ কিংবা যন্ত্রপাতির ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে নতুন অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উদ্যোগ নিন। এ মাসে কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন। যাবতীয় কেনাকাটায় লাভবান হতে পারেন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৯, ১৪, ১৯, ২৩, ৩০।

মিথুন

২২ মে–২১ জুন

এ মাসে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। চাকরিতে কেউ-কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। পেশাজীবীদের কারও-কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার মনের আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ এখন দূর হতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। চাকরিতে কারও-কারও কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৮, ১৪, ১৯, ২৩, ২৮।

কর্কট

২২ জুন–২২ জুলাই

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। যে-কোনও জলজ প্রাণী অথবা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। বেকারদের কারও-কারও মাসের শেষ সপ্তাহে কর্মসংস্থান হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। কর্মস্থলে কারও প্ররোচনায় ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। রাজনীতিতে দলের নেতা-কর্মীর কাছে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ৮, ১৩, ১৯, ২৫, ৩১।

সিংহ

২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট

বেকারদের কেউ-কেউ মাসের শেষ সপ্তাহে নতুন কাজের খোঁজ পেতে পারেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে আপনার আঁকা ছবি কোনও প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হতে পারে। কোনও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার মনের আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ দূর হতে পারে। আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৭, ১৩, ২০, ২২, ২৮।

কন্যা

২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টে

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করতে পারে। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে নতুন অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। সুতা, কাপড় কিংবা তৈরি পোশাকের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। কাজে-কর্মে আগের জটিলতা দূর হতে পারে। এমন কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যার সামাজিক অবস্থান আপনার চেয়ে উঁচুতে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। বিশেষ শুভ

তারিখ: ৫, ৮, ১৪, ১৭, ২৩, ৩১।

তুলা

২৪ সেপ্টে–২৩ অক্টো

কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। লটারি কিংবা ওই জাতীয় কোনও কিছু থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেয়ার কথা ভেবে থাকলে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই উদ্যোগ নিন। কর্মস্থলে পদস্থদের আনুকূল্য পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৭, ১৫, ১৯, ২৪, ৩০।

বৃশ্চিক

২৪ অক্টো–২২ নভে

জলজ প্রাণী কিংবা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। কারও কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। চাকরিতে কেউ-কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কারও-কারও বিদেশ যাত্রার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১২, ১৮, ২১, ২৭।

ধনু

২৩ নভে–২১ ডিসে

যে-কোনও বনজ সম্পদের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। এ মাসে হঠাৎ করেই হাতে টাকা-পয়সা চলে আসতে পারে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আবারও চেষ্টা করুন–এক্ষেত্রে এখন ভাগ্য আপনার সহায় থাকতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৪, ১৮, ২৩, ৩০।

মকর

২২ ডিসে–২০ জানু

এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কেউ-কেউ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রত্যাশার চেয়েও ভাল ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবেন। বেকারদের কারও-কারও মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। পাওনা আদায়ে কুশলী হোন। প্রেমিক-প্রেমিকার মনের আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ দূর হতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ৮, ১৬, ১৯, ২২, ২৮।

কুম্ভ

২১ জানু–১৮ ফেব্রু

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে একাধিক অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। পরিবারের বয়স্ক কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। দূরের যাত্রায় বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নিন। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৭, ১৩, ১৭, ২৫, ৩১।

মীন

১৯ ফেব্রু–২০ মার্চ

উপার্জনের নতুন মাধ্যম খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে-কোনও চুক্তি সম্পাদনের আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে নিন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে কোনও প্রদর্শনীতে আপনার আঁকা ছবি পুরস্কৃত হতে পারে। কোনও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পেতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ৭, ১২, ১৯, ২৫, ২৯।

আপনার প্রশ্ন ও সমাধান

কামরুল হাসান মামুন
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
● জন্ম: ২৫-১১-৭৮। আমার সার্বিক উন্নতির জন্য কী পাথর পরা উচিত?
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৭-৮ রতি ওজনের ব্রাজিলিয়ান পান্না (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

বাবুল আকতার
মহাদেবপুর, নওগাঁ।
● জন্ম: ১৭-১-৮০। ভবিষ্যতে আমার আর্থিক অবস্থা কেমন হতে পারে?
●● এ বছর থেকে ধীরে-ধীরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

রুমানা ইসলাম
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
● জন্ম: ১-৮-৯৩। যাকে ভালবাসি তার জন্মতারিখ: ২৫-২-৮৯। এক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে?
●● এ সম্পর্ক বিয়েতে গড়াতে পারে।

রানু
লালপুর, নাটোর।
● জন্ম: ১১-৭-৮৭। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● এক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা যায়। তবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা আছে।

শায়লা শারমিন
মহাখালী, ঢাকা।
● জন্ম: ২৭-১২-৯৫। ভবিষ্যতে সংগীতে সুনাম পেতে চাই...
●● পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আগামী দু'বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে পরিচিতি লাভে সক্ষম হতে পারেন।

জাফর আলম
শাজাহানপুর, বগুড়া।
● জন্ম: ২০-৯-৭৯। আমার সার্বিক উন্নতির জন্য কী পাথর পরা উচিত?
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৭-৮ রতি ওজনের মুনস্টোন (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

আবুল কাশেম রানা
চান্দিনা, কুমিল্লা।
● জন্ম: ৭-১০-৮৭। আমার মাঝে কি অতি ইন্দ্রিয়জ ক্ষমতা আছে?
●● আপনার তুলা রাশি ও জন্মসংখ্যা ৭; সুতরাং এ ধরনের ক্ষমতা কিছুটা হলেও থাকতে পারে।

খায়রুল আনাম
মীর সরাই, চট্টগ্রাম।
● জন্ম: ১৮-১২-৮৫। ভবিষ্যতে আমি কি স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসের সুযোগ পাব?
●● কিছুটা দেরিতে হলেও ভবিষ্যতে এ ধরনের সুযোগ আসতে পারে।

আফরোজা ইসলাম (অ্যানি)
জাফরাবাদ, ঢাকা।
● জন্ম: ৫-৬-৯৪। ভবিষ্যতে আমার কি প্রেম করে বিয়ে হবে?
●● অভিভাবকের পছন্দে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মিথিলা
বনানী, ঢাকা।
● জন্ম: ১১-৪-৯০। আমার রাগ অত্যন্ত বেশি...
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় কমপক্ষে ৮ রতি ওজনের মুনস্টোন (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
● জন্ম: ৫-৬-৮৯। ভবিষ্যতে আমার অর্থভাগ্য কেমন হতে পারে?
●● ৩২ বছর বয়স থেকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে।

মেহজাবিন
কাউনিয়া, রংপুর।
● জন্ম: ২১-১১-৮৮। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● এ বছরের শেষাংশে বিয়ের সম্ভাবনা আছে।

খন্দকার নূরুল ইসলাম
বেড়া, পাবনা।
● জন্ম: ১৮-৪-৭৮। কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই অন্যের সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি হয়; প্রতিকার কী?
●● ডান হাতের মধ্যমায় ৬-৮ রতি ওজনের ক্যাট'স আই (রুপোয়) পরলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে পারে।

তানজিনা হক
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
● জন্ম: ১-১০-৯৫। ভবিষ্যতে আমি কি বিদেশ যাত্রার সুযোগ পাব?
●● এখন থেকে তিন বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে সুযোগ আসতে পারে।

হালিমা খাতুন
ভাঙা, ফরিদপুর।
● জন্ম: ৫-২-৮৯...
●● স্বামীর সঙ্গে স্থায়ী বনিবনার সম্ভাবনা খুব কম। দ্বিতীয় বিয়ের সম্ভাবনাকে একদম উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ■

এ বিভাগে চিঠির উত্তর পেতে হলে ইংরেজিতে সঠিক জন্মতারিখ, পুরো ঠিকানা ও এক কপি ছবি সহ লিখতে হবে।

আজরাইলের প্রতিনিধি

মূল ▮ রবার্ট ব্লক
রূপান্তর ▮ মুহাম্মাদ তানভীর মৌসুম

ওগুলো মনে হয় ব্ল্যাক ম্যাজিক সংক্রান্ত বই! খাঁটি জাদুবিদ্যা! বইয়ের ভিতরে অদ্ভুত সব নাম–আযাযিল, সামায়েল, ইয়াদিথ।

এরিক কনরাডের দোকানের জানালায় সবসময় একটা ডামি দাঁড়িয়ে থাকে। ডামিটা দেখলে যে-কোনও মানুষই ভয় পাবে। খুবই সস্তা মডেলের একটা ডামি, জিনিসটার বয়স প্রায় বিশ বছর হতে চলল। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওটার আরও বেহাল দশা হয়েছে। ডামিটার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও খুবই অদ্ভুত। আপাদমস্তক কিম্ভূতকিমাকার এক জিনিস, মুখমণ্ডলের ছাঁচ সমগ্র দেহের চেয়েও বেশি অদ্ভুত। ভয়াল সেই মুখটাতে কারিগরের অযত্নের ছাপ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। যেন ভিনগ্রহের কোনও এলিয়েন মানুষ নামের প্রাণীটিকে দেখে কাঠ দিয়ে একটা মডেল বানিয়েছে।

ডামির মুখে থাকা হাসি, উঁচু হয়ে থাকা ছোট্ট এক টুকরো গোঁফ, সর্বক্ষণ খোলা দুটো চোখ–এসবই কালের পরিক্রমায় অনেক ঝড়ঝাপটার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে ডামিটার এখন উপরের ঠোঁট নেই, সেই সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে গোঁফের বামদিকের কিছু অংশ। এ ছাড়া ডান চোখটাও উধাও। চোখের খালি কোটরে দেখা দিয়েছে একটা ফাটল, যেটা উপরের দিকে উঠে খুলি দুইভাগ করে দিয়েছে। বাম হাতের এক আঙুল নেই, আর একটা খাঁজ কাটা আছে কবজির মধ্যে।

সস্তা খরিদ্দাররা যেমন কাপড় পরে ডামিটার গায়ে সে ধরনের সস্তা কাপড় পরানো হয়। বিদঘুটে

ডামিটা এরিক কনরাডের নিত্যদিনের সঙ্গী হলেও, বাইরে থেকে সাধারণ কেউ দেখলে ভয় পেতে বাধ্য। অবশ্য কনরাডের ভিতর কল্পনাশক্তি বলে কোনও জিনিস নেই। ছোটখাট, জীর্ণশীর্ণ দোকানের আলো-আঁধারিতে একটা অদ্ভুত আকৃতির ডামি ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওর মনে কোনও চিন্তার উদয় হয় না। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত ডামিটার সঙ্গে দর্জিসাহেবের অবস্থার খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই।

এরিক কনরাড–মার্চেন্ট টেইলর। ভাগ্যদেবী যার সঙ্গে সদয় আচরণ করেনি।

ওর শরীরের কিছু অঙ্গের সঙ্গে ডামিটার তুলনা দেয়া যায়। কাপড়ের মাপজোখের কারবার থেকে শুরু করে সুঁইয়ের ভিতর সুতো প্রবেশ করানো–এসব কাজ করতে-করতে ওর চোখের জ্যোতি কমে গেছে। নীল চোখ দুটো যেন ঢুকে যেতে চাইছে কোটরের গভীর থেকে গভীরে। সেলাইয়ের কাজ করতে-করতে হাতের সবগুলো আঙুল অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে গেছে। শুধু তাই নয়, আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত প্রত্যেকটা আঙুলই এখন অনেক শক্ত, কড়া পড়ে গেছে জায়গায়-জায়গায়। প্রেসিং টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকতে-থাকতে কুঁজো হয়ে গেছে ওর শরীর। বাদামি রঙের চুল সব ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। এসব পরিবর্তন অবশ্য কনরাডের চোখে ধরা পড়েনি। ব্যবসা ওর সমস্ত চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে। বর্তমানে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ।

ডামিটা আগের চেয়ে আরেকটু নিচে হেলে পড়েছে। দেখলে মনে হয় যেন কনরাডকেই অনুকরণ করার চেষ্টা। ব্যবসাটাও যেন ঠিক ওদের মতই নিম্নমুখী।

ভাগ্যদেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কনরাডের ওপর থেকে। ব্যবসাটা ছোটখাট হলেও এরিককে একসময় স্বাবলম্বী হবার পথ দেখিয়েছিল।

কিন্তু রেডিমেড স্যুটের জনপ্রিয়তা, ডাউনটাউনের সব স্টাইলিশ টেইলর, নতুন-নতুন ডিজাইনের সব কাপড়, ড্রাই ক্লিনিং সিস্টেম–সবকিছুই এরিকের পেটে লাথি মারার পিছনে অবদান রেখেছে।

বেচারার চোখের সামনেই ঘটল এই উত্থান-পতন, চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া কনরাডের আর কিছু করার ছিল না। মাস গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ওর কাজের ব্যস্ততাও কমতে থাকে। নিজেকে হালকা করার জন্য ও কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মুখ দিয়ে গালিগালাজের তুবড়ি ছোটায়।

তারপর হঠাৎ করেই ও গতবছর এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে।

অ্যানা মেয়েটা উদ্বাস্তু। ওর দেহের প্রত্যেকটা বাঁকে-বাঁকে লুকিয়ে আছে আকর্ষণ। সেই সঙ্গে ওর কমনীয়, লাজুক স্বভাবও পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে। সেই তরুণীর কাছে এই জায়গাটা তখন সম্পূর্ণ নতুন একটা পৃথিবী, যে পৃথিবীতে সে একজন নবাগতা। বিয়ের প্রস্তাবটা পেতেই ও সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, যদিও এরিক কনরাডের বয়স অনেক বেশি আর ওর ব্যবসার অবস্থাও খুব একটা ভাল না। কনরাডের বাড়ির পিছন দিকের ধোঁয়াচ্ছন্ন রুমটায় প্রেসিঙের কাজে স্বামীকে সাহায্য করতে পেরেই অ্যানা অনেক খুশি। এর চেয়ে বেশি কিছু ও চায় না।

ওদিকে বিয়ের পর কনরাডের গালাগাল করা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যদি ও কোনও কারণে হতাশ হয়ে পড়ে কিংবা রেগে যায় তাহলে গিয়ে শুধু স্ত্রীর গলাটা টিপে ধরে, তারপর জোরে-জোরে ঝাঁকাতে থাকে মেয়েটার শরীর। অবশ্য অ্যানার গলা ও কখনওই খুব বেশি জোরে চেপে ধরে না, কারণ মেয়েটাকে অনেক কাজ করতে হয়। মেয়েটা শুরুতর আহত হলে এত কাজ করবেটা কে?

এ নিয়ে অ্যানা কখনও অভিযোগ তোলেনি, এমনকী নির্যাতনের সময় ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বের হয় না। আসলে কোনও পুরুষ মানুষের শক্ত, বাঁকা আঙুল যদি কোনও মেয়ের নরম গলা টিপে ধরে তখন ওই মেয়েটার পক্ষে চিৎকার কিংবা কান্নাকাটি কোনওটাই করা সম্ভব হয় না।

অ্যানা শুরুতে বাচ্চা নিতে চাইত, কিন্তু যখন ওর চোখের সামনে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হলো কনরাডের আসল রূপ তখন ও বাচ্চা না থাকার জন্য ভাগ্যকে রীতিমত ধন্যবাদ জানায়। কোনও অবুঝ শিশুকে কনরাড নির্যাতন করছে এই দৃশ্য অ্যানার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হত না।

যখন দর্জিসাহেব প্রেসিঙের পর কোনও

কাপড় নিয়ে খদ্দেরের কাছে যেত তখন একা-একা শূন্য দোকানটায় অ্যানা নিজের সঙ্গেই কথা বলত জার্মান ভাষায়। কিন্তু এভাবে কথা বলতে ওর ভাল লাগত না, তাই সামনের জানালায় থাকা ডামিটাকেই ও একটা আলাদা মানুষ হিসেবে কল্পনা করে ওটার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। ও ডামির জন্য আলাদা একটা নামও ঠিক করে দেয়–'ওটো'।

নামটা ছিল ওর এক কাজিনের, যে অনেক বছর আগে ড্রেসডেনের ওখানে এক এয়ার রেইডে মারা যায়। ডামির মত ওটোর মুখেও গোঁফ ছিল। সে এখন বেঁচে থাকলে ওকেই বিয়ে করত অ্যানা।

কিন্তু একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে একটা বোমা এসে পড়ল, আর তাতেই একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সবকিছু। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে যখন ওটোকে পাওয়া যায় তখন ওর মাথাটা ডামির মাথার মতই দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অ্যানা নিজের জীবনের সব কথা ওই ডামিটাকে বলত। আর ওটো ওর প্রত্যেকটা কথাই শুনত, নিজের একটা অক্ষত চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকত অ্যানার দিকে।

এ ধরনের ভাবনাচিন্তা খুবই ক্ষতিকর সেটা জানে কনরাডের স্ত্রী। কিন্তু ওর একজন সঙ্গীর ভীষণ দরকার ছিল। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন মার্চেন্ট টেইলরের ব্যবসার মন্দাগতি আরও বাড়তে থাকে, কনরাড নিয়ম করে টিপে ধরতে থাকে ওর অসহায়, উদাসীন স্ত্রীর গলা। আর প্রেসিং করার সময় গরম বাষ্প ও ধোঁয়ার আক্রমণে অ্যানার সৌন্দর্য ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। আর ডামির শরীর থেকে শুরু করে বিভিন্ন তাক আর গজের পর গজ কাপড়ের উপর জমতে থাকে ধুলো।

রাস্তায় চলাচলকারী কোনও লোকই ওই কিম্ভূতকিমাকার ডামিটার দিকে তাকায় না। আর কোনও লোকই জানে না প্রতিদিন দর্জিসাহেব ওর স্ত্রীর উপর কী ভীষণ পরিমাণে নির্যাতন চালায়।

এমনভাবে হয়তো চলতেই থাকত দিনের পর দিন। ডামিটার অবস্থা হয়তো আরও বেহাল হয়ে যেত, অ্যানার গলায় হয়তো স্থায়ীভাবে বসে যেত কনরাডের আঙুলের দাগ, একসময় হয়তো স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হত জার্মান মেয়েটা। অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বোধহয় এমনটাই ঘটত–কিন্তু শেষমেশ তেমনটা আর হলো না। এখানে পুরো কৃতিত্বটা মিস্টার স্মিথের।

এক আলোকিত, রোদ ঝলমলে দিনে সে পা রাখল জীর্ণশীর্ণ টেইলরিং শপটাতে। অ্যানা তখন ছিল কাউন্টারের পিছনে, লোকটাকে দেখামাত্রই ওর একটা হাত মাথার পিছনে চলে গেল এলোমেলো চুল সব ঠিক করে নেয়ার জন্য। মিস্টার স্মিথ মানুষটাই এমন যে তাকে দেখলেই সবাই নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার জন্য সচেতন হয়ে ওঠে।

লোকটাকে দেখলেই মনে হয় সে অনেক সম্পদশালী। এমন একটা হাবভাব নিয়ে চলাফেরা করে যে দেখলেই বোঝা যায় সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি।

লোকটার সারা শরীর থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে আভিজাত্য। অথচ সেই লোকের হাসিতে লুকিয়ে আছে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বদান্যতা।

মিস্টার স্মিথের সবগুলো নখ ম্যানিকিওর করা, সঙ্গে মুখে শোভা পাচ্ছে ভ্যান ডাইক স্টাইলের ধূসর দাড়ি। তার পরনে থাকা ভারী টুইড স্যুটটা যেন ওর মালিকের স্তুতিকীর্তন করছে। লোকটার পায়ে শোভা পাচ্ছে আলাদাভাবে বানানো একজোড়া জুতো, মিস্টার স্মিথের হাঁটায় তা যোগ করেছে এক অনন্য মাত্রা।

সে নিজের একটা হাত সাবধানতার সঙ্গে ধুলোপড়া কাউন্টারের উপর রাখল। হাতের তৃতীয় আঙুলে শোভা পাচ্ছিল বিশাল বড় একটা হীরের আংটি, ওটায় সূর্যরশ্মি পড়ে কনরাডের দোকানের চারপাশ পুরো আলোকিত করে ফেলে। কর্তৃত্বের সঙ্গে ওই আঙুল দিয়ে শব্দ করে উঠল মিস্টার স্মিথ। 'দোকানের প্রোপ্রাইটর কি আছে?'

একটা অনাবিল হাসি বৃদ্ধ লোকটাকে উপহার দিল অ্যানা। ও লোকটার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বিশাল বড় হীরের আংটিটা দেখল আর তারপর আরও একবার তাকাল লোকটার মুখের দিকে। 'আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি, স্যর।' জার্মান উদ্বাস্তুর মনে তখন খুশির দোলা, ও একদৌড়ে চলে গেল ব্যাকরুমে।

সেখানে কনরাড একটা চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছিল।

'এরিক, একজন কাস্টোমার এসেছে।'

অ্যানার কথা শুনে চোখ পিটপিট করল দর্জি, তারপরই বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ঘোঁত করে উঠল।

'তাড়াতাড়ি করো।' তাগাদা দিয়ে উঠল অ্যানা। 'এই কাস্টোমার খুবই অভিজাত শ্রেণীর একজন ভদ্রলোক।'

'বিল কালেক্টর!' খেঁকিয়ে উঠল কনরাড। কিন্তু অ্যানার কথামত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঠিকই। ময়লা ঝেড়ে নিল নিজের পুরানো কোটটা থেকে।

বের হয়ে মিস্টার স্মিথকে দেখতেই একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল কনরাড। অবচেতনভাবে নিজেকে তৎপর এবং স্মার্ট হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করছে। 'ইয়েস? আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস্টার...?'

'স্মিথ। মিস্টার স্মিথ।' বলে উঠল দর্জিসাহেবের নতুন কাস্টোমার। 'যদি মনে করি আমার নিজস্ব সংগ্রহের কাপড় দিয়ে আপনি একটা গার্মেন্টি কাস্টম টেইলর করতে পারবেন তাহলে কি আমি কোনও ভুল করছি?'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অভিজাত বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করছে এরিক কনরাড স্যুট বানাতে পারে কি না এটা বুঝতেই দর্জির কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগে গেল।

কিন্তু বোঝার পরপরই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল বিশাল বড় লাভের সম্ভাবনা। এখানে দশ ডলার, ওইখানে পনেরো, সঙ্গে হয়তো আরও বিশ ডলার চার্জ করা যায়–লোকটার অভিজাত বাচনভঙ্গির জন্য।

'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক, স্যর। আপনি একটা স্যুট বানাতে চান এই তো? স্যুটটা কি খুব স্পেশাল হবে?'

'এগজ্যাক্টলি। সামথিং ভেরি-ভেরি স্পেশাল।' কথাটা বলার সময় মিস্টার স্মিথের হাসি মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

'কোনও সমস্যা নেই। ঠিক কী ধরনের স্যুট চাইছেন সে ব্যাপারে যদি একটু ধারণা দিতেন তাহলে হয়তো আপনাকে কিছু দারুণ কাপড় দেখাতে পারতাম। আমার কাছে উলের খুব ভাল স্টক আছে।' এরপর আরও কতক্ষণ বকবক করে চলল ও, যদিও ওর মনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড ভয় কাজ করছে। এই অভিজাত, ধনী লোকটি ওর দোকানে থাকা ত্যানার মত কাপড়গুলো দেখলে কী বলবে? খদ্দের পটানোর যত বুলি আছে সব মনে করার চেষ্টা করছিল এরিক, দীর্ঘদিনের অব্যবহারের ফলে অনেক কথাই ভুলে গেছে ও। ঘামতে লাগল দর্জিসাহেব, লোহিতবর্ণ ধারণ করল ওর মুখ। অবশ্য মিস্টার স্মিথ একবার হাত ঝাঁকিয়ে ওর কথার মাঝখানে বাগড়া দিল। আর তাতেই আরেকবার ঝিলিক মেরে উঠল বিশাল বড় আংটিটা। কনরাডের প্রায় অকেজো চোখ দুটো লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আংটিটার দিকে।

'তার কোনও প্রয়োজন পড়বে না।' বলে উঠল মিস্টার স্মিথ। 'যে কাপড় দিয়ে স্যুট বানাতে হবে সেটা এখন আমার সঙ্গেই আছে। এই যে, ব্যাগটার ভিতর। আপনি কি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন কাপড়টা?'

'অবশ্যই।' জবাব দিল কনরাড।

ও একই সঙ্গে ভারমুক্ত এবং হতাশ হয়েছে। ভারমুক্ত–কারণ নিজের স্টকের জঘন্য সব কাপড় এই লোকটাকে দেখাতে হবে না। হতাশ–কারণ কাপড় বিক্রি থেকে যে লাভটা আসে সেটা আর করা গেল না।

অবশ্য শুধু কাপড়টা বানিয়েই অনেক লাভ করা সম্ভব। ভাগ্যদেবী অনেকদিন পর আজ কনরাডের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। কাপড়টা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

মিস্টার স্মিথ ব্যাগ খুলে একগোছা কাপড় কাউন্টারের উপর বিছিয়ে রাখল। কাপড়টা দেখার জন্য উপরের একটা লাইট জ্বালল দর্জি।

'দেখুন এবার,' বলল মিস্টার স্মিথ। 'আমার মনে হয় এখানে একটা স্যুট বানানোর মত যথেষ্ট কাপড় আছে।'

কাপড়টা ছিল ধূসর রঙের। না, ধূসর বললে ভুল হবে। কারণ লাইট পড়ায় কাপড়ের উপর হালকা ডোরাকাটা ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। কাপড়টা আসলে সোনালি রঙের। এমনও তো হতে পারে, পুরো কাপড়টাই আসলে সোনার তৈরি। নাহ্, তাই বা কী করে হয়? সোনা থেকে তো আর রংধনুর মত আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে না।

তামাটে রঙের মধ্যে একটু ছাইয়ের রং মিশালে যে রঙটা আসবে কাপড়টাও ঠিক সেই রঙের। কিন্তু সেটাই যদি হয় তাহলে এখানে সবুজ রং কোত্থেকে আসবে? এই কাপড়ের মধ্যে তো সবুজ রঙও দেখা যাচ্ছে। আবার লাল আর নীল রঙের অস্তিত্বও আছে কাপড়টার মধ্যে। নাহ, কাপড়টা ধূসর রঙের। অন্য কোনও রং দেখা যাচ্ছে না, ওগুলো সব চোখের ভুল। কনরাড বর্ণবিকাশী কাপড়টার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঘাড় সোজা রাখলে কাপড়টার রং একরকম, আবার ঘাড় একটু কাত করলেই যেন সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যাচ্ছে কাপড়ের রং। এ কী ভুতুড়ে কাণ্ড রে, বাবা!

যদিও মিস্টার স্মিথকে দেখে মনে হচ্ছে সে ব্যাগের ভিতর এই ধরনের কাপড় নিয়ে হরহামেশাই ঘুরে বেড়ায়। আর তাই লোকটার শান্ত-সমাহিত ভাব দেখে কনরাডও চুপ করে থাকল, কিছু বলার সাহস পেল না। কিন্তু ও শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে নিজের পুরো টেইলরিং পেশার জীবনে এ ধরনের কাপড় আগে কখনও দেখেনি।

ও পুরো কাপড়টা বিছিয়ে ওটায় হাত বুলাল। কাপড়টা স্পর্শ করা মাত্রই যেন এক ধরনের ঝনঝনে অনুভূতি বয়ে গেল ওর ভিতর দিয়ে। মনে হয় কাপড়টার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। উল, ফ্লানেল, কটন–এ ধরনের কোনও জাতের মধ্যেই কাপড়টা পড়ে না।

কনরাড যতই কাপড়টার দিকে তাকায় ততই যেন ওর মাথার ভিতর তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। এর সেলাই, গঠন–কোনও কিছু সম্পর্কেই ও নিশ্চিত হতে পারছে না। চোখ দিয়ে দেখে কিংবা আঙুল দিয়ে অনুভব করে যে একটা সুতো চিহ্নিত করবে সেই উপায়ও নেই।

কাপড়টার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো কনরাডের, যেন মাথার একদম ভিতরে খুব ভারী কিছু চেপে বসেছে।

কিন্তু যত যা-ই হোক, জিনিসটা কাপড়ই আর দিন শেষে কনরাড একজন দর্জি। ও কাপড়টা থেকে একটা স্যুট বানিয়ে দেবে। মিস্টার স্মিথ দর্জির চেহারার অভিব্যক্তি খেয়াল করছিল। কনরাড তখন নিজের চেহারায় উদাসীন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। 'এইসব কাপড় দিয়ে কেউ সাধারণত স্যুট বানায় না আর আমিও এমন কাপড় নিয়ে কাজ করে অভ্যস্ত নই। ফলে কাজটা একটু কঠিনই হবে। কিন্তু স্যুট যে বানাতে পারব এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। এখন, স্যর, যদি আপনি কোট খুলে মাপ নিতে দেন...'

আংটি পরা হাতটাকে উপরে তুলল কাস্টোমার, সঙ্গে-সঙ্গে চুপ হয়ে গেল দর্জিসাহেব। হীরের প্রতিফলনে ডামিটার অক্ষত চোখ ঝিলিক মেরে উঠল।

'স্যুটটা আমার জন্য নয়।' বলে উঠল মিস্টার স্মিথ।

'তাহলে কার জন্য আপনি স্যুট বানাতে চাইছেন?'

'আমার ছেলের জন্য।' বৃদ্ধ জবাব দিল।

'তাহলে মাপ দেয়ার জন্য ওকে এখানে নিয়ে আসবেন?'

'না। আমি আসলে ওকে সারপ্রাইজ দিতে চাইছিলাম। ওর প্রয়োজনীয় সব মাপ আমার কাছে লেখাই আছে। একদম সঠিক মাপ, এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক নেই।'

'আর স্যুটের স্টাইল?'

'সেটাও আমার কাছে লেখা আছে।' এই বলে কয়েকটা কাগজ বের করল বৃদ্ধ। 'আরেকটা কথা, এই স্যুট বানানোর কাজ কিন্তু খুবই গোপনীয়তার সাথে করতে হবে। আর আমি যেভাবে বলব ঠিক সেভাবেই করতে হবে সবকিছু। স্যুট বানানোর ক্ষেত্রে আমার কথার যেন বিন্দুমাত্র নড়চড় না হয়। আমি উন্নতমানের বিশেষ একটা স্যুট বানাতে চাইছি, যেমনটা এর আগে কখনও বানানো হয়নি। অবশ্য আপনি যদি বানাতে না পারেন...'

আরও একবার ঝিলিক মেরে উঠল কাস্টোমারের হাতের আংটি।

'অবশ্যই আমি বানাতে পারব।' কনরাড বৃদ্ধের কথা শেষ করতে দিল না। 'আপনি যত জটিল জিনিসই চান না কেন এই শর্মা তা বানিয়ে দিতে পারবে।'

'তাহলে আপনি টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে কোনও চিন্তাই করবেন না।' কাস্টোমারের মুখে ফুটল আত্মবিশ্বাসের হাসি। 'যে-কোনও ধরনের

ঝামেলার জন্যই আমি আপনাকে প্রচুর টাকা দেব। কিন্তু আমার যে নির্দেশগুলো আছে সেগুলো যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন কাজ কিন্তু আমার লেখা অনুযায়ীই করতে হবে। কাগজে সব লেখাই আছে। এবার তাহলে বলছি কীভাবে কী করতে হবে, মন দিয়ে শুনুন।'

উপরে-নিচে মাথা দোলাল কনরাড, তারপর দু'জনই ঝুঁকে পড়ল বৃদ্ধের আনা কাগজগুলোর উপর।

জোরে-জোরে কাগজের লেখাগুলো পড়ে গেল মিস্টার স্মিথ, ধীর গতিতে পড়ছে যেন শ্রোতার শুনতে কোনও সমস্যা না হয়। এরকম-এরকম হবে মাপজোখ, কাগজে যেভাবে আঁকা আছে ঠিক সেভাবেই কাপড় কাটতে হবে, ভিতরে কাপড়ের আর কোনও আস্তরণ থাকবে না–এতে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সেটা কনরাডের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর কৌশল দিয়ে সমাধান করতে হবে। এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস–স্যুটের মধ্যে কোনও ভেস্ট থাকা চলবে না।

এতে কিছুটা হলেও উদ্ভট লাগবে স্যুটটা, কিন্তু সেটা যেন বাড়তি দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ না হয়। রীতিসিদ্ধ, গতানুগতিক স্টাইলের ছোঁয়া যেন থাকে। আর এ সবকিছুই করতে হবে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে।

বোতাম হবে হাড়ের তৈরি, সেই হাড়ও বৃদ্ধ সরবরাহ করল। আকৃতি প্রদান থেকে শুরু করে বোতামের মধ্যে ছিদ্র করা–প্রত্যেকটা কাজই করতে হবে হাতের সাহায্যে।

তারপরই বৃদ্ধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটার কথা বলল–এই স্যুট তৈরির যাবতীয় কাজ করতে কোনও যন্ত্রেরই সাহায্য নেয়া যাবে না। মিস্টার স্মিথ জানে এর জন্য একজন দর্জিকে কী পরিমাণ ঝামেলা পোহাতে হবে, তবে সেই ঝামেলার জন্য সে মোটা অংকের অর্থ পরিশোধ করতে রাজি আছে।

'আর নির্দিষ্ট কিছু তারিখের ব্যাপারে না বললেই নয়।' সবশেষে যোগ করল মিস্টার স্মিথ। 'আপনি শুধুমাত্র এই দিনগুলোতেই কাজ করতে পারবেন। অনেক হিসাব-নিকাশ করে কাজ করার দিনক্ষণ, সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকী ঘণ্টা আর মিনিটের চুলচেরা হিসাবও আছে এখানে। আপনাকে মিনতি করে বলছি–শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সব কাজ করবেন। সময়সীমার বাইরে ভুলেও কোনও কাজ করতে যাবেন না। এই স্যুট বানানোর জন্য যত নির্দেশ দিয়েছি তার সবই যেন অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হয় সে ব্যাপারে খুব গুরুত্বের সঙ্গে খেয়াল রাখবেন। নির্দেশনা মেনে কাজ করাটাই এখানে আসল। আশা করি আপনার উপর ভরসা করে পস্তাতে হবে না।'

এরপর আর কনরাড কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। 'আমি শুধু নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কাজ করতে পারব? কিন্তু কেন?'

প্রশ্নটা শুনে মনে হলো মিস্টার স্মিথ খেপে গেছে, কিন্তু পরে একটা মুচকি হাসি দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। 'আমি জানতাম আপনি প্রশ্নটা করবেন, এমনটাই স্বাভাবিক। উত্তর হিসেবে আপনাকে এতটুকু বলতে পারি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। এজন্যই কিছু উদ্ভট নিয়ম-কানুন। এর জন্য কেউ-কেউ আমাকে পাগলও ঠাউরাতে পারে। তা সে যা-ই হোক, আপনি আপনার খেয়াল খুশিমত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করুন। কোনও সমস্যা নেই, সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার।'

কনরাড শ্রাগ করল। হয়তো বা মিস্টার স্মিথ আসলেই একটা পাগল। কিন্তু না, তার পরনে রুচিসম্মত অভিজাত পোশাক আর আঙুলে বিরাট বড় হীরের আংটি–এসব কোনও পাগলের পরিধেয় হতে পারে না। লোকটার হয়তো বুড়ো বয়সে ভীমরতি দেখা দিয়েছে। অথবা মিস্টার স্মিথ প্রকৃতিগতভাবেই একটু খামখেয়ালী–আধপাগল স্বভাবের। বড়লোকদের মধ্যে এমন স্বভাব হরহামেশাই দেখা যায়।

'প্লিজ, কাক-পক্ষীও যেন কিছু জানতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ছয় সপ্তাহ, এক মাস সময় নিন। গোপনীয়তা বজায় রেখে ঠিকমত কাজটা করুন। আপনার প্রতি আমার যে আস্থা তার অমর্যাদা করবেন না।'

মাথা নোয়াল কনরাড। 'চিন্তার কোনও কারণ নেই, আপনার কথামতই সবকিছু হবে।' দর্জি এমনভাবে কথাটা বলল যেন মিস্টার স্মিথ ওর মনিব।

সমাজের উঁচু স্তরের বাসিন্দা, উদ্ভট চর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট অভিজাত ধনী মিস্টার স্মিথ সেই দর্জিসাহেবের আশ্বাসবাণী শুনে ছোট্ট টেইলরিং শপ থেকে বেরিয়ে গেল।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই কনরাড সাবধানতার সঙ্গে অদ্ভুত কাপড়টা সরিয়ে রাখল একপাশে।

'কনরাড, লোকটা কে?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল অ্যানা। 'এতক্ষণ ধরে কী বলছিল?'

'আরে, বেটি, এসব ব্যাপারে তোমার না জানলেও চলবে।' স্ত্রীকে বলল কনরাড।

'কিন্তু আমি তো সব শুনেছি। লোকটা তোমাকে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব সময়ে সেলাই করতে বলছিল আর...'

'চুপ! একদম চুপ!' গর্জে উঠল দর্জিসাহেব।

'কনরাড, আমার ভয় লাগছে। আমি নিশ্চিত পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা গড়বড় আছে। পরে এটার জন্য ঝামেলায় পড়তে হবে।'

'ঝামেলা!' লম্বা-লম্বা পা ফেলে স্ত্রীর কাছে চলে এল কনরাড, ওর কাঁধ দুটো খুব জোরে ঝাঁকাতে লাগল। 'ঝামেলা তো সবসময় তুই করিস, আহাম্মক মেয়েমানুষ কোথাকার!'

এই বলে দর্জি নিষ্ঠুরভাবে মারতে শুরু করল অ্যানাকে। কিছুক্ষণ পর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। দর্জি ক্লান্ত হয়ে একসময় চলে গেল। মেয়েটা দোকানের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে রইল।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল কনরাড, এখন একটা লম্বা সময় মদ খাওয়ার পিছনে ব্যয় করবে।

মাতাল অবস্থায় ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল মিস্টার স্মিথের আঙুলে থাকা সেই বিশাল বড় হীরের আংটি! বিয়ারের ফেনাগুলো যেন হীরের ঝলকানি।

ওদিকে অ্যানা তখন অন্ধকারে বসা। মেয়েটা নিজের সঙ্গে কথা বলছিল, কথা বলছিল ওটো দ্য ডামির সঙ্গে। ওটোর চোখে সে কোনও হীরের ঝলকানি দেখল না, শুধু দেখল কাচের নিষ্প্রাণ, শীতল দৃষ্টি।

ধীরে-ধীরে, অনেক সময় নিয়ে চলতে লাগল স্যুট বানানোর কাজ। তার উপর হাজার রকমের সমস্যা কাজে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করল। অদ্ভুত কাপড়টা পর্যবেক্ষণ করতেই কনরাডের অনেক সময় নষ্ট হয়। তীব্র আলো, ম্যাগনিফাইং গ্লাস–সবকিছুর নিচেই কাপড়টা নেড়েচেড়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি কোনও। কাপড়টা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেনি। পানি দিয়ে সেই কাপড় ভেজানো হলো, কিন্তু কোনও দাগ পড়ল না। এমনটা করার কোনও দরকারই ছিল না। স্রেফ কৌতূহলের বশে এসব করা। কাজের সময় নির্দিষ্ট থাকায় ঝামেলা বাড়ল বই কমল না। কালেকশন এজেন্ট, দোকান মালিক, পাওনাদার–সবাই বেছে-বেছে কাজের সময় এসে বিরক্ত করতে লাগল কনরাডকে। ওদিকে দর্জিসাহেবও মানুষ বুঝে কাউকে মিষ্টি কথায়, আবার কাউকে গালি মেরে তাড়াতে লাগল।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকেই চলল মূল্য নির্ধারণের জল্পনা-কল্পনা। কত দাম হবে এই স্যুটের? দু'শো ডলার? নাকি তিনশো ডলার? পাঁচশো ডলার হলেই বা সমস্যা কী?

কনরাড দু'-তিনবার চেষ্টা করেছিল অসময়ে (অর্থাৎ যে সময়ে মিস্টার স্মিথ সেলাই করতে নিষেধ করেছে) স্যুটের কাজ করতে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি তখন ও সেলাই করতে পারেনি। সেলাই-সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছিল, হাত থেকে বারবার কাপড়টা পিছলে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল উদ্ভট জিনিসটার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

এসব ঘটনা দেখার পর বেশ ভয় পেয়ে গেল কনরাড। এর আগে মিস্টার স্মিথ জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বলেছিল। এখানে কি অতিপ্রাকৃত কোনও ব্যাপার চলছে?

ধীরে-ধীরে কাপড়টা স্যুটের আকৃতি পাওয়া শুরু করল, আর দর্জির মনের ভিতর জমাট বাঁধতে শুরু করল অজানা এক ভয়। নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগল ও, জিনিসটা তৈরি করেই পাঁচশো ডলার বুঝে নেবে, তারপরই সব ঝামেলা শেষ। কিন্তু এরপর ব্যক্তি মিস্টার স্মিথকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল কনরাড। হয় ওই বৃদ্ধ কোনও উন্মাদ, নয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করে।

এসব চিন্তাভাবনা অনিবার্যভাবেই কনরাডের মেজাজ গরম করে তুলল। অ্যানার গায়ে হাত তুলতে তখন আর দেরি হলো না। জার্মান মেয়েটা ওইসময় দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে বড় পিটুনিটা খেল।

একসময় শেষ হলো স্যুট বানানোর কাজ।

কাপড়টার কলার অস্বাভাবিক উঁচু, বোতাম বিন্যাস খুবই বিচিত্র, এ ছাড়া কোনও পকেটও নেই। কিন্তু সবচেয়ে উদ্ভট ওই কাপড়টা, কোনও সন্দেহ নেই। কনরাড ভাবতে লাগল কোনও মানুষ এটা পরলে ওকে দেখতে কেমন লাগবে!

'দেখতে খুবই হাস্যকর লাগছে।' মন্তব্য করল অ্যানা।

'তা তো লাগবেই।' কনরাড বলল। 'প্রেসিং করা হয়নি তো এটার। যাও, এবার কাজ শুরু করে দাও।'

কিছুক্ষণ পর অ্যানা এসে বলল কাপড়টা প্রেস করা যাচ্ছে না। ব্যস, আর যায় কোথায়! দর্জি আবার শুরু করে দিল বউ-পিটুনি।

কনরাড নিজে আর কাপড় প্রেসিং করার ঝামেলায় গেল না। ভাবল যত তাড়াতাড়ি এই জিনিস বুড়োকে গছিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।

কাপড়টা প্যাকেটে ভরে মিস্টার স্মিথের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল কনরাড। ঠিক করল একটু টাকা-পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি চেপেই যাবে বুড়োর বাড়ি।

ট্যাক্সির ভিতর ঝাঁকি খেতে-খেতে কনরাড ভাবতে লাগল বাইরে থেকে দেখতে কেমন হবে মিস্টার স্মিথের বাড়ি। ওখানে একটা রট আয়রন গেট থাকবে, অনেক গাছপালা থাকবে বাড়ির আশপাশে, ফ্রন্ট ডোরটা হবে বিশাল, ব্রোঞ্জের একটা নকার থাকবে আর দরজা খুলবে কোনও বাটলার। সেই লোক কনরাডকে হল-এ অপেক্ষা করতে বলবে, তার একটু পরে এসে ওকে নিয়ে যাবে বিরাট এক ড্রয়িং রুমে। সেই রুমে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে মিস্টার স্মিথ, তার পিছনেই বিশাল বড় এক খোলা ফায়ারপ্লেস। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাব, ফলে কনরাডের কল্পনার সুতো ছিঁড়ে গেল। বিল মিটিয়ে রাস্তায় নামল ও, নিজেকে আবিষ্কার করল দুই গুদামঘরের মাঝে থাকা একটা সাধারণ বাসার সামনে। ভুল জায়গায় এসেছে ভেবে ড্রাইভারকে গাল দিয়ে উঠল দর্জিসাহেব। কী ভেবে যেন ঠিকানাটা জায়গার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। নাহ, কোনও ভুল নেই। এটাই সেই জায়গা। টেনেন্ট রেজিস্টার হল-এ গিয়ে ও 4A ফ্ল্যাটের বাযারে চাপ দিল। একটু পরে আবার চাপ দিল, এবার দীর্ঘ সময়ের জন্য। তারপর উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

বাড়ির অবস্থা খুব বেশি ভাল না। রেলিংগুলো নড়বড়ে, কোনও-কোনও জায়গায় নির্মাণ কাজ এখনও অসমাপ্ত। কনরাড ওর উন্মাদ কাস্টোমারের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হলো। ওর মত এত বড়লোক বুড়ো এমন ফকিরা জায়গায় কী করছে? অবশ্য পরে নিজেই এর একটা উত্তর বের করল। বুড়ো ব্যাটা নিশ্চয়ই এখানে লুকিয়ে আছে, যাতে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারে।

মিস্টার স্মিথের কনরাডের দোকানে আসা থেকে শুরু করে কাপড়টা বানিয়ে নিয়ে আসা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাতেই জড়িয়ে আছে রহস্য। সেই রহস্যের কারণেই মিস্টার স্মিথ এই জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

বুড়োর ফ্ল্যাটের সামনে এসে নক করল কনরাড। মনের ভিতর একবার কু গেয়ে উঠল ওর। কোনও বিপদে পড়তে হবে না তো?

এমন সময় খুলে গেল দরজা।

'ভিতরে আসুন।' দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল মিস্টার স্মিথ। 'আমি আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

বুড়োর মুখে উজ্জ্বল হাসি, ঠিক তার হীরের আংটিটার মতই। স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে থাকল কনরাড। কিন্তু ভিতরের রুমটা একদম জরাজীর্ণ। বিশ্বাসই হতে চায় না এখানে মিস্টার স্মিথের মত একজন লোক থাকে। দর্জি একবার ভাবল ভিতরে হয়তো কোনও গুপ্ত পথ আছে যেটা দিয়ে বিলাসবহুল কোনও রুমে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

ওদিকে মিস্টার স্মিথ লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কনরাডের হাতে থাকা প্যাকেটের দিকে। 'আপনি কাপড়টা নিয়ে এসেছেন!' খুশিতে ফেটে পড়ল বুড়ো। 'অসাধারণ! আমি কল্পনাও করতে পারিনি এত ঝামেলা আর উদ্ভট

সব শর্ত মেনে আপনি কাজটা শেষ করতে পারবেন।'

'কাজটা খুবই কঠিন ছিল।' বলল কনরাড। 'এই ধরনের কাপড় আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। আর কেমন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আপনার সব কথাই আমি বিশ্বাস করি।' হাত কচলাতে লাগল বুড়ো, একটু পর-পর আংটিটা ঝিলিক মারছে। 'এই কাজে সফল হবার ব্যাপারে আমি আশা করতেও ভয় পাচ্ছিলাম। আর আপনি বলছেন পুরো স্যুট একদম কমপ্লিট?'

'ঠিক যেমনটা আপনি অর্ডার করেছিলেন।'

'অসাধারণ! আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এই স্যুট আমার আর ছেলেটার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'কোথায় আপনার ছেলে?'

'ছেলের কি কোনও দরকার আছে?'

'ফিটিং থেকে শুরু করে বাদবাকি সবকিছু ঠিক আছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান না?'

'আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমার নির্দেশিকা অনুসরণ করলে ফিটিং একদম খাপে-খাপে হবে। সত্যি কথা বলতে কী আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ না করলে স্যুটটা বানানোই যেত না। কাজ অসমাপ্ত থেকে যেত।'

'ধন্যবাদ।' স্বীকৃতি পেয়ে বাউ করল দর্জি। 'কাজটা ভাল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।'

'সেটা তো আমি জানিই। ধন্যবাদ তো আপনাকে আমার দেয়া উচিত।' এই বলে বুড়োও বাউ করল, সঙ্গে বাড়িয়ে দিল দুই হাত। 'এখন যদি দয়া করে স্যুটটা দিতেন।'

আংটি পরা হাতটা দর্জির প্যাকেটের কাছাকাছি চলে এসেছে, এমন সময় পিছিয়ে এল কনরাড। 'স্যর, আমার টাকাটা?'

'হ্যাঁ, মজুরি। কত দিতে হবে যেন?'

লম্বা একটা শ্বাস নিল এরিক কনরাড। 'পাঁচশো ডলার।'

'খুবই যুক্তিসঙ্গত মজুরি।' মন্তব্য করল বুড়ো। 'বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। অতি শীঘ্রিই পরিশোধ করে দেব।'

'কিন্তু–'

'হ্যাঁ?'

'বিলটা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আর যদি কিছু মনে না করেন তাহলে টাকাটা আমার খুব দরকার। আশা করছিলাম যদি আজকেই–'

না সূচক মাথা নাড়ল বুড়ো। 'এমনটা তো হবার কথা না। আর যত যাই হোক, ডেলিভারির সময় তো বিল চাওয়াটা অশোভন। এক কাজ করুন, বিলটা মেইল করে পাঠিয়ে দিন। আপনি আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু টাকাটা আমার এখনই লাগবে। এটা সাধারণ কাজ হলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এটার পিছনে পুরো সপ্তাহ ব্যয় করেছি। আমি তো আপনার মত ধনী না। বোঝার চেষ্টা করুন।'

'আমি আপনার অবস্থাটা খুব ভালমতই বুঝতে পারছি। আমি নিজেই আছি একই সমস্যায়।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু অতি শীঘ্রিই আমার কাছে টাকা চলে আসবে। যখন আমার ছেলের সঙ্গে মিলিত হব। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আপনার আর আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

'আপনি এমন কথা কীভাবে বলেন? হাতে এত বড় একটা আংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

মিস্টার স্মিথ আঙুল থেকে খুলে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল আংটিটা। 'এটা পুরো নকল। সিনথেটিক ফেইক। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। নিজের ছেলে আর বিভিন্ন পড়াশোনার জন্য প্রত্যেকটা পেনি খরচ করে ফেলেছি। এখন, প্লিজ, আমাকে স্যুটটা দিন।'

প্যাকেটটা নিতে বুড়ো এগিয়ে এল, আরও পিছিয়ে গেল দর্জি। একসময় ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে ফিরল, দেখল ওখানে একটা ব্র্যাণ্ড নিউ রেফ্রিজারেটর।

'এটা কী? আপনার টাকা-পয়সার সমস্যা থাকলে এই বড় নতুন রেফ্রিজারেটর কোত্থেকে এল?'

'এটা আমার ছেলের জন্য কিনতে হয়েছে। এই স্যুটের মতই। এখন, প্লিজ...' সামনে ঝাঁপ দিতে চাইছিল বুড়ো, কনরাডকে খামচে ধরে যন্ত্রের কাছ থেকে সরিয়ে দেবে।

কিন্তু দর্জিসাহেব এক ঝটকায় সরিয়ে দিল

বুড়োকে। অবাক দৃষ্টিতে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ভিতরটা দুনিয়ার সব খাবারদাবারে ভর্তি।' হাতল ধরে টান দিল দর্জি, খুলে গেল দরজা। ভিতরে তাকাল ও। সেখানে কোনও তাক নেই, নেই কোনও খাদ্যদ্রব্য। শুধু আছে একটা মানুষের শক্ত হয়ে যাওয়া হিমায়িত লাশ! দাঁড়িয়ে আছে লাশটা, দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছে।

'দরজা বন্ধ করো।' চেঁচিয়ে উঠল মিস্টার স্মিথ।

ততক্ষণে ওখান থেকে লাফিয়ে সরে গেছে কনরাড। চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'খুনি! এই তাহলে আসল রহস্য!'

'না, আপনি বুঝতে পারছেন না! আমি কোনও খুনি নই। ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ওর জন্যই আমার এত পরিকল্পনা। এজন্যই আপনাকে স্যুটটা বানাতে দিয়েছিলাম। কাপড়টা ওকে পরাতে হবে। এখন কেউ আমাকে থামাতে পারবে না।' আবারও বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল বুড়ো। 'স্যুটটা আমার কাছে দিন। দিন বলছি!'

কনরাড সরে যেতে চাইছিল, কিন্তু বুড়ো পথ আগলে রেখেছে।

একটা লাশ আর এক বুড়ো উন্মাদ। মাঝখানে এরিক। পাঁচশো ডলার পাওয়ার আশায় গুড়ে বালি। একসময় সামনে এসে পড়ল বুড়ো, দর্জির মুখে একের পর এক আঘাত করতে লাগল। সঙ্গে একটু পর-পর বলছে, 'প্যাকেটটা আমাকে দে, শালা!'

কিন্তু একসময় দর্জিসাহেবও আঘাত করা শুরু করল। আর কোনও উপায় ছিল না। বুড়ো উন্মাদ ওর গলা টিপে ধরছে, লাথি মারছে। আত্মরক্ষা এখন ফরজ।

'আমাকে ছেড়ে দিন!' বলে উঠল কনরাড, কিন্তু বুড়ো কিছু শুনছে না। সে সমানে চিৎকার করছে, হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চাইছে কনরাডের চোখের ভিতর।

দর্জিসাহেব তখন কোনওরকমে সামনে থাকা একটা চেয়ার তুলে নিয়ে বুড়োর মাথার উপর নামিয়ে আনল। বুড়োর চিৎকার পরিণত হলো গোঙানিতে। এরপর আরও তিনবার বুড়োকে আঘাত করার পর ভেঙে গেল চেয়ার।

মিস্টার স্মিথের গলা দিয়ে আর কোনও শব্দ বের হচ্ছে না।

সে মারা গেছে, এটা বুঝতেই এরিকের অনেক সময় লেগে গেল। কাঁপুনি দিয়ে উঠল দর্জির সারা শরীরে। একটু স্বাভাবিক হবার পর উঠে দাঁড়াল কনরাড, গিয়ে রুমের লাইট জ্বালল। বুড়োর থেঁতলানো মাথা দেখে একটা কথাই নিজেকে বলল ও। আমি একটা খুনি।

সব শেষ হয়ে গিয়েছে, সব! পাঁচশো ডলার তো পাওয়াই গেল না, উল্টো নিজেকে এমন জঘন্য একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল। এখানে থাকাটাই এখন বিরাট ঝুঁকির কাজ। যত দ্রুত সম্ভব পালাতে হবে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আবার থেমে গেল কনরাড। ও খেয়াল করেছে ওই রুমে একটা ট্রাঙ্ক আছে। আশা জেগে উঠল দর্জির মনে। যদি ওটার ভিতরে টাকা থাকে?

ট্রাঙ্কটা খুব সহজেই খোলা গেল। কনরাড ভেবেছিল ওর সামনে উন্মোচিত হবে কোনও গুপ্তধনের সিন্দুক। কিন্তু না!

'বই!' ঘোঁত করে উঠল কনরাড। 'বই ছাড়া কিচ্ছু নেই আর!'

কিন্তু কিছু-কিছু বই অনেক পুরানো! সেগুলোর মধ্যে আবার লোহার তালা-চাবি সিস্টেমও আছে! আরও কত প্রাচীন-প্রাচীন বই! মানুষ তো শখের বশে বই সংগ্রহ করে। এগুলো কোনও অকশনে বিক্রি করে দেয়া যাবে। দর্জিসাহেব দুই হাত ভর্তি করে বই নিয়ে নিল। এটা কোনও চুরি নয়। ও মিস্টার স্মিথের কাছ থেকে পাঁচশো ডলার পেত, যেটা কখনওই আদায় করা সম্ভব হবে না। স্যুটের প্যাকেট আর বই নিয়ে হল-এ গেল ও। ওকে কেউ ঢুকতে, বেরোতে দেখেনি। ট্যাক্সি ড্রাইভার ওর চেহারা মনে রাখতে পারবে না। ওর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র খুঁজে পাবে না কেউ।

ওর কাজ এখন শুধু স্বাভাবিক আচরণ করে যাওয়া। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাস্তায় নামল কনরাড, হাতে সাধারণ কাপড়চোপড়! সুনাগরিকের মত প্রত্যেকটা ট্রাফিক সিগনাল মান্য করল ও, একসময় পৌঁছে গেল নিজের দোকানে। তখনও সে একটু-একটু কাঁপছে।

অন্ধকার রুমে কেউ ওকে দেখেনি, উইণ্ডো ডামি ওটো ছাড়া। ওটোর চোখও মিস্টার স্মিথের নকল হীরের আংটির মতই কাঁচের।

'কিচ্ছু হয়নি! কিচ্ছু হয়নি!! চিন্তার কোনও কারণ নেই।' বিড়বিড় করে বলতে লাগল কনরাড, তারপরই শুরু হলো ওর কান্না।

অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিক হতে পারল কনরাড। নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল বইগুলো। ওগুলো মনে হয় ব্ল্যাক ম্যাজিক সংক্রান্ত বই! খাঁটি জাদুবিদ্যা! বইয়ের ভিতরে অদ্ভুত সব নাম—আযাযিল, সামায়েল, ইয়াদিথ। কিন্তু বিষয়বস্তু উদ্ভট হলেও ভিতরের লেখার স্টাইল একদম সাধারণ, যেন রান্নার বইয়ের রেসিপি!

একজন মহিলার রক্ত নিতে হবে, এরপর ছিঁড়ে নিতে হবে কোনও শিশুর হৃৎপিণ্ড, একজন ফাঁসিতে ঝোলা মানুষের চোখজোড়া নিতে হবে, তারপর ওগুলোকে নাড়াতে হবে ভালমত। যোগ করতে হবে লাশের চর্বি।

একদম সহজ জিনিস, যে-কেউ করতে পারবে।

এর মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে নিগূঢ় সত্য। কিন্তু এখানে কীসের রেসিপি লেখা?

কাঁপতে লাগল এরিক, এমন সময় ভিতরে এসে ঢুকল অ্যানা।

'এরিক!' ফিসফিসিয়ে উঠল সে।

প্রচণ্ড ভয়ে চমকে উঠল দর্জি, অনুপ্রবেশকারীকে চিনতে পেরে রেগে গেল ও।

'এভাবে চোরের মত কেন ঢুকেছিস? বোকার হদ্দ!'

'কী হয়েছে? বিক্রি করতে পেরেছ স্যুটটা?'

প্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত করে দর্জি বলে উঠল, 'কী মনে হয়?'

'আমাকে খুলে বলো সব। কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। আমাকে এখন বিরক্ত করিস না, ছেমড়ি।'

'কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর মাংসের দোকানদার টাকার জন্য এসেছিল। বলেছি কালকে আসতে।'

দর্জি খামচে ধরল অ্যানার কাঁধ। 'কেন বলেছিস? না করেছিলাম আমি। স্যুটের ব্যাপারে যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়। কাউকে একটা কথাও বলবি না। যা, এখন এই স্যুটটা পুড়িয়ে ফেল। ভুলে যা এটা আমি বানিয়েছি, ভুলে যা স্মিথের কথা, ভুলে যা আজ আমি বেরিয়েছিলাম।'

এই বলে প্যাকেটটা অ্যানার হাতে ধরিয়ে দিল, তারপর মেয়েটার গালে চড় মারল—একবার, দুইবার, তিনবার! তৃতীয় চড়ে ওর হাতে মেয়েটার চোখের পানি এসে লাগল, চতুর্থ চড়ে হয়তো রক্ত বের হবে। কিন্তু ওটা আর মারল না। 'দূর হ! আমাকে একা থাকতে দে!!'

অ্যানা চলে যেতেই আবার পড়া শুরু করল কনরাড।

আহ্বান...টিউনিক সংকেত...রোগ... মহামারী...লুপ্ত যৌবন ও মৃতের পুনরুত্থান...অদৃশ্য হবার আলখাল্লা...লাশ সংরক্ষণ...কালো জাদুর মাধ্যমে জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা...ভাগ্যের অলৌকিক বস্ত্র বুনন...অমরত্বের কাপড়, যেটা তৈরি করা গেলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। মানুষের আকৃতি আছে এমন যে-কোনও কিছুকে, কোনও লাশকে, কোনও মৃত মানুষকে সেই কাপড় পরিয়ে দিলে পরিধানকারী জীবিত হয়ে উঠবে। কনরাড পড়ল পুরোটা। মিস্টার স্মিথও পড়েছিল। এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরু করেছিল। সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। স্যুট বানানোর অদ্ভুত সব নিয়ম-কানুন, হিমায়িত লাশ—এসবের অর্থ একটাই। বুড়ো তার মৃত সন্তানকে জীবিত করতে চেয়েছিল।

যত দ্রুত সম্ভব বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে ওই সর্বনাশা স্যুটটাও।

অ্যানা কোথায় গেল?

বাইরে নাকি? না, ভিতরেই আছে। অন্ধকার হল-এর ওখানে। শোনা যাচ্ছে ওর ফিসফিসানি।

'...আমাকে ঘৃণা করে...ওটো। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু...পাগল হয়ে যায়...মাঝে-মাঝে...তুমি বেঁচে থাকলে...কথা বলতে পারতে...মেরেছে...'

হতচ্ছাড়া মেয়েটা ওই উইণ্ডো ডামির সঙ্গে কথা বলছে! দুনিয়ার সবাই কি একসঙ্গে পাগল হয়ে গেল নাকি?

ঘরের বাতি জ্বেলে দিল কনরাড। অ্যানা মোমের ডামিটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

ডামিটাকে দেখতে কেন যেন খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে। একটু পরই ও বুঝতে পারল কারণটা, ওটাকে অ্যানা হতচ্ছাড়া স্যুটটা পরিয়ে দিয়েছে।

'এখানে কী করছ? তোমাকে না বলেছিলাম স্যুটটা পুড়িয়ে ফেলতে?'

'আমি পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা গোপন করছ। একটু আগ্রহ হলো আমার। তাই ওটো...মানে ডামিটাকে পরিয়ে দিলাম কাপড়টা। অন্ধকারে একটা জিনিস খেয়াল করেছ, এরিক? খুবই অদ্ভুত লাগছে এটাকে দেখতে, যেন ভিতর থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে।'

কনরাড হঠাৎ করেই অ্যানার সঙ্গে সদয় আচরণ শুরু করল। এমনকী উঠে দাঁড়ানোর সময় মেয়েটার হাতও ধরল। 'অ্যানা, এটা করা তোমার উচিত হয়নি। আমার কথা না শুনে তুমি নাক গলিয়েছ। আবার এই কাপড় পরানোর ডামির সঙ্গে কথাও বলছ! তুমি ঠিক আছ তো, অ্যানা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানা, দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলেছে। 'মাঝে-মাঝে মনে হয় পাগল হয়ে গেছি। তুমি অনেক নিষ্ঠুর, এরিক। তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দাও!'

'এখন এই স্যুটটা তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলো। তাহলে আর পিটাব না। যখন ভয় পাই তখন তোমাকে মারি। পুরো ব্যাপারটা বললে বুঝতে পারবে। আসলে এই ব্যাপারে কেউ কিছু জানলেই সমস্যা। কারণ আজ বিকেলে আমার আর মিস্টার স্মিথের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, আর আমি ওকে খুন করে ফেলেছি।'

'খুন!'

'ওটা দুর্ঘটনা ছিল। আত্মরক্ষার জন্য এমনটা করতে বাধ্য হয়েছি। মিস্টার স্মিথ একজন বদ্ধ উন্মাদ। ও নিজের ছেলের লাশ ফ্রিজারের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। বুড়ো ভেবেছিল এই স্যুট ওর ছেলের জীবন ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু পুলিস তো আর আমার কথা বিশ্বাস করবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। আমি দুঃখিত, এরিক। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আমার মনে হয় তোমার পুলিসে খবর দেয়া উচিত। ওদেরকে সত্যিটা বলো, কোনও কিছু বাদ দিয়ো না। আমি ওদেরকে বুঝিয়ে বলব। প্লিজ, এরিক! তুমি এভাবে একটা পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারো না। আমার জন্যে হলেও ওদেরকে জানাও। আমি একজন খুনির সঙ্গে বসবাস করছি–এটা কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব না।'

কনরাড তাকিয়ে ছিল ডামিটার দিকে। একপাশে পড়ে আছে ওটা, ভাঙাচোরা মোমের গড়নটা সম্পূর্ণ নিশ্চল, ফিট না খাওয়া কাপড়ে জিনিসটা দেখতে লাগছে বানরের মত। একই সঙ্গে শুনে যাচ্ছে অ্যানার বকবকানি। এই মেয়ের মাথা একেবারে গেছে। সে শুধু বারবার এরিককে কনফেস করতে বলছে। এমনও হতে পারে এই মেয়ে নিজেই একসময় পুলিসের কাছে চলে যাবে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এরিকের। ও পিছিয়ে দেয়ালের কাছে থাকা লাইটের সুইচ অফ করে দিল। এখন পুরো দোকানে কালিগোলা অন্ধকার। কেউ ওদের দু'জনকে রাস্তা থেকে দেখতে পাবে না। দর্জিসাহেব এখন ওর স্ত্রীর গলা টিপে ধরবে, কেউ দেখবে না!

নিজের সব শক্তি প্রয়োগ করে এরিক চেপে ধরল অ্যানার গলা। আরও জোরে ঠেসে ধরছে। যেন গলা নিংড়ে রস বের করবে!

'বাঁচাও!' চিৎকার দিয়ে উঠল অ্যানা।

নাহ, মাগীর গলাটা আরও জোরে চেপে

বুক ভিলা

এখানে সেবা প্রকাশনীর সমস্ত বই ও রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

১৯ সদর রোড (হোটেল গুলবাগ এবং সিটি ব্যাংকের নীচে)

বরিশাল।

ফোন: ০৪৩১-৬৩৭৭০

ধরতে হবে, দর্জি ভাবল।

'এরিক–থামো–ওহ! ওটো! আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও!!'

পাগল মেয়ে! সাহায্য চাইছে এক নিষ্প্রাণ ডামির কাছে!

আরও জোরে মেয়েটার গলা টিপে ধরল এরিক। থেমে গেল অ্যানার চিৎকার। নিচের দিকে পড়ে যেতে লাগল ওর দেহটা আর তখনই পিছনের কালিগোলা অন্ধকারের দিকে তাকাল এরিক। কিন্তু এখন আর অতটা অন্ধকার নেই। কারণ কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে! ওটার হাত আছে, আছে পা-ও!

সব কিছুর পিছনে দায়ী ওই স্যুট! অ্যানা বলেছিল ওটার ভিতর থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। ফসফরাস, সিলভার নাকি সোনালি আলো? যত জোরে এরিক মেয়েটার গলা টেপে, ততই যেন বাড়তে থাকে আলোর তীব্রতা!

ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এই হতচ্ছাড়া স্যুট এক পাগলের অর্ডার দেয়া। পাগলের কাজকারবারে ভয় পাওয়ার কী আছে?

এরিক চাইলেই অ্যানার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু এই স্যুট কোনওভাবেই নিষ্প্রাণ কিছুকে জীবন দান করতে পারে না।

কিন্তু আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা ওর, যখন দেখল ডামির হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে, ওটার পা দুটো হেঁটে-হেঁটে ওর দিকেই আসছে, দেখল ওটার কাঁচের চোখ জ্বলজ্বল করছে, ওখান থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আলো, সেই আলোর ঝিলিক যেন এরিককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে।

অ্যানাকে ছেড়ে দিল এরিক। এক দৌড়ে রুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অন্ধকারে কিছু একটা ওকে চেপে ধরেছে। চিৎকার করা ছাড়া দর্জিসাহেবের আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। মৃত্যুর আগে ও শুধু জ্বলজ্বলে এক ধরনের রুপোলি আগুন দেখতে পেল, আর তারপরই সবকিছু একেবারে অন্ধকার। এরিক কনরাডের উইণ্ডো ডামি ওর উপরই চেপে বসেছে, ওটার পরনে মন্ত্রপূত জীবনের স্যুট, ওটার হাতজোড়া চেপে বসেছে দর্জিসাহেবের গলায়, যেন আজরাইলের প্রতিনিধিত্ব করছে! ■

প্রকাশিত হয়েছে
কিশোর ক্লাসিক
তিনটি বই একত্রে

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স/আলেকজান্দার দ্যুমা/কাজী আনোয়ার হোসেন

কর্সিকান এক বনেদী পরিবারে জন্ম যমজ দুই ভাই লুসিয়েন ও লুই দো ফ্রানশির। চেহারায় এতই মিল যে ছোটবেলায় ওদের মা পর্যন্ত কোন্‌টা কোন্‌জন চেনার জন্যে জামায় চিহ্ন দিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন। বিপরীত চরিত্রের এই দুই ভাইকে নিয়েই বিশ্বখ্যাত কথা সাহিত্যিক আলেকজান্দার দ্যুমার অমর সৃষ্টি: দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স। অসংক্ষেপিত।

প্রেশাস বেইন/মেরী ওয়েব/কাজী শাহনুর হোসেন

কাটা ঠোঁট প্রুডেন্স সার্নের জন্মগত ত্রুটি। কেউ কেউ এজন্যে ওকে ডাইনী মনে করে। বড় ভাই গিডিয়ন সার্ন কথা আদায় করে নেয়, তার খামারে সারাজীবন শ্রম দেবে প্রুডেন্স, যা বলা হবে তাই করবে। কারণ ঠোঁট কাটা মেয়েকে তো কেউ ভালবাসবে না, বিয়ে করবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বেন-হার/লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন

সামান্য এক দুর্ঘটনায় বেন-হারের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বন্দি করা হলো ওকে। রোমান সৈন্য ধরে নিয়ে গেল ওর মা-বোনকে। বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল সমস্ত সম্পত্তি। ভাগ্যের পরিহাসে ক্রীতদাসে পরিণত হলো প্রিন্স বেন-হার। দেখা হলো যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। তিনি দেখালেন নতুন আলোর পথ।

দাম ■ নব্বই টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

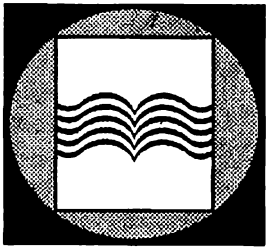

বই-পরিচিতি

মীর কাশেম আলী

বেউলফ। রূপান্তর: ডিউক জন। প্রকাশক: সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা—৩২০ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম—১১৫ টাকা।

অজ্ঞাতনামা এক লেখকের লেখা পিশাচ কাহিনি এটি। রূপান্তর করেছেন তরুণ প্রতিভাবান লেখক ডিউক জন। প্রাচীন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, কাহিনিটি ইংল্যাণ্ডে রচিত হলেও এর প্রেক্ষাপট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে রচিত হয় কাহিনিটি। বীর যোদ্ধা বেউলফ। দানব গ্রেনডেলের মাকে হত্যা করতে এসে উল্টো সেই মায়াবিনীরই জালে আটকা পড়ল সে। মুক্তির শর্ত হিসেবে জানানো হলো, যদি সে ওই মায়াবিনীকে একটি সন্তান উপহার দেয়, তবেই মুক্তি মিলবে তার। কাহিনি এভাবেই এগিয়ে যায়।

এখানে বইটির সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: গ্রেনডেলের মায়ের আস্তানা। এক সময় নিবেলাঙ্গেনদের বসতি ছিল এখানে। বামনাকৃতির কারিগর ওরা। বহু আগেই নিজেদের ধনভাণ্ডার সহ কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে জাতিটা। রয়ে গেছে তাদের এক কালের রাজত্বের কিছু নিদর্শন। পানির উপরে মাথাটা জাগিয়েই থ হয়ে

গেল বেউলফ। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল পর্বতের গভীরে লুকানো অত্যাশ্চর্য এ জায়গাটা। ওর থেকে মাত্র দু'কদম দূরে অগুনতি ধাপ বিশিষ্ট ভাঙাচোরা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে। ওডিনের প্রমাণ এক মূর্তি অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে ধাপগুলো। মূর্তিটার গায়ে বসানো দামি-দামি রত্নপাথরগুলো বহু আগেই চুরি হয়ে গেছে। নাকে-মুখে ঢুকে যাওয়া পানির কারণে কাশতে লাগল বেউলফ। বামনদের বিশাল এই হলের বাতাস বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে। আজব এক চেম্বার এটা। খুবই অদ্ভুত। এ যেন পৃথিবীর মধ্যে আরেক পৃথিবী, যে পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে কেবল কিংবদন্তিতে...।

এখন থেকে হাজার বছর কিংবা তারও বেশি সময় আগে লেখা এই পিশাচ কাহিনিটি পাঠককে মুগ্ধ করবে। ডিউক জন-এর ঝরঝরে ভাষা বইটির বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বইটি শীঘ্রি

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা

নিউজ হোম

৭ গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘির মোড়, রাজশাহী।

পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।

গহীনে নিনাদ–মোঃ মাজহারুল ইসলাম। প্রকাশক: এম. এস. এমরান আহমেদ, প্রচলন প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। পৃষ্ঠা–৮০ (হোয়াইটপ্রিন্ট)। দাম–১৩৫ টাকা।

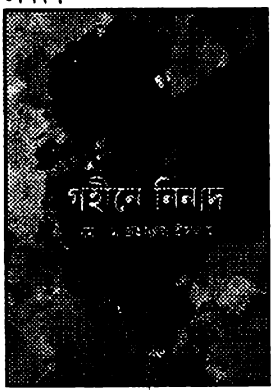

মোঃ মাজহারুল ইসলামের 'গহীনে নিনাদ' যেন সমকালীন সামাজিক চালচিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। সুযোগসন্ধানী প্রতারকচক্র মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রতারণার জাল বিছিয়ে কীভাবে মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, এটি সেরকমই একটি বাস্তবধর্মী কাহিনি। এখানে বইটির সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: সেই দিনটির কথা আজও ভুলতে পারেনি নুপূ। যেদিন তাকে তাড়া করেছিল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সন্ধ্যামালতী রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রকল্পটির পাশে। প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ। অবশেষে একটি আর্তনাদ 'বাঁচাও, বাঁচাও।' হারমানা অবস্থাতেও করেছিল 'না, না' চিৎকার। তখন থেকেই শুরু হলো চৈতি খানমের নাম পরিবর্তনের পালা। কখনও 'রূপা', কখনও 'অপর্ণা', কখনও বা 'কাকলী', আর আজ হয়েছি 'নুপূ'। সেদিন নিজের ইজ্জত রক্ষায় মৃত্যুর সাথে যুদ্ধও করেছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলাম। আজ নিজের বিবেককে রক্ষা করতে নিজের ভাল লাগার, ভালবাসার মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছি–মনে মনে ভাবছে নুপূ। ওই দিন ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থতাটি নিজেকে আজ কোথা থেকে কোথায় দাঁড় করিয়েছে। এই ব্যর্থতাটি অন্য দশটি মানুষের জীবনের ব্যর্থতার মত নয়। ব্যর্থতাটি নুপূ-র জীবনকে করেছে রিক্ত, নিঃস্ব। জীবন বলে অবশিষ্ট কিছু আর নেই। নুপূ জীবনকে নিয়ে ভাবছে আর রিকশা চালককে আগেই বলে দেয়া ঠিকানার দিকে এগুচ্ছে...। 'গহীনে নিনাদ' সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা চমৎকার একটি কাহিনি যা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।■

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে অনুবাদ

কর্নেল কেশরী সিং-এর ওয়ান ম্যান অ্যাণ্ড আ থাউজ্যাণ্ড টাইগারস

রূপান্তর: ইশতিয়াক হাসান

মানুষখেকোটা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে বাড়ির দরজা ভেঙে পর্যন্ত মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে নিজেকেই টোপ বানালেন শিকারি। হাতিতে চড়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন দুই শিকারি। হঠাৎ সামনে হাজির এক বাঘ। গুলি খেয়েও গর্জন করে হাতির পিঠে চড়ে বসল। এখন কী হবে? লোকে বলে বাঘের হাতে নিহত মানুষ নাকি তার হত্যাকারী বাঘটাকে মারতে সাহায্য করে শিকারিকে। আসলেই কি? আচ্ছা বলুন তো, লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে কি বাঘ মারা সম্ভব? কিংবা তলোয়ার দিয়ে? চল্লিশ বছরের বেশি রাজস্থানের জঙ্গলে বাঘের পিছনে ছুটেছেন কর্নেল কেশরী সিং। নিজে শিকার করেছেন, আবার শিকারে নিয়ে গিয়েছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, লর্ড রিডিংসহ অনেক বিখ্যাত মানুষকে। তার ঝুলিতে তাই জমা আছে বাঘ নিয়ে অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা। কোনোটা পড়ে হবেন রোমাঞ্চিত। কোনোটা পড়ে আবার ভাববেন এ-ও কি সম্ভব! শুধু বাঘ নয়, বইটিতে আছে খেপা হাতি আর চিতা বাঘ শিকারেরও চমৎকার সব কাহিনি।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

গ্রাহক চাঁদা

রহস্যপত্রিকা

ষান্মাসিক সডাক ২২৫.০০ টাকা, বার্ষিক সডাক ৪৪৫.০০ টাকা

সেবা'র আগামী কয়েকটি বই

২/৫/১৭	ডাইনোসরের হাড়+কার্নিভাল+জলদানবী	(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৪১/২)	শামসুদ্দীন নওয়াব
৭/৫/১৭	কোনান দ্য সিমেরিয়ান	(অনুবাদ)	রবার্ট ই. হাওয়ার্ড/ডিউক জন
১৫/৫/১৭	মায়া·মন্দির	(রানা-৪৫১)	কাজী আনোয়ার হোসেন/ সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন
২১/৫/১৭	দ্য লটারি টিকেট	(অনুবাদ)	জুল ভার্ন/সাঈম শামস্

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে

কোয়ান্টাম মেথড

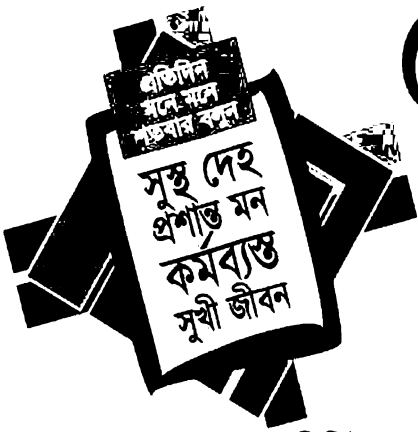

ভিজিট করুন

www.quantummethod.org.bd

বই, ব্রোশিওর, স্মারক

মেডিটেশন ও ডকুমেন্টারি

ফ্রি ডাউনলোড করুন

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০৯৬১৩-০০২০২৫

e-mail info@quantummethod.org.bd

বদলে গেছে লাখো জীবন